● ● ● আন্তিলিও গান্তির আফ্রিকা ● ● ●

আত্তিলিও গাত্তির আফ্রিকা

চিরঞ্জীব সেন

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৩৭১ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
কলকাতা

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রক
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯

মুদ্রক
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিণ্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জী লেন
কলকাতা-৬।

কল্যাণীয়া চন্দ্রানীকে

মেশোমশাই

মরণ কূপ

'কাবেনা !'

শুধু একটি মাত্র শব্দ কি অঘটন ঘটাতে পারে তা স্বকর্ণে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। তিনটি অক্ষরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে ?

এই শব্দটি শুনলে উত্তর রোডেশিয়ার মুমবোয়া আদিবাসীর উষ্ণ রক্ত শীতল জল হয়ে যায়। ভয়ে তার চোখ মুখ বসে যায়। মুখ সাদা হয়ে যায়, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হয় নাকি। মৃত্যু না হলেও সে অজ্ঞান হয়ে যায় অথবা ভয়ে সে মুহূর্তে স্থান ত্যাগ করে পলায়ন করে।

বিশ্বাস না হয় ইটালিবাসী বিখ্যাত ও দুঃসাহসিক ভ্রমণকারী আত্তিলিও গাত্তির মুখে সেই অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনা যাক। দুর্ভেদ্য আফ্রিকার অনেক রহস্য আত্তিলিও গাত্তি ভেদ করেছেন।

তিনি বলেন আফ্রিকা মানেই গভীর অরণ্য, গণ্ডার, সিংহ, গরিলা, বিষাক্ত সাপ প্রভৃতি শ্বাপদসংকুল দেশ নয়, নরখাদক আদিবাসীও যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে না, দাঁত উঁচিয়ে হাতির বা সিং উঁচিয়ে মহিষের পাল তাড়া করে আসছে না। এসব আছে সত্যি কিন্তু তারা সর্বদা সর্বত্র বিচরণ করছে না।

আফ্রিকার একটা বিশেষ চরিত্র আছে। তার মানুষ ও জীবজন্তুর যেসব বৈশিষ্ট্য আছে যা আমরা দূরে বসে চিন্তাও করি না সেই বৈশিষ্ট্যগুলি আমি তুলে ধরবার চেষ্টা করব। সে সব কাহিনী অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু তা শিরায় শিরায় শিহরণ জাগাবে।

কয়েক বছর হলো প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। রোডেশিয়া তথা শ্বেতজাতি অধিকৃত আফ্রিকা স্বাধীন হতে তখনও অনেক দেরি।

আমি আত্তিলিও গাত্তি, প্রফেসর এবং বিল উত্তর রোডেশিয়ার এক ব্যাপক জঙ্গল ও জলাভূমির নানা তথ্য সংগ্রহ করে এবং একটা মানচিত্র তৈরি করে উত্তর রোডেশিয়ার রাজধানী লিভিংস্টোনে ফিরে এসেছি।

আমাদের সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে প্রদেশের গভর্নর এক ভোজে আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। গভর্নর, আমরা তিনজন অভিযাত্রী এবং স্থানীয় কমিশনার মিঃ হুইংকলি ছাড়া আর কেউ সেই ভোজসভায় হাজির ছিল না।

আমাদের দলের প্রফেসর হলেন একজন ফরাসী বিজ্ঞানী তথা চিকিৎসক। আফ্রিকা সম্বন্ধে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ, ধীর ও স্থির, সহসা বিচলিত হন না। আমার পরিচয় আমার লেখার মধ্যেই পাওয়া যাবে। বিল হলো টগবগে তাজা এক মার্কিন যুবক, বয়স আটাশ, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘদেহী। ছ ফুট দু ইঞ্চি

লম্বা। সর্বদা হাসিখুসি, দারুণ চটপটে। একটা কিছু কাণ্ড করব এই ছিল তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য।
বেচারা! কাণ্ড হয়ত একটা কিছু করত কিন্তু তা করবার আগেই অতি বিশ্বাস ও অজ্ঞতার ফলে বেচারাকে অকালে প্রাণ দিতে হলো। এমন একটা করুণ ঘটনা ঘটবে জানলে তাকে কি আমি সঙ্গী করতুম?
বেচারার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তার বাবা ও মা দুজনেই মারা যান। তার এক পিসি তাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করে। স্কুলে পড়বার সময় আফ্রিকা সম্বন্ধে শিকার কাহিনী পড়তে পড়তে সে স্বপ্ন দেখত সে একদিন আফ্রিকা যাবে এবং বড় দাঁতওয়ালা একটা বড় হাতি মারবে!
যখন সে যুবক, কাজকর্ম করছে তখনও সে এই স্বপ্ন ত্যাগ করতে পারে নি। বলতে কি আফ্রিকা যাবার জন্যে সে অর্থ সঞ্চয় করতেও আরম্ভ করেছে।
আফ্রিকায় আর একটা অভিযান চালাবার প্রস্তুতির জন্যে ১৯২৮ সালে আমি অ্যামেরিকা গিয়েছিলুম। এবার আমি যাব উত্তর রোডেশিয়া। নিউ ইয়র্কে এসেছি। বিল কি ভাবে খবর পেয়েছে। এখন তার কোনো বন্ধন নেই। তার পিসি মারা গেছে। বিল এখন এক চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্টের ফার্মে পাকাপাকিভাবে নিযুক্ত। ইতিমধ্যে অবসর সময়ে বিল আরকিওলজির পুরো পাঠ গ্রহণ করেছে।
নিউ ইয়র্কে আমার ঠিকানা যোগাড় করে সে তার শিক্ষাগত, শারীরিক, মানসিক ইত্যাদি যোগ্যতা জানিয়ে একখানা চিঠি লিখেছিল। সে আমার সঙ্গী হতে চায়।
আফ্রিকা অভিযানে আমার সঙ্গী হবার অনুরোধ জানিয়ে আমাকে অনেকে চিঠি লেখে। প্রায় সব অনুরোধ বাতিল করতে হয়। যদিও বা দু একজন শেষ পর্যন্ত মনোনীত হয় তারা কিন্তু আফ্রিকায় পৌঁছে অরণ্যের ভয়ংকর রূপ দেখে পালিয়ে আসে। তারা হয়ত সিনেমায় ছবি দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত পরিস্থিতি তাদের নিরাশ করে।
বিলকে দেখেই আমি আকৃষ্ট হলুম। তার নীল চোখের সরল দৃষ্টি আমি উপেক্ষা করতে পারি নি। হ্যাণ্ডশেক করবার সময় আমার মন বলল আমি এরকম একজন যুবক চাইছিলুম। কয়েক মিনিট কথা বলে আমি মনস্থির করলুম। বিল আমার সঙ্গে নর্থ রোডেশিয়া যাবে।
রাজধানী লিভিংস্টোন পৌঁছবার আগে পর্যন্ত বিল তার জীবনের অনেক কাহিনী বলে নি। তার পিতা ও মাতা দুর্ঘটনায় কিভাবে মারা গেল সে কথাও সে আমাকে বলে নি এবং হাতির দেশে যাবার আগে পর্যন্ত তার আবাল্য মনোবাসনা সে একটি দাঁতাল হাতি শিকার করবে সে কথাও সে আমাকে বলে নি।

তার যতটুকু পরিচয় আমি সে পর্যন্ত পেয়েছিলুম তাতে জেনেছিলুম সে সাহসী, চটপটে, নিরলস কর্মী। শিকারী এবং বন্ধু হিসেবে অত্যন্ত কাম্য। বিলকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিল। চমৎকার ছেলে এই বিল।

সাবালক হয়ে পর্যন্ত আফ্রিকার সঙ্গে আমার পরিচয়। প্রথম মহাযুদ্ধে আহত হলে চিকিৎসার জন্যে আমাকে ইজিপ্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯১৯ সালে আমার বয়স যখন তেইশ বছর, তখন আমার টিউবারকিউলিসিসে হলো ফুসফুস আক্রান্ত। একজন অভিজ্ঞ পারিবারিক চিকিৎসক আমাকে পরামর্শ দিলেন সাহারা মরুভূমিতে গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর ঢুকে বালি চাপা দিয়ে যতক্ষণ পার রোদে পুড়তে থাক। যদি সহ্য করতে পার এতেই তুমি সেরে উঠবে।

ডাক্তারবাবুর পরামর্শ আমি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেছিলুম। শুকনো তপ্ত বাতাস এবং আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি আশ্চর্য কাজ করল। এক মাস হতে না হতে টি. বি. জীবাণু হার স্বীকার করল।

বালির ওপর আমার শুধু মাথা জেগে থাকত। তাই দেখে পথচলতি বেদুইন বা আরবরা আমার কাছে এসে বালিতে বসে আমার সঙ্গে গল্প করত। বেদুইন ও আরবদের নানা দুঃসাহসিক কাহিনী শুনতে শুনতে আমি বিহ্বল হয়ে পড়তুম। অ্যাডভেঞ্চার আমাকে হাতছানি দিতে আরম্ভ করল। টি. বি. রোগ সারল কিন্তু ভ্রমণরোগ আমাকে ধরল। বিশেষ করে আফ্রিকা আমাকে আকর্ষণ করল। আফ্রিকার অনেক অঞ্চলের গাছপালা, জীবজন্তু ও আদিবাসীদের সঠিক পরিচয় বাইরের জগত জানত না। সেইসব অজানা তথ্য জানতে আমি আগ্রহী হয়ে উঠলুম।

সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে ও হৃতস্বাস্থ্য ফিরে পেয়ে আমি আফ্রিকার অরণ্যপথে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলুম। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার বনে বনে আমি ঘুরে বেড়ালুম। সেই গা শিরশির করা অভিজ্ঞতা এবং অজানার সঙ্গে পরিচয় ভোলবার নয়। পশু শিকার আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সোনা বা হীরের খনি খুঁজে বার করাও আমার লক্ষ্য ছিল না। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল আফ্রিকার অরণ্য, তার পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, মানুষ এবং তার মাটির সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে তাদের চাক্ষুষ পরিচয় জানা।

ভোজ শেষে আমরা লাটবাহাদুরের লাইব্রেরিতে কফি নিয়ে বেশ গুছিয়ে বসলুম।

আমাদের তিনজনের দলের প্রফেসর যেহেতু বিজ্ঞানী তাই তাঁর নজর সর্বদিকে। আমরা আমাদের জরিপ কাজের সময় গ্রেনাইট পাথরের যেসব অদ্ভুত অথচ চমৎকার স্তর দেখেছিলুম প্রফেসর সে সবের বিবরণ দিতে লাগলেন।

প্রফেসর বললেন গ্রেনাইটের এমন অদ্ভুত অথচ নয়নাভিরাম স্তরবিন্যাস এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার নজরে পড়ে নি অন্ততঃ এই আফ্রিকা মহাদেশে, লাভলি !

বিলের নজরে পড়েছিল নানা আকারের গুহা। তার ধারণা আদিম মানব এই-সব গুহায় বাস করত। গুহাগুলিতে প্রবেশ করলে হয়ত মানবজাতির ক্রম-বিকাশের অনেক নিদর্শন পাওয়া যাবে।

স্থানীয় কমিশনার মিঃ হুইংকলির এই পুরো অঞ্চলটা নখদর্পণে। গুহায় প্রবেশ না করলেও গুহাগুলির অবস্থান, এখানকার জীবজন্তু, মানুষ ও গাছপালা সম্বন্ধে তাঁর অনেক কিছু জানা আছে।

মিঃ হুইংকলি বললেন, আপনার অনুমান সত্য হতে পারে। আমার ইচ্ছা থাকলেও আমি কোনো গুহায় প্রবেশ করতে পারি নি। এ অঞ্চলে কোনো খনিজ পাওয়া যায় না তাই খনিজের সন্ধানে দলবল নিয়ে কোনো প্রস্পেক্টর আসে নি। পথঘাট বলতে কিছু নেই। স্থানীয় মুমবোয়া অধিবাসীর সংখ্যা বেশি নয়, তারা কোনো সহযোগিতা করে না, উপরন্তু বাধা সৃষ্টি করে। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে হয়েছিল।

কমিশনারের বিবরণী শুনে আমরা তিনজনই আগ্রহী হয়ে উঠলুম। আফ্রিকার একটা অজানা দিক হয়ত জানা যেতে পারে। লাটবাহাদুর বোধহয় আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে বললেন আমরা মুমবোয়া অঞ্চলটায় অভিযান চালাতে রাজি আছি কি না।

শুনেই প্রফেসর তো লাফিয়ে উঠলেন। বিল আরকিওলজির পাঠ নিয়েছে। সেই বিদ্যা সে কাজে লাগাতে চায়। কে জানে গুহার ভেতরে কি রহস্য লুকিয়ে আছে ? গুহার গায়ে হয়ত আঁকা আছে কত ছবি, ভেতরে পড়ে আছে আদিম মানবের ব্যবহৃত কোনো সামগ্রী বা জন্তুর কংকাল। এমন কিছু অবিষ্কার করতে পারলে সাড়া পড়ে যাবে। আর আমার লক্ষ্য প্রাকৃতিক সম্পদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা, মানুষের পরিচয় লাভ করা, মাটির গন্ধ চিনে নেওয়া, এখানকার গাছের পাতা ফল ফুল আর পাখির নাচ চিনে নেওয়া।

প্রফেসর ও বিল সোচ্চার হলেও আমার ইচ্ছা আমি মুখ ফুটে বলতে ইতস্তত করছিলুম।

কমিশনার বললেন, নেমে পড়ুন আপনারা, হয়ত সেই মরণকূপের সন্ধান পেয়ে যেতে পারেন, যে কূপে মানুষ নামলে মৃত্যু অবধারিত তো বটেই, কিন্তু সে মৃত্যু অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। তাই আমরা সেই কূপের নাম দিয়েছি 'দি পিট অফ অ্যাগনাইজিং ডেথ'।

আমি সেই কূপের অবস্থান ও তার বিবরণ জানতে চাইলুম।

কমিশনার বললেন, এমন একটা ভয়ংকর ও সাংঘাতিক কূপ আছে নিশ্চয় যদি এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের কথা বিশ্বাস করতে হয় তবে সে কূপ কোথায় তা আমি জানি না। তবে কোথাও না কোথাও আছে নিশ্চয়। মুমবোয়ারা ঐ কূপটাকে বলে কাবেনা। কাবেনা শব্দটা আমি দু বার মাত্র উচ্চারিত হতে শুনেছি। প্রথমবার শুনেছিলুম স্থানীয় এক পুলিসম্যানের মুখে। একজন আদিবাসী রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সেই পুলিসম্যান তার খোঁজে গিয়েছিল। ফিরে এসে সে হাঁফাতে হাঁফাতে আমায় তার অনুসন্ধানের ফলাফল জানাতে জানাতে কাবেনা শব্দটা একবার মাত্র উচ্চারণ করেছিল এবং তারপরই সে মাটিতে পড়ে গেল এবং মৃত্যু। সে হয়ত বলতে চাইছিল যে নিরুদ্দিষ্ট লোকটি কাবেনায় পড়ে গেছে, সে আর কোনোদিন ফিরবে না। পরে আমি শুনেছিলুম লোকটির হার্ট দুর্বল ছিল এবং রিপোর্ট করবার জন্যে সে কয়েক মাইল দৌড়ে এসেছে।

কমিশনার সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, এবার একজন বৃদ্ধার কথা বলি। বৃদ্ধার নাকি মাথায় গোলমাল ছিল, থাকতে পারে কারণ বৃদ্ধা একই দিনে তার চারটি ছেলেকে হারিয়েছিল। বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলেছিল তার চারটি ছেলেকে সেই ভয়ংকর মরণকূপে জীবন্ত ফেলে দেওয়া হয়েছে, তারা কেউ ফিরে আসে নি। এই খবরটি দিয়েই বৃদ্ধা মারা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বৃদ্ধা কি ভয় পেয়েছিল ? ভয়েই মারা গেছে ?

হ্যাঁ, তাই হবে এবং হতেও পারে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার যে মরণকূপের নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে সে মারা গেল। সেইটেই রহস্য।

কেউ বিষ প্রয়োগ করে থাকতে পারে ? অথবা বৃদ্ধা কি জানত যে সে যদি মরণকূপের উল্লেখ করে তাহলে তার মৃত্যু হবে ? আমি প্রশ্ন করি।

বিষ প্রয়োগের কথা ঠিক নয় তবে বৃদ্ধা জানত মরণকূপের নাম উল্লেখ করলে সে মরবে, এমন নাকি অনেকে মরেছে। তবে এটা সত্যি যে মুমবোয়াদের কাছে কাবেনা বিভীষিকা। এ নাম উচ্চারণ করতে নেই।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, যদি ধরে নেওয়া যায় যে এমন একটা মরণকূপ কোথাও আছে হয়ত এবং গোষ্ঠী নেতা বা সর্দাররা এবং রোজারা হয়ত চরম দণ্ড দেবার জন্যে অপরাধীকে ঐ কূপে ফেলে দিত, কিন্তু সেজন্য কি ওরা কোনো অনুষ্ঠান পালন করত না ?

আমার কথার সূত্র ধরে প্রফেসর বললেন, ঐসব সর্দার বা গোষ্ঠীনেতারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিল, তারা এইভাবে তাদের শত্রুদের হত্যা করত এবং যারা এই হত্যা নিয়ে আলোচনা করত তাদেরও ঐ মরণকূপে ফেলে দিত, ফলে মানুষরা ঐ মরণকূপের নাম উচ্চারণ করতেই ভয় পেত।

বিল বলল, এরকম একটা অত্যাচার হয়ত শত শত বছর ধরে চলে আসছে সেইজন্য আতঙ্কটা রীতিমতো দানা বেঁধেছে।
সেদিন ক্যাম্পে ফেরবার আগে আমরা স্থির করলুম ঐ মরণকূপ 'পিট অফ ডেথ' আমরা খুঁজে বার করব। লাটবাহাদুর বললেন সরকার পক্ষ থেকে আমাদের সাহায্য করা হবে। ঠিকানা না জানা সেই রহস্যময় কূপ বা সুড়ঙ্গ বা গুহা খুঁজে বার করতে আমাদের তিরিশ হাজার বর্গমাইল অজানা ভূমি খুঁজে বেড়াতে হবে এবং স্থানীয় অধিবাসীরা আমাদের সাহায্য তো করবেই না উপরন্তু বাধা দেবে। তবুও আমি প্রতিজ্ঞা করলুম সেই কূপ আমি খুঁজে বার করবই।

আমরা যে কি সাংঘাতিক কাজে হাত দিতে যাচ্ছি তার আভাষ সেইদিনই রাত্রে পাওয়া গেল।
নতুন একটা কাজে হাত দিতে যাচ্ছি তাই সেই রাত্রে উত্তমরূপে প্রচুর চিকেন রান্না করা হয়েছিল। ক্যাম্পে ডিনার টেবিলে খেতে বসে আমরা সেই চিকেন কারির জন্যে অপেক্ষা করছি। আফ্রিকান বাবুর্চি গামলাভর্তি চিকেন নিয়ে যখন তাঁবুর ভেতর ঢুকবে সেই সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে প্রফেসর কাবেনা শব্দটি উচ্চারণ করে ফেললেন।
সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ। বাবুর্চির হাত থেকে চিকেন ভর্তি গামলা মাটিতে পড়ে গেল। বাবুর্চিকে ধমক দেবার জন্যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমি বাবুর্চির কোনোই পাত্তা পেলাম না। সে তখনি কোথায় পালিয়েছে। ইতিমধ্যে আমাদের ভৃত্যদের তাঁবুতে শোরগোল পড়ে গেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁবু ফর্সা। একজনেরও দেখা পাওয়া গেল না। বাকি ছিল একজন। আমাদের জুলু বাবুর্চি এবং বিশ্বাসী ছোকরা জামানি। জ-এর উচ্চারণটা হবে 'জেড'-এর মতো। আমাদের বাকি পাঁচজন ভৃত্য, যারা সকলেই রোডেশিয়ার মানুষ, তারা সকলেই পালিয়েছে অথচ এরা মুমবোয়া সম্প্রদায়ভুক্ত নয়।
সে রাত্রে আমাদের আর খাওয়া হলো না। টিন খুলে সার্ডিন মাছ আর কফি খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো। ভৃত্যদের এবং অন্যান্য তাঁবুগুলির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। জিনিসপত্তর ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে তবে কিছু চুরি যায় নি। বোঝা গেল যে কাবেনা ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করবার মতো নয়। কাবেনা-ভীতি এই আদিবাসীদের মধ্যে গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে, অতএব আমরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলুম যে এর অস্তিত্ব খুঁজে বার করতে হবে এবং রহস্য ভেদ করতে হবে।

মুমবোয়া অঞ্চলে আমরা যত তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারব ভেবেছিলুম তা

পারলুম না। আমাদের ওপর যেন একটা অভিশাপ নেমে এল। কার অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে আমাদের সকল আয়োজন যেন একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। জবরদস্ত সরকারী কর্মচারীদের কড়া আদেশও যেন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তথ্য সংগ্রহ করতে বা পথের নিশানা জানতে গেলে তারা তাদের অজ্ঞতা জানাচ্ছে অথবা ভুল তথ্য বা ঠিকানা জানাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে কাজ করতে বললে বা যেতে বললে উত্তর না দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে কাবেনার সন্ধানে যাচ্ছি সেটা কোনোভাবে প্রচার হয়ে গেছে। এখন আমরা যদি বলি যে আমরা কাবেনা খুঁজতে যাব না, অন্য দিকে যাব তাহলেও আমাদের কথা ওরা বিশ্বাস করবে না।

আমরা ডুগডুগির শব্দ শুনতে পাচ্ছি, ধোঁয়ার নিশানাও দেখতে পাচ্ছি। রিলে চলছে। সাংকেতিক শব্দে ও ধোঁয়া দ্বারা অরণ্যচারীদের সতর্ক করে দিচ্ছে, খবরদার, তোমরা মুশুঙ্গুদের (সাহেবদের) সঙ্গে যেয়ো না। ওদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে।

আমাদের এখন একমাত্র সহায় জামানি কিন্তু বেচারা একা আর কত করবে। আমাদের ফরমাশ খাটতে খাটতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে তবুও কখনও আমাদের আদেশ অমান্য করছে না। তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, ভয় কি জামানি, সামনের গ্রামে আমরা নিশ্চয় কিছু লোক পাব তখন তোমার খাটুনি কমবে। জামানি তার ঝকঝকে সাদা দাঁতের সারি বার করে শুধু হাসে, কারণ পরবর্তী গ্রাম জনশূন্য। আমরা আসার খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে লুকিয়েছে। আমরা দূর থেকে ভেসে আসা ডুগডুগির শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

নিরাশ হলে চলবে না। আমরা ঘুরতে ঘুরতে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের বাংলোয় গেলুম। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু করতে পারবেন বলে মনে হলো না। তিনি শুধু কাবেনা নামটা শুনেছেন আর জানেন এই শব্দটি উচ্চারিত হলে নেটিভরা ভয়ে মারা যায় বা পালিয়ে যায়, কিন্তু কাবেনা কোথায়, কতদূরে, পাহাড়ে, সমতলভূমিতে না জঙ্গলে তা তিনি জানেন না।

অনেক চেষ্টা করে কমিশনার সাহেব তাঁর একান্ত অনুগত কয়েকজনকে আমাদের জন্যে কাজ করতে বললেন। তারা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেও কেউ শেষ পর্যন্ত এগিয়ে এল না।

আপাততঃ কমিশনার সাহেবই আমাদের একমাত্র ভরসা। শেষ পর্যন্ত তিনি একটা কাজ করলেন। জেলখানা থেকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা পাওয়া চার পাঁচজন কয়েদীকে আনিয়ে আমাদের জন্যে কাজ করতে বললেন। কয়েদীরা বিনা পয়সায় খাটছে। আমাদের হয়ে কাজ করলে তারা পয়সা পাবে এবং আমাদের কাজ শেষ হলে ওরা মুক্তি পেতেও পারে। তারা রাজি হলো। আমরাও বাঁচলুম। যে কয়েকজন লোক পাওয়া গেল তাদের দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

কমিশনার সাহেব আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে কাবেনা নয় আমরা কয়েকটা মাত্র গুহা দেখব, উদ্দেশ্য সেইসব গুহায় কি জাতীয় জীব, শ্বাপদ বা কীটপতঙ্গ বাস করে তার অনুসন্ধান করা। আর আমাদের পরামর্শ দিলেন স্থানীয় ভাষা শিখতে ও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে। আমরা অবশ্য এ চেষ্টা করে আসছি। অনেকটা সফল হয়েছিও।

কমিশনার সাহেবের শুভেচ্ছা নিয়ে আমরা কাজে নেমে পড়লুম।
মুমবোয়া অঞ্চলের কোনো মানচিত্র নেই। মানচিত্র আমাদেরই করে নিতে হবে, অন্ততঃ কাজ চলে এমন একটা মানচিত্র চাই। মানচিত্র তৈরি করা এবং সারা মুমবোয়া অঞ্চলে গুহাগুলি এবং কাবেনা মরণকূপের সন্ধানকাজ চালানো বেশ বড় কাজ, পরিশ্রমও করতে হবে প্রচুর, তার জন্যে রীতিমতো প্রস্তুতি দরকার। আমরাও পিছু হটবার পাত্র নই।
সারা অঞ্চলটা বেশ দুর্গম। আমাদের জন্যে কেউ পথ তৈরি করে রাখে নি। ওরই মধ্যে একটা সুবিধাজনক স্থান বেছে নিয়ে আমরা ক্যাম্প স্থাপন করলুম। এই ক্যাম্প কেন্দ্র করে আমরা আমাদের অভিযান চালাব।
আমরা শিকার করতে আসি নি, অযথা পশুহত্যা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে আত্মরক্ষার জন্যে পশুহত্যা করতেই হবে এবং নিজেদের আহারের জন্যে হরিণ বা পাখি মাঝে মাঝে হলে ভালোই হয়। আহারের অভাব হবে না। শিকার ছাড়া আমাদের সঙ্গে টিন ভর্তি প্রচুর খাবার ও শুষ্ক ফলমূল আছে।
মুমবোয়া অঞ্চলের প্রাকৃতিক দৃশ্য চমৎকার। চারদিকে যেমন নানারকম চমৎকার গাছপালা ও লতা আছে তেমনি আছে গ্রেনাইট পাথরের বিচিত্র শোভা। চোখ-ধাঁধানো এমন প্রস্তরশোভা চোখে পড়ে না। তারপর এখানকার সূর্যাস্ত! টামারিস্ক গাছ ঘেরা পাহাড়ের ওপারে সূর্য ডুবে যাবার পরও আকাশ অনেকক্ষণ লাল হয়ে থাকে। এক একদিন তো গোধূলির আলো যেতেই চায় না।
ক্যাম্প স্থাপন করা সোজা ব্যাপার নয়। প্রচুর মালপত্র রাখবার জন্যে কয়েকটা কাঠের ঘর বানাতে হলো। এরই মধ্যে একটা ঘরে ছোট একটা ডিসপেনসারি বসানো হলো। আমরা তাঁবুতে শোব। মালবাহী ও জামানির জন্যে তাঁবু, কিচেন, বাথরুম ইত্যাদি সবই একে একে সাজানো হলো। কত তাঁবুই তো বয়ে আনতে হলো। জেলখাটা কয়েদী হলেও মালবাহী মানুষগুলো কিন্তু সৎ ছিল। এরা নানারকম রোগে ভুগত, দাঁত ব্যথা থেকে পেটের যন্ত্রণা। প্রফেসর তাদের চিকিৎসা করে, যথাসময়ে ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলতেন। ফলে আমাদের ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস জন্মাল এবং তারা আমাদের অনুগত হলো।

এই কি মরণকূপের পথ ?

আমরা পেয়েছিলুম মাত্র চারজন কয়েদী কিন্তু এত মাল বইবার জন্যে আমাদের আরও লোকও দরকার। ঐ চারজন কয়েদী লোক সংগ্রহ করতে লাগল। কয়েক-ঘণ্টার মধ্যে দাঁতের বা পেটের যন্ত্রণা আরোগ্য, নানারকম ছোটখাট উপহার বিশেষ করে তামাক ওদের আকৃষ্ট করত। আরও একটা আকর্ষণ ছিল। ভালো বেতন এবং তা নির্দিষ্ট সময়ে নগদে মিটিয়ে দেওয়া।

আমাদের মালবাহীর অভাব হলো না। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশ সহজ হলো। কোথায় কোথায় গুহা আছে এবং কোন্ জঙ্গলে কি পশু আছে এ খবরও তারা দিতে আরম্ভ করল।

মালবাহীদের একজন সর্দার ছিল। সে আমাদের প্রতি খুব কৃতজ্ঞ ছিল কারণ আমরা তার চারটি ছেলেকে জেল থেকে মুক্ত করে এনেছি। সর্দার বলত ওরা নির্দোষ, ওদের মিথ্যা সাজা দেওয়া হয়েছিল। যেসব গুহার ঠিকানা ওদের জানা ছিল না সেগুলি খুঁজে বার করবার জন্যে সর্দার তার লোকদের আদেশ করত। আমরা ভুলেও ওদের কাছে কাবেনা শব্দটি উচ্চারণ করতুম না।

প্রতিদিন সকালে পেটভরে ব্রেকফাস্ট করে আমি, বিল ও প্রফেসর গুহা পরিদর্শনে সঙ্গে দুজন মালবাহী নিয়ে বেরিয়ে পড়তুম। হাতে থাকত শক্তি-শালী টর্চ ও রাইফেল এবং পিস্তল। আমি দুজন মালবাহী নিতুম না, আমার সম্বল ছিল জামানি। এইভাবে কম সময়ের মধ্যে অনেক গুহার মধ্যে ঢোকবার সুযোগ পেয়েছিলুম। প্রতিদিন নতুন অ্যাডভেঞ্চার, নতুন অভিজ্ঞতা, রোমাঞ্চ। মালবাহীরা কেউ গুহায় প্রবেশ করত না এমন কি জামানিও নয়, তবে আমাদের বিশেষভাবে নজর রাখতে হতো যাতে ওরা পালিয়ে না যায়। গুহা থেকে বেরিয়ে আসবার পর ওদের দর্শন না পেলে পথ চিনে ক্যাম্পে ফেরা অসম্ভব। গ্রেনাইটের রাজ্যে পথ চেনা খুবই কঠিন।

গুহায় ঢুকে তদন্ত চালানো কাজটা মোটেই সুখকর নয়। দুর্গন্ধ ভ্যাপসা হাওয়া, গরম, মুখে বাদুড়ের ধাক্কা, কাঁকড়াবিছে ও বিষাক্ত মাকড়সার অত্যাচার এবং কোনো হিংস্র জন্তু বা বিষাক্ত সাপ অন্ধকারে যে কোনো সময়ে আক্রমণ করতে পারে। অন্ধকারে মাথায় আঘাত লাগে, হোঁচট খেয়ে পড়তেও হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, দূর ছাই, কি হবে গুহা খুঁজে। আমাদের মালবাহী যুবক-গুলি ও জামানিরও তাই মত, তারা বলাবলি করে মুশুঙ্গুরা কি খুঁজে বেড়াচ্ছে? গুহার পঞ্চাশ গজের মধ্যে যেতেই তাদের আপত্তি। গুহামুখ থেকে তারা দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, আর এক পাও এগোবে না, তাদের মুখের চেহারা বদলে যাবে, নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলবে, হাজার অনুরোধ করলেও আর এক পা-ও এগোবে না। তারা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন তো বটেই এবং গুহায় ঢুকে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা দেখে বা শুনে কারই

বা আগ্রহ হয় গুহার ভেতরে প্রবেশ করতে। অতএব ওরা গুহার ভেতরে ঢোকা দূরের কথা কাছেই যেতে চাইত না। পাছে পালিয়ে যায় এজন্যে আমরা জোর করতুম না।

গুহাগুলি কেমন? আমাদের কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল? কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি।

···একদিন বিল একটা প্রায় অন্ধকাব গুহার ভেতরে ঢুকে একটা হায়েনার মুখোমুখি। বেরিয়ে আসবার উপায় নেই। হায়েনাটা বিলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করছে। ওটা হায়েনা না নেকড়ে বাঘ না বন্য শূকর, অন্ধকারে বিল তা বুঝতে পারে নি। একটা হিংস্র জন্তু সে বিষয়ে ভুল নেই। বিল গুলি চালাল কিন্তু আলোর অভাবের দরুন গুলি ঠিক জায়গায় লাগল না। আহত, ক্ষিপ্ত জন্তুটা গুহা থেকে পালাবার সময় হাফ-প্যাণ্ট পরা বিলের একটা হাঁটু তার নোংরা বিষাক্ত থাবা দিয়ে আঁচড়ে দিয়ে গেল।

বিল তেমন গুরুত্ব দেয় নি এবং ক্ষতি কি পরিমাণ হয়েছে তা বোঝা গেল সন্ধ্যা হবার আগেই। বিলের পা যে কি করে বাঁচানো গিয়েছিল তা আমরা আজও জানি না।

প্রফেসর তো একবার একটা গুহার ভেতরে একটা গর্তর মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। গর্তর গায়ে ছিল কাঁটা গাছ। বিষাক্ত নিশ্চয়। প্রফেসরের গা আঁচড়ে গিয়েছিল। কাঁটার বিষ রক্তে মিশে গিয়েছিল। বিষম জ্বরে প্রফেসর দশ দিন ভুগেছিলেন, সর্বদা প্রলাপ বকতেন। তিনি যে আবার সুস্থ হয়ে কাজ করতে পারবেন আমরা এমন আশা ত্যাগ করেছিলুম।

নবীন যুবক বিল অপেক্ষা প্রফেসর যে কম কর্মঠ নন তা নিয়ে প্রমাণ করলেন আরোগ্য লাভ করবার কয়েক দিন পরেই। তাঁর প্রাণশক্তি অফুরন্ত। যত শীঘ্র সম্ভব প্রফেসর কাজ আরম্ভ করলেন।

আরোগ্য লাভের পর প্রথম যে গুহায় ঢুকলেন সেখানে কিছু ঘটে নি, উল্লেখযোগ্য কোনো নিদর্শনও পাওয়া যায় নি, কিন্তু দ্বিতীয় গুহায় দশ বারো পা যাবার পর তিনি সাক্ষাৎ পেলেন দুটি সিংহশাবকের। শাবক দুটি একান্তই নিরীহ। প্রফেসর তাদের গুরুত্ব দিলেও শাবকদ্বয় তাঁকে গ্রাহ্যই করল না, যদিও শাবক দুটি বেশ বড় হয়েছিল। নরমাংসের স্বাদ তারা হয়ত পায় নি, পেলে বোধহয় প্রফেসরকে ছাড়ত না কিন্তু প্রফেসর ছাড়লেন না। তিনি কাঁপা হাতে গুলি করলেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেন এবং তরুণ সিংহ দুটি গুহা থেকে বেরিয়ে কোথায় সটকে পড়ল।

গুহা সন্ধান করে, প্রফেসর বাইরে এসে দেখলেন যে তাঁর মালবাহী তথা পথপ্রদর্শক কয়েদীযুগল অদৃশ্য। তিনি ভাবলেন তাহলে সিংহ দুটি ওদের কোথাও ধরে নিয়ে গিয়ে ভক্ষণ করেছে।

প্রফেসর ঠিক করলেন তিনি ক্যাম্পে ফিরে যাবেন। ক্যাম্পের পথ মনে করে যে পথ ধরলেন সেটি ক্যাম্পে ফেরার পথ নয়। তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকের পথ ধরেছিলেন। ওদিকে কয়েদী দুটি ক্যাম্পে ফিরে এসেছে। সিংহ দেখেই তারা পালিয়ে এসেছিল। তাদের কথা শুনে মনে হলো সিংহ নিশ্চয় প্রফেসরকে আক্রমণ করেছিল এবং হয় তাকে মেরে ফেলেছে কিংবা জখম করেছে। গুহার ভেতরে সিংহশাবকদের বাবা মা আছে অনুমান করে তারা আর গুহার ভেতরে ঢুকতে সাহস করে নি।

প্রফেসরের প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে আমরা কয়েদীদের সঙ্গে নিয়ে গুহায় গেলুম, কিন্তু কোথায় প্রফেসর? তিনি যে আক্রান্ত হয়েছিলেন এমন কোনো চিহ্নও পাওয়া গেল না। তাঁকে যে সিংহ-গুহা থেকে টেনে বার করে নিয়ে গেছে এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

জমি এখানে এমন কঠিন ও প্রস্তরাকীর্ণ যে জুতোর ছাপও দেখা গেল না। কিন্তু প্রফেসর গেল কোথায়? স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া মুমবোয়া অথবা আফ্রিকার যে কোনো জঙ্গলে পথ চেনা অত্যন্ত দুরূহ। পথ হারিয়ে কত মানুষ ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে মারা গেছে।

আড়াই দিন পরে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত প্রফেসরকে পাওয়া গেল। তিনি তখন তাঁর সহ্যের শেষ সীমায়। জ্বরও হয়েছে। পিপাসায় জিভ ফুলে গেছে। ভাগ্য-ক্রমে তিনি মানুষ বা পশু কর্তৃক আক্রান্ত হন নি।

তাহলে আমার অভিজ্ঞতার কথাও কিছু বলি।

জার্মানি আমাকে একটা গুহার সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো! তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের দিকে চলেছে। গুহার মুখটা সরু, হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। এমন অনেক গুহা আছে যাদের প্রবেশপথ সরু কিন্তু ভেতরটা বেশ প্রশস্ত।

গুঁড়ি মেরে ভেতরে ঢুকে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু কোমল লোম ও ধারাল নখের স্পর্শ পেলুম! গুঁড়ি মেরে আমাকে বেশ খানিকটা যেতে হলো। অন্ধকার, ভালো দেখতে পাচ্ছি না। সুড়ঙ্গ শেষ হলো, এবার আসল গুহা। বেশ কয়েক গজ এসে পড়েছি।

উঠে দাঁড়ালুম। টর্চ জ্বাললুম। হ্যাঁ, গুহাটি বেশ বড়। অনেক মানুষ বা পশু এর ভেতরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। যখন ভাবছি গুহাটা ভালো করে দেখবার জন্যে কোন্ দিক থেকে আরম্ভ করা যায় তখনি একটা হিস্‌হিস্ শব্দ কানে এল এবং আমার পায়ে কেউ আঁচড় কাটতে আরম্ভ করল। মুহূর্তে আমি পিছু হটলুম, গুহার পাথরে আমার মাথা ঠুকল, হেলমেটটা মাথা থেকে পড়ে গেল। সেই সঙ্গে টর্চটাও হাত পিছলে পড়ে গেল, কিন্তু নেভেনি।

এবার দেখতে পেলুম। কোমল লোম বা ধারাল নখ কার। একটা লেপার্ড শাবক আমার পা আঁকড়ে ধরেছে। একেবারে বাচ্চা, বোধহয় মাসখানেকের হবে। আমি লাথির গায়ে বাচ্চাটাকে দূরে ফেলে দিলুম এবং পরমুহূর্তে শুনলুম অন্যরকম শব্দ। নিশ্চয় বাচ্চার মা। কোথায় দেখতে পাচ্ছি না। হয়ত আমার ওপর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করছে। আমার পেট মোচড় দিয়ে উঠল। লেপার্ড সর্বদাই বিপজ্জনক কিন্তু সেই লেপার্ড যদি বাচ্চার মা হয় এবং জানতে পারে তার বাচ্চা আক্রান্ত, তাহলে তো সেই লেপার্ড সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

গভীরভাবে নিশ্বাস টেনে টান টান হয়ে দাঁড়ালুম। অন্ধকারে কোথায় সেই ক্ষিপ্ত মা আমার মোকাবিলা করার জন্যে অপেক্ষা করছে আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু ফোঁসফোঁসানি শুনতে পাচ্ছি। মা ছাড়া বাবা লেপার্ড এবং অন্য শাবক আছে কিনা বুঝতে পারছি না।

টর্চটা বাঁ হাতে তুলে নিয়েছি। বাঁ হাতেই রাইফেলের ব্যারেল এবং ডান হাতে রাইফেলের ট্রিগার ধরে রেখেছি। ফোঁসফোঁসানি থেমে গেছে। এক ভীষণ পরীক্ষা।

পিছু হটে বেরিয়ে যাব? কিন্তু তা তো আরও বিপজ্জনক হবে। সরু সড়ঙ্গপথে যদি আটকে যাই এবং সেই সময়ে লেপার্ড যদি আক্রমণ করে তাহলে তো চরম বিপদ, অতএব যা ঘটবার এখানেই ঘটুক। আই হ্যাড টু স্টে অ্যাণ্ড ফেস দি মিউজিক। কিন্তু কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসবে?

আমি আমার বাঁ দিকে কিছুটা পিছু হটে গুহার দেওয়ালে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়ালুম। পিছন দিকটা নিরাপদ। আত্মরক্ষার জন্যে এর চেয়ে ভালো আর কি করবার আছে? শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। লেপার্ড হয়ত আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার সুযোগ খুঁজছে।

কিন্তু জন্তুটা আছে কোথায়? আক্রমণটা আসবে কোন্ দিক থেকে?

মনে মনে একটা মতলব ঠাওরালুম। নিজেকে যেন বললুম, শোনো হে ভায়া, বাচ্চাগুলো যেখানে ছিল সেইখান থেকে তোমার সার্চ আরম্ভ কর। ভালো করে সার্চ কর মন দিয়ে, একটাও পাথর যেন বাদ না যায়।

টর্চের আলোয় গুহার প্রতি ইঞ্চি মেঝে আমি দেখতে আরম্ভ করলুম। একটাও পাথরও তার ও-পিঠ বাদ দিলুম না। দেখতে দেখতে একজায়গায় আমার চোখ আটকে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মেরুদণ্ড শিরশির করে উঠল। দুটো বড় পাথরের ফাঁকে দুটো চোখের ওপর আলো পড়তেই চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। ওর চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। ঘোর কেটে গেলেই লাফাবে কিংবা বিপরীত দিক দিয়ে পালাতেও পারে, নাকি সরে গিয়ে অন্য পজিশন নিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?

মাত্র তিন চার সেকেন্ড কেটেছে, কিন্তু আমার মনে হলো আরও অনেক বেশি সময়।

মনস্থির করে ফেললুম। হাত সামান্য একটু কেঁপেছিল তারপর বেশ শক্ত করে ট্রিগার টিপে গুলি ছাড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে লেপার্ড লাফ দিয়েছে, কিন্তু বুলেটের গতি অনেক বেশি। আমি সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলুম। যেখানে আমি পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম সেই দেওয়ালে লেপার্ড ধাক্কা খেয়ে পড়ল। সে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর মাথা লক্ষ্য করে আর একটা গুলি করলুম। এত কাছ থেকে কোনো গুলিটাই ফসকায় নি।

লেপার্ডটা মরে গেল কিন্তু আমি কি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারলুম? না। প্রফেসরের বিপদ আমার মনে পড়ল। কয়েদী ছোঁড়া দুটো বা জামানি যদি পালিয়ে যায় তাহলে আমার ক্যাম্পে ফেরা মুশকিল হবে। টর্চ ও রাইফেল ধরে সেই সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে যত দ্রুত সম্ভব আমি হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরোবার চেষ্টা করলুম। হাত পা ছড়ে যেতে লাগল। কুছপরোয়া নেই।

সুড়ঙ্গ থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালুম। কয়েদী ছোঁড়া দুটো আগেই পালিয়েছে। জামানি পালাচ্ছিল। আমি ডাকতে সে থামল। আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে তাকে দেখতে পেতুম না তখন যে আমার কি দুর্দশা হতো কে জানে?

জামানি ফিরে এল বটে কিন্তু অনিচ্ছায়। মৃত পশুটাকে গুহা থেকে বার করা দরকার, ছালটা ছাড়িয়ে নিতে হবে। জামানি কিন্তু শত অনুরোধ এবং প্রলোভনেও গুহার ভেতরে ঢুকতেই রাজি হলো না। তার গভীর বিশ্বাস গুহার ভেতরে শয়তান আছে। সে চলেই যাচ্ছিল। আমি ভয় দেখাতে সে থামল। আমিই গুহার ভেতরে ঢুকে মরা জন্তুটাকে নিয়ে আসব, ততক্ষণ সে যেন অপেক্ষা করে, নইলে তাকে গুলি করে মারব।

সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে মরা পশুটাকে অতি কষ্টে বার করলুম। আঘাত লেগে পাছে চামড়ার ক্ষতি হয় সেজন্যে টেনে হিঁচড়ে বার করতে পারলুম না। আস্তে এবং অনেক কষ্ট সহ্য করে তাকে বাইরে এনে ফেললুম।

জামানিকে এবার আদেশ করলুম, ছালটা ছাড়িয়ে ফেল।

জামানির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। বলল, সর্বনাশ! আমি ওটাকে ছোঁব না। ওটা বাঘ নয়, বাঘরূপী শয়তান। যেই ওটার ছাল ছাড়িয়ে নোব আর অমনি ওর ভেতর থেকে শয়তানটা বেরিয়ে এসে আমার টুঁটি টিপে ধরবে। না, মুশুঙ্গু আমাকে এমন আদেশ করবেন না। আপনিও এখানে আর দাঁড়াবেন না, চলুন আমরা এখান থেকে চলে যাই, এখনি। বলেই সে তার ডান পা বাড়াল।

জামানি আমাকে এমনও বলল যে চলুন মুশুঙ্গু আমরা এই মুমবোয়া দেশ

ছেড়ে চলে যাই, নইলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে। আমি বলি পাগল নাকি, এত পয়সা খরচ করে এত তোড়জোড় করে এলুম, লাটবাহাদুরের কাছে কথা দিয়েছি জরিপ শেষ করব আর তোমার কথা শুনে আমরা কাজ শেষ না করে চলে যাব ?

জার্মানির কথা শুনে আমরা তাঁবু গুটিয়ে ফিরে যাই নি তবে জার্মানি এবং কয়েদীদের মন থেকে সন্দেহ দূর করতে আমাদের অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়েছিল, অসীম ধৈর্য ও কূটনীতির প্রয়োজন হয়েছিল। বস্তা বস্তা নুন, প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট এবং নানারকম উপহার ছড়িয়ে দিতে হয়েছিল, তবেই একদিন তারা সন্দেহমুক্ত হলো। তারা বুঝল যে আমরা শুধু গুহা দেখতে ও মুমবোয়ার একটা ম্যাপ তৈরি করতেই এসেছি।

আমরা যে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছি তার প্রমাণও পাওয়া গেল। ওরা আমাদের জন্যেও উপহার আনতে লাগল, ডিম, ফলমূল, পাখি, কাঠ খোদাই ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে আমরা ভুলেও কাবেনার নাম উচ্চারণ করি নি। গুহায় যেসব জীব বাস করে আমরা শুধু সেগুলির প্রতি আগ্রহী, এটা তাদের বোঝাতে পেরেছিলুম।

ওরা হয়ত ভাবত আমাদের মাথায় কিছু গোলমাল আছে, নইলে এইসব বুনো জন্তুগুলোকে দেখবার কি আছে। কিন্তু ওরা জানে না আমরা সেই মরণ-কূপটাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, একদিনের জন্যেও ভুলি নি। তবুও কি ওরা সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত হয়েছিল? একদিন আড়ি পেতে ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো ওরা মনে করে গুহা ও পশু দেখা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো মতলব আছে।

ওরা যাতে আমাদের সন্দেহ না করে এজন্যে ওরা আমাদের যে পথে বা যে গুহায় নিয়ে যেত আমরা সেখানেই যেতুম। যেসব গুহা ওরা আমাদের দেখাচ্ছে সেগুলির নম্বর দিয়ে আমরা আমাদের মানচিত্রে সেগুলির স্থান নির্দেশ করে রাখতুম।

আমাদের তিন জনের ধারণা ছিল যে জার্মানি ও কয়েদীরা জানলেও আমাদের মরণকূপের ঠিকানা দেবে না, সে পথ থেকে আমাদের দূরে রাখবে। তাদের এই ফন্দি থেকে আমরা হয়ত মরণকূপের সন্ধান পেয়ে যেতে পারি। ওরা আমাদের যে পথে যেতে নিষেধ করবে বা বাধা দেবে সেই পথেই হয়ত পাওয়া যাবে মরণ-কূপের সন্ধান। তারপর দেখা যাবে আমরা কি করতে পারি।

মরণকূপ নিয়ে আমদের এত মাথাব্যথা কেন ? কারণ ওটা সত্যিই আছে কি না আর তার রহস্যটা কি সেটা জানতে হবে না ? এভারেস্ট ছিল বলেই না মানুষ তার মাথায় ওঠবার চেষ্টা করেছিল ? সফলও হয়েছে। অজানাকে জানবার আগ্রহ মানুষের চিরন্তন। তবেই না মানুষ বড় হতে পেরেছে।

তিন মাস ধরে আমরা ঘুরে বেড়ালুম। কম করে ১২৯টা গুহা দেখলুম। দেখলুম সিংহ, বাঘ, হায়েনা, সাপ ও অন্যান্য জীব। আমাদের জুতোর গোড়ালি খয়ে গেল, জ্বরে ভুগলুম, জখম হলুম, মরতে মরতে বেঁচেও গেলুম এবং আমাদের ক্যাশবাক্স প্রায় খালি হয়ে এল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমরা নতুন কিছু শিখলুম না, নতুন কিছু দেখলুমও না।

প্রফেসর আর বিল বলল, অনেক হয়েছে, চুলোয় যাক কাবেনা, এবার ফিরে চলো। আদি মানুষ যে এইসব গুহায় বাস করত তার তো অনেক প্রমাণ আমরা পেয়েছি তবে আর কেন? এই পরিশ্রম অন্য কাজে লাগালে আমরা বিজ্ঞানকে হয়ত নতুন কিছু তথ্য দিতে পারতুম। কে জানে হয়ত একটা রত্নখনি আবিষ্কার করে ফেলতুম।

আমি আমাদের ম্যাপটা একবার দেখলুম। আমাদের ক্যাম্প কেন্দ্র হলে তার সর্বদিকে বৃত্তাকারে আমরা গুহাগুলো দেখেছি। এর মধ্যে কাবেনার সন্ধান পাওয়া যায় নি।

প্রফেসর বলল, কি দেখছ গাস্তি? হয় কাবেনা নেই কিংবা এখান থেকে এতদূরে যে কয়েদীরা সেজন্যে মাথা ঘামাচ্ছে না। আমরা কাবেনা খুঁজে পাব না।

আমি বললুম, কয়েকদিন আগে আমি এক বৃদ্ধকে বলতে শুনেছিলুম যে তাদের প্রাচীন ব্যক্তিরা তাদের একটা বিশেষ পথে যেতে নিষেধ করত। আমরাও সেই পথে যাচ্ছি না। অবশ্য সে পথ যে কোন্‌টা তা আমরাও জানি না তবে নিশ্চয় তেমন একটা পথ আছে। সেই পথের সন্ধান পেলে হয়ত কাবেনায় পৌঁছে যাব। ঠিক আছে প্রফেসর। যে গুহাগুলো তোমাদের আগ্রহ সঞ্চার করেছে সেই গুহাগুলো নিয়ে তোমরা আরও কাজ কর। দরকার হলে খনন কাজ চালাও, কিন্তু আমি আমার উদ্দেশ্য সফল করবার চেষ্টা করব। তোমরা আমাকে এক মাস সময় দাও। এই এক মাসের মধ্যে আমি কাবেনার সন্ধান না পেলে তোমাদের সঙ্গে ফিরে যাব।

সেদিন তারিখ ছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮। ওরা আমাকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিলো।

নতুন উদ্যম আশা নিয়ে আমি কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়লুম। মুমবোয়াদের সর্দার আমাকে সাহায্য করবার জন্যে কুড়ি জন লোক নিয়ে এগিয়ে এল। সর্দার ও তার দলবল আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে লাগল ফলে সকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে একদিনে আমি তেরোটা গুহা পরীক্ষা করতে পেরেছিলুম।

সেদিন আমার মেয়াদের শেষ দিন অর্থাৎ ১৩ অক্টোবর। আমিও শেষ গুহাটায়

প্রবেশ করলুম। একা। মন দ্বিধাগ্রস্ত। এক মাসের মধ্যে মরণকূপ খুঁজে বার করতে পারলুম না, হেরে গেলুম। বন্ধুরা আমাকে আর সময় দেবে না। কি আর করা যাবে! মাথা পেতে পরাজয় স্বীকার করে নিতেই হবে।

বাইরে তখন গোধূলির সোনার আলো। গুহার ভেতরে প্রায় অন্ধকার। গুহামুখ দিয়ে যেটুকু আলো প্রবেশ করেছে তাতে যা দেখলুম তাতে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক আমার সামনেই বিরাট এক পাইথন। কুন্ডলী পাকিয়ে থাকলেও মাথা অনেকটা তুলে কুতকুতে চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। সাপের চোখের দিকে চেয়ে থাকলে সম্মোহিত হয়ে যেতে হয়। জানি না, তবে এমন দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা আমার হয় নি।

সেকেন্ডের জন্যে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, কি করব স্থির করতে পারছিলুম না। তবে আফ্রিকার অভিযাত্রীদের প্রতি একটা অলিখিত নির্দেশ আছে। হাতিয়ার সর্বদা তৈরি রাখবে। আমার হাতিয়ারও তৈরি ছিল। দ্বিধা কাটিয়ে প্রায় পাইথনের মাথা ঠেকিয়ে গুলি করলুম। শরীর বিরাট হলে কি হয় মাথা তো ছোট। সেই ছোট মাথা রাইফেলের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

সাপকে আমার ভীষণ ভয়। এ যাত্রা অবশ্যই বেঁচে গেলুম, কিন্তু চকিতের ঘটনা আমাকে প্রচণ্ড নাড়া দিলো। কয়েক বছর আগে আফ্রিকায় আমার দ্বিতীয় অভিযানের সময় একটা গোখরো সাপ আমার এক পায়ে চকিতে দংশন করেছিল। তখন সাপের বিষের প্রতিষেধক সিরাম তৈরি হয় নি, হলেও আমাদের আয়ত্তে ছিল না। লোহার শিক পুড়িয়ে লাল করে ছ্যাঁকা দিয়ে আমার আফ্রিকান সহায়করা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। তবে ভীষণ জ্বরে আমি কয়েকদিন অচেতন হয়ে পড়েছিলুম। ভুল বকতুম, রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখতুম। সাপের দংশনের ক্ষতচিহ্ন আমার পায়ে আজও আছে আর আছে প্রচণ্ড সর্পভীতি। সাপ দেখলেই আমি আজও ভয়ে আঁতকে উঠি।

মুণ্ডহীন সেই অজগর মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তাই দেখে আমি ঘাবড়ে গেলুম। সাপটাকে লক্ষ্য করে আর একবার গুলি করলুম, কিন্তু আশ্চর্য, আমি ফসকালুম। বাঁ দিকে সরে গিয়ে আবার গুলি করলুম। আবার ফসকালুম।

আমার হাত কাঁপছে। কাঁপা হাতে গুলি ভরে আবার গুলি করলুম। পাইথনটা গলা কাটা মুরগির মতো তখনও ছটফট করছে। সামান্য ধাক্কা লাগলে আমি পড়ে যাব।

পাইথনটার ছাল ছাড়ান হয়েছিল। লম্বায় সেটা ছিল আটত্রিশ ফুট, মোটা অংশের বেড় ছিল তিন ফুট নয় ইঞ্চি। এই বিশাল জীব জীবিত অবস্থায় কি সাংঘাতিক বিপদই না ঘটাতে পারে।

মরবার আগে পাইথন আমাকে শেষ আঘাত করে গেল। গুহার ভেতরে জায়গা বেশি ছিল না। সেই স্বল্প পরিসরে আমি যখন সরে যাবার চেষ্টা করছি সেই সময়ে একটা জ্যামুক্ত ধনুকের ছিলা আমাকে সপাটে আঘাত করল। আমি ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলুম।

যখন জ্ঞান হলো তখন আমি আমাদের ক্যাম্পে আমার তাঁবুতে শুয়ে আছি। জামানি আমার কপালে শীতল জলপটি দিচ্ছে। আমি তাকে বিড়বিড় করে বললুম, প্রফেসর ও বিলকে ডাক। জামানি বলল, তারা এখন এখানে নেই, তুমি কথা বোলো না। চুপ করে শুয়ে থাক। আমি আবার গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লুম।

আবার যখন চোখ খুললুম তখন দেখি তাঁবুতে আলো জ্বলছে। আমার দুই বন্ধু, প্রফেসর ও বিল আমার শয্যাপার্শ্বে। প্রফেসর আমাকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করে বললেন, বিপদ কেটে গেছে। তোমার মাথা বেশ মজবুত। সাপের ঘায়ে তুমি পড়ে যাবার সময় পাথরে লেগে তোমার মাথা ফেটে গেছে।

গুহার ভেতরে গুলির শব্দ শুনেও জামানি সাহস করে উঁকি মেরেও দেখে নি। কিন্তু তারা দলে ছিল কুড়িজন এবং সর্দার সাহস দেওয়াতে আর সকলে মিলে সাহস সঞ্চয় করে গুহায় ঢুকে ব্যাপার দেখে প্রথমে কি করবে ভেবে পায় নি। শেষ পর্যন্ত তারা সকলে আমাকে গুহা থেকে বার করে তাঁবুতে বয়ে এনেছে। ভাগ্যিস ওরা দলে ভারি ছিল নইলে জামানি একা এবং মাত্র দু একজন থাকলে ওরা পালিয়ে আসতে দ্বিধা করত না। যাই হোক আমি সে যাত্রা বেঁচে গেলুম। পড়ে গিয়ে শুধু মাথা ফেটে গেলে মানুষ এমন ঘায়েল হয়ে পড়ে না। ডাক্তারী ভাষায় যাকে বলে শ্যক্ আমার তাই হয়েছিল। আকস্মিক বিপদে এমন হয়। পরে আমি বিলের কাছে শুনেছিলুম যে প্রফেসরের মতো মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। প্রথম দুদিন তিনি সারাদিন ও সারারাত্রি আমার শয্যাপার্শ্বে হাজির ছিলেন।

আমার দুর্ঘটনার পরদিনই বিল জামানি সমেত সেই কুড়ি জন নেটিভকে সঙ্গে নিয়ে সাপটার বিশাল ছাল ছাড়িয়ে এনেছিল। তারপর কোথা দিয়ে যে পুরো আট দিন কেটে গেছে তা আমি টের পাই নি। প্রফেসর ইঞ্জেকশন দিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন।

ইতিমধ্যে প্রফেসর এবং বিল নিষ্কর্মা হয়ে ক্যাম্পে চুপ করে বসে থাকতেন না। তাঁরা যথারীতি গুহা পরিদর্শনের কাজ চালিয়ে গেছেন। এদিকে আমি এক মাসের ওপর শয্যাশায়ী।

২১ নভেম্বর তারিখে প্রফেসর আমাকে বললেন, এবার তুমি তোমার স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ করতে পার। তুমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

আমি এই খবর শুনে আশ্বস্ত হতে পারলুম না। কাবেনা খুঁজে বার করার জন্যে বন্ধুরা আমাকে যে সময় মঞ্জুর করেছিল তা তো পার হয়ে গেছে। তবুও একটু ক্ষীণ আশা, বন্ধুরা হয়ত এখনি এখান থেকে চলে যাবে না। ইচ্ছে করলে তারা আমাকে নিয়ে কোনো শহরে চলে যেতে পারত অথচ গুহা পরিদর্শনের কাজ তো ওরা করে যাচ্ছে। আমি শেষবারের মতো আর কিছু দিন সময় চাইলে ওরা তা আমাকে দিতে পারে। কিন্তু আমি তখনও কল্পনা করতে পারি নি যে ওরা আমার কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছে।

ঐ ২১ নভেম্বর তারিখে আমরা তিনজনে আমাদের তৈরি ম্যাপখানা খুলে আলোচনায় বসলুম। দেখা যাক কতদূর কি কাজ হয়েছে। আমরা এবং আমি যখন শয্যাশায়ী ছিলুম তখন আমার দুই বন্ধু যেসব গুহায় প্রবেশ করেছিল সেগুলি কালো ডট দিয়ে ম্যাপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি লক্ষ্য করলুম যে দক্ষিণ-পূব দিকে একটা বৃত্তাকার জায়গা ফাঁকা। ঐ বৃত্তের মধ্যে কি কোনো গুহা নেই অথবা প্রফেসর বা বিল ওদিকে যায় নি। বৃত্তটা সাদা কেন? ঐ দিকে পাইথনের গুহাটাই শেষ গুহা দেখা যাচ্ছে। ম্যাপে উল্লেখিত তারিখ দেখে বোঝা গেল যে প্রফেসর এবং বিল ঐ সাদা বৃত্তের বাইরে অন্যান্য গুহা দেখেছে। তাহলে ঐ বৃত্তের মধ্যে যায় নি কেন?

কারণ কি জানবার জন্যে আমি প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করলুম। প্রফেসর বললেন, সর্দার তার লোকজন নিয়ে প্রত্যহ সকালে ক্যাম্পে এলে আমরা তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তুম। আমি ভাবলুম আমাদের ফিরে যাওয়া যখন আটকে গেল তখন কাবেনা খুঁজে দেখা যাক না।

সর্দার আমাদের বিভিন্ন গুহায় নিয়ে যায় কিন্তু শুধু উত্তর বা পশ্চিম দিকে, দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে কখনই নয়। তাই আমাদের ধারণা হলো সেই মরণকূপ কাবেনা এই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কোথাও আছে। পাছে সর্দার বা তার লোকজন সন্দেহ করে এ জন্যে আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে যাবার জন্যে জোর করতুম না। তবে আমাদের সঙ্গে যে নেটিভ গাইড ছিল সে একদিন আমাদের ভুলক্রমে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিয়ে যেতে যেতে সহসা থেমে গিয়ে আমাদের ফিরিয়ে আনল। তখনই আমাদের ধারণা হলো মরণকূপ এই পথে।

গাছের ছাল বা কচি ডাল অথবা ফল সংগ্রহের ছুতো করে বিল কয়েকটা গাছে চিহ্ন করে রাখল যাতে আমরা ঐ জায়গাটাতে ফিরে আসতে পারি। আমরা বিনা প্রতিবাদে গাইডের সঙ্গে ফিরে এলুম। গাইড বুঝতেই পারল না আমরা কিসের সন্ধান পেয়েছি। আসল কাবেনা না হলেও তার পথের সন্ধান তো পেয়েছি।

আমার মনে আশা জাগল। আমি যেন দেহে মনে দ্বিগুণ শক্তি ফিরে পেলুম। জামানিকে আমার কাছে রেখে প্রফেসর ও বিল বেরিয়ে পড়ল। আমি পড়লুম

জার্মানিকে নিয়ে। আমি জার্মানির সঙ্গে গল্প করতে আরম্ভ করলুম। ধাপ্পা দিয়ে কিছু জানবার চেষ্টা করলুম। তার আত্মাভিমানে ঘা দিতে লাগলুম। তাকে বললুম জার্মানি তুমি তো মুমবোয়া নও, জুলু। তাহলে মুমবোয়া যা ভয় করে তুমি বোকার মতো তাই ভয় করছ কেন? আমি যা চাই তা তুমি যদি আমাকে দেখিয়ে দিতে পার তাহলে যত শীঘ্র সম্ভব আমরা তোমাকে তোমার দেশে পৌঁছে দোব আর আমার অপেরা হ্যাটখানা যেটার প্রতি তোমার লোভ আছে সেটা তোমাকে আমি দিয়ে দোব। সেই হ্যাট মাথায় দিয়ে তুমি যখন তোমার দেশ জুলুল্যাণ্ডে নিজের গ্রামে প্রবেশ করবে তখন তোমার গ্রামবাসীরা মনে করবে তোমার মাথায় বুঝি রাজমুকুট। ভেবে দেখ গ্রামে কেমন সাড়া পড়ে যাবে। তার ওপর আমরা তোমাকে পৌঁছে দোব, তাহলে কি কাণ্ডটাই না হবে।

অপেরা হ্যাটের প্রতি জার্মানির আকর্ষণ ছিল তীব্র। লোলুপ দৃষ্টিতে সে হ্যাটটার প্রতি চেয়ে থাকত, লুকিয়ে সেটার ওপর আলগোছে হাত বোলাত। অপেরা হ্যাটের প্রলোভন জার্মানি উপেক্ষা করতে পারল না। জার্মানি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হলো। সে আমাকে বলল সে মুমবোয়াদের কথা শুনে কাবেনা সম্বন্ধে আরও তথ্য জানবার চেষ্টা করবে, কিন্তু সর্বদা ভান করবে তাদের কথা যেন শুনছে না! তারপর জার্মানি সেইসব তথ্য আমাকে জানাবে।

আমি কিন্তু মনে মনে জানি যে জার্মানি যদি কিছু জানতে পারে তো আমাকে কিছু বলবে না। তবে এও জানি যে জার্মানি আমাদের প্রতি অনুগত। ভালো না করতে পারলেও আমাদের কোনো ক্ষতি সে করবে না। আপাততঃ সে আমাদের মন যুগিয়ে চলবে, সাহায্যও করবে কারণ যত শীঘ্র সম্ভব সে তার দেশে ফিরতে চায় এবং সবার ওপর অপেরা হ্যাটের প্রতি তার দারুণ লোভ।

ইতিমধ্যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। আমার দুই বন্ধু বলছিল তারা আমার আরোগ্যলাভ সেলিব্রেট করতে চায়, কিন্তু কি ভাবে করবে তা ঠিক করতে পারছিল না।

একদিন সুযোগ জুটে গেল। বিল একটা ইনইয়ালা শিকার করল। ইনইয়ালা বড় জাতের হরিণ। এই অঞ্চলে দেখা যায় না। হরিণটাকে দেখতে পেয়ে বিল প্রথম সুযোগেই তার কপালে গুলি করেছিল। হরিণটার ওজন আড়াইশো থেকে তিনশো পাউণ্ড হবে।

নেটিভরা সেইখানেই হরিণটা কেটে ফেলল। খাবার উপযোগী ভালো অংশগুলি জার্মানি পরিষ্কার করে কেটে নিল। সেগুলি ক্যাম্পে নিয়ে এল। দু তিন দিন বেশ খাওয়া চলবে।

সেদিন কাঠের আঁচে আমি সেই মাংস থেকে পাতলা পিস কেটে রোস্ট করলুম। এই কাজটা আমি আফ্রিকাতেই শিখেছি। বন্ধুরা সেই মাংস খেয়ে আমার আরোগ্যলাভ সেলিব্রেট করল। প্রফেসরের কাছে এক বোতল সুরা ছিল। রোস্টের সঙ্গে সেই সুরা ভালোই জমল। বন্ধুদের ধন্যবাদ জানালুম। আমার কাছে কিছু চকোলেট ছিল। সেদিন সেই চকোলেট পরিবেশন করলুম।

২৯ নভেম্বর।

আমি ছ'জন নিকৃষ্ট কয়েদী ও জামানিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পাইথন গুহাটা আর একবার দেখতে চাই। আমার দুই বন্ধু গেল দু দিকে, একজন ডান দিকে আর একজন বাঁ দিকে। নিকৃষ্ট মানে একেবারেই বুদ্ধিহীন। ভয় দেখিয়ে বা মিষ্টি কথা বলে তাদের আমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নিয়ে যেতে পারব। কপাল ভালো হলে কাবেনা পৌঁছবার সন্ধান পেয়ে যেতে পারি।

পাইথন গুহার সামনে পৌঁছে আমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পা বাড়ালুম। জামানি বোধহয় আমার মতলব আঁচ করতে পেরেছিল, কিন্তু কয়েদীদের সামনে কাবেনার নাম উচ্চারণ করা বিপজ্জনক। সংখ্যায় তারা ছ' জন, বোকা হলেও দলে ভারি। সহসা আমাদের আক্রমণ করতে পারে। তাদের হাতে কোনো অস্ত্র নেই কিন্তু পাথরের অভাব নেই। অবশ্য আমার হাতে রাইফেল আছে। রাইফেল তাদের কাছে যম। আক্রমণ করতে সাহস নাও করতে পারে তবুও বলা যায় না। আমি ভয় দেখাবার জন্যে গুলি চালাবার আগে পাথরের ঘায়ে জামানিকে জখম করতে পারে।

জামানির কিছু বুদ্ধি আছে জানি কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধিও যে আছে তা জানতুম না। সে আমাকে বলল, মুশুঙ্গু তুমি যে বলছিলে সজারু শিকার করবে? তাহলে এই পথে ঐ পাহাড়টার দিকে চলো। পাহাড়ে ওদের আস্তানা, এই পথে সজারুগুলো খটখট করে ছোটাছুটি করে।

জামানি জানে রাইফেল দিয়ে সজারু মারলে তার আর কিছু বাকি থাকবে না, সজারু ধরবার অন্য উপায় আছে। তাতে সজারু জ্যান্ত ধরা পড়ে। সে উপায় বা কৌশল এই নেটিভ কয়েদীরাও জানে।

আমি বললুম, তাই চলো। অনেকদিন সজারুর মাংস খাই নি, গোটাকতক পেলে ভালোই হবে।

রাইফেলের নল দেখিয়ে কয়েদীদের আগে আগে চলতে বললুম। তারা বিনা প্রতিবাদে আমার আদেশ পালন করল। প্রতিবাদ না করলেও তারা দৃষ্টি বিনিময় করল, সাহেবটার মতলব কি?

ছোট বড় পাথর ভর্তি পাহাড়টা বেশি দূরে নয়, বেশি উঁচুও নয়, বড়জোর একটা পাঁচতলা বাড়ির সমান হবে। মুমবোয়া কয়েদীরা অনিচ্ছার সঙ্গে

চলতে লাগল।

পাহাড়ের প্রায় গোড়ায় পৌঁছলে আমি প্রথম কয়েদীকে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, সজারু দেখতে পেয়েছিস ?

পাহাড়ের গায়ে একটা ঘাসের ঝোপ দুলে উঠল। কয়েদী সেইদিকে আঙুল দেখাল, কিন্তু সজারু ধরবার জন্যে সে উৎসাহিত হলো না। সে এবং বাকি পাঁচজন সহসা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারা ভয় পেয়েছে।

জামানি তাদের ধমক দিলো, থামলি কেন ? আমার কানে কানে বলল, ওরা ভয় পেয়েছে, আমরা ঠিক পথে এসেছি।

আমিও ওদের আদেশ করলুম, কি হলো থামলি কেন ? তোরা মানুষ না ভেড়া ? সাহস নেই ?

কয়েদীরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে কয়েক পা মাত্র এগিয়ে গেল তারপর থামল। ওদের মধ্যে যার হাতে আমার বাড়তি রাইফেলটা বইতে দিয়েছিলুম সে রাইফেলটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। আর একজন দড়ির বাণ্ডিলটা নামিয়ে রাখল। তৃতীয় জন আমার টিফিন বক্স ও যন্ত্রের ব্যাগ নামিয়ে রাখল। তারপর সকলে মিলে আমার পাশ দিয়ে এমনভাবে ছুটে পালাল যেন বাঘে তাদের তাড়া করেছে।

ওরা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কেমন শান্ত হয়ে গেল। আমি ও জামানি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমাদের সেই পাহাড়। পাহাড়ে কি রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে ? সম্ভবতঃ ঐ পাহাড়ে উঠলে মরণকূপের দেখা পাব নইলে মুমবোয়াগুলো অমন ভয় পেয়ে পালাল কেন ?

জামানি জিনিসগুলো মাটি থেকে তুলে নিল কিন্তু তার মুখ দেখে বুঝলুম সেও ভয় পেয়েছে। আমি তাকে বললুম, জামানি তুই না জুলু ? তুই কি ঐ মুমবোয়াগুলোর মতো ভীতু ? চল, আমার সঙ্গে জুলু যোদ্ধার মতো জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে চল, তোর কোনো ভয় নেই।

আমার কথা শুনে সে মনে বল পেল। দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে আমার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল।

পাহাড়টার গোড়ায় ছোট বড় প্রচুর পাথর পড়ে আছে। ওপরে ওঠবার জন্যে ওরই মধ্যে আমাদের পথ করে নিতে হলো। পাহাড়ে খানিকটা উঠে বেশ বড় পাথরের একটা চাতাল পাওয়া গেল। পাহাড়টা শুধু পাথরেই ভর্তি। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে হলদে ঘাসের ঝোপ। সমস্ত পরিবেশটা কেমন থমথমে। সামান্য একটু আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না। কাছে একটাও বড় গাছ নেই যে বাতাস বইলে পাতার শব্দ শোনা যাবে। জীবিত কোনো প্রাণী আছে বলে মনে হলো না। পাথরের ফাঁকে কাঁকড়াবিছে বা গিরগিটির মতো দেখতে গিলা মনস্টার থাকতে পারে। আমি তো একটা পোকারও দর্শন পেলুম না।

মরণকূপে কি পৌঁছে গেছি ?

পিছনে জার্মানি দাঁড়িয়েছিল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি তার কালো মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সে যেন পালাতে পারলে বাঁচে। আমিও সহসা উত্তেজিত হয়ে পড়লুম। থরথর করে কেঁপে উঠলুম। একটা কিছু যেন ঘটতে চলেছে। জার্মানি যেন কিছু দেখেও দেখছে না।

চাতালের ওপর আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে। চাতালের একধারে দেখলুম দুটো বড় বড় প্রস্তরখণ্ড পাশাপাশি রয়েছে, মাঝখানে অনেকটা ফাঁক। বেশ বোঝা যায় পাথর দুটোয় মানুষের হাত পড়েছে। তাহলে কি··· ? জার্মানির দিকে চাইলুম। সে তখনও নিজেকে ধরে রেখেছে।

দুটো পাথরের মাঝে যে ফাঁক রয়েছে সেখানে নিশ্চয় একটা গর্ত বা কূপ আছে। আমি কাছে এগিয়ে গেলুম। আমার অনুমান ভুল হয় নি। বেশ বড় ফাঁক, প্রায় গোলাকার এবং একটা কূপ।

তবে কি এটাই সেই মরণকূপ কাবেনা যার ভেতরে মানুষ বা জীবজন্তু পড়ে গেলে বা ফেলে দিলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করে তাকে মরতেই হবে, যার নাম উচ্চারণ করতে মুমবোয়ারা ভয় পায়? নাম শুনে কেউ নাকি মারাও যায়?

আমার এই আকস্মিক আবিষ্কার আমি তো প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। যাইহোক আমার মনপ্রাণ ভরে উঠল। গত কয়েক মাসের কঠোর পরিশ্রম সফল হলো। আমার পায়ের নিচেই আমি সেই ভয়ংকর কূপটি দেখতে পাচ্ছি। কূপের বৃত্ত ঘিরে যেন ভীতিজনক নামটা লেখা রয়েছে—কাবেনা। কূপের মুখ দেখতে পেলেও তলদেশ ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না। কত গভীর?

কূপের কিনারে বসে আমি সাবধানে নিচে উঁকি মারলুম। অন্ধকার। কিছুই দেখা গেল না, অনুমানও করা গেল না কত গভীর তবে একটা বিশ্রী ও ভ্যাপসা গন্ধ নিচে থেকে উঠে এসে নাকে ধাক্কা দিলো। বিষাক্ত গ্যাসের গন্ধ হলে আমার মাথা ঘুরে যেত বা আমি অজ্ঞান হয়ে যেতুম। তবুও আমি সরে এলুম। নিচে ফেলবার জন্যে পাথরের টুকরোর সন্ধান করতে লাগলুম। দু কেজি আন্দাজ ওজনের একটা পাথর আমি নিচে ফেললুম। পড়বার সময় পাথরটা কূপের দেওয়ালে ঘা দিচ্ছে, সে শব্দ আমি শুনতে পেলুম, কিন্তু তলদেশে পড়বার কোনো শব্দ পেলুম না।

এবার বেশ বড় একটা পাথর তুলে নিলুম। সেটা সাত আট কেজি ভারি হবে। নিচে ফেলে কান পাতলুম। থপ্ করে একটা শব্দ হলো। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, জার্মিনি আজ রাতেই তুই অপেরা হ্যাট পাবি।

তার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে আমাকে ধন্যবাদ জানাল কিন্তু কণ্ঠস্বরে কোনো আগ্রহ নেই। কোথা থেকে থাকবে? ভয়ে সে কাঁপছে।

কাবেনা আবিষ্কার তো করলুম, কিন্তু এখন আমি কি করব ? শূন্যে বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করে প্রফেসর ও বিলকে ডাকব ? তারা আওয়াজ নাও শুনতে পারে। আওয়াজ কেন করলুম তা নাও বুঝতে পারে, কারণ আমি তাদের কোনো ইঙ্গিত দিয়ে রাখি নি। তাছাড়া আওয়াজ শুনতে পেলেও সর্দার ও তার লোকজন কি করবে ? তারা যদি হঠাৎ ক্ষেপে যায় ?

তবে আমি এখন ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারি এবং বিল ও প্রফেসরকে সঙ্গে নিয়ে কাল সকালে ফিরে আসতে পারি। তাদের আমি কি বলব ? কাবেনা আবিষ্কার করেছি, যদিও ওটা আবিষ্কারের দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। ওরা যদি জিজ্ঞাসা করে ভেতরে কি আছে দেখেছ ? দেখ নি, ভয় পেয়েছিলে ? না, তা হয় না। আলো এখনও অনেকক্ষণ থাকবে। নিচে নেমে ভেতরটা দেখতে আর কতক্ষণই বা লাগবে ? এসেছি যখন তখন দেখেই যাই। কে জানে কাল হয়ত সুযোগ নাও পেতে পারি। সর্দার ও তার লোকজন টের পেলে কি অঘটন ঘটাবে কে জানে ?

সঙ্গে দড়ি তো ছিলই। একটা মজবুত দেখে পাথরের সঙ্গে দড়ির একদিক বাঁধলুম, অপরদিক আমার কোমরের সঙ্গে। একটা থলি ছিল। সেটা খালি করে তার মধ্যে পিস্তল ও টর্চ নিলুম, তারপর সেটা আমার গলায় বেঁধে সামনের দিকে ঝুলিয়ে রাখলুম।

জামানিকে বললুম, তুই কিছুতেই এই জায়গা ছেড়ে যাবি না, দেখতেই তো পেলি আমাদের কোনো বিপদ ঘটল না, কুয়ো থেকে দৈত্যদানা বেরিয়ে এসে আমাদের গলা টিপে ধরল না। তুই আমাকে কুয়োর মধ্যে আস্তে আস্তে নামিয়ে দিবি। নিচে থেকে তোকে ডাকলে বা দড়িতে টান দিলে আমাকে তুলে নিবি। কুয়োর পাড়ে কি ভাবে বসে ও আমাকে নামিয়ে দেবে বা তুলবে তা ওকে দেখিয়ে দিলুম। ওর গায়ে তো ভীষণ জোর। আমাকে পিঠে নিয়ে পাঁচ মাইল যাবার ক্ষমতা ওর আছে কিন্তু গায়ে শুধু জোর থাকলেই হবে না, কৌশলও জানা চাই।

জামানি ঘাড় নাড়ল, ঠোঁটও নাড়ল কিন্তু কোনো শব্দ বেরোল না। "ইয়েস মুশুঙ্গু" শব্দটা ওর ঠোঁটেই আটকে রইল। যাইহোক সে আমার নির্দেশমতো দড়ি ধরে আমাকে কুয়োর মধ্যে নামিয়ে দিতে আরম্ভ করল।

আমি খুব ধীর গতিতে নিচে নামছি। আমার হাত, পা বা দেহের কোনো অংশ কূপের দেওয়াল স্পর্শ করলে ছোট বড় পাথরের টুকরো ছিটকে নিচে পড়ছে। হঠাৎ কূপের গায়ে একটা গর্ত থেকে কিছু একটা বেরিয়ে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়েই সরে গেল। আমি চমকে উঠলুম। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখা গেল না। একটা যে কোনো জন্তু সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ! কিন্তু কি জন্তু ? গেল কোথায় ? কূপের নীরবতা ভঙ্গ করে জন্তুটা কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করতে

বুঝলুম ওটা একটা পাখি, রাতের পাখি, সাধারণভাবে আমরা যাদের নাইট-বার্ড বলি। আমার মুখে তার ডানার একটা থাপ্পড় দিয়ে কূপের মুখ দিয়ে উড়ে গেল। সত্যি বলতে কি প্রথমে আমি ভয় পেয়েছিলুম, এখন বোকা বনে গেলুম।

বাইরে মানে কূপের ওপরে আর এক কাণ্ড ঘটল। কুয়োর মুখ দিয়ে কি একটা সবেগে বেরিয়ে এল। সেটা ভালো করে না দেখে অথবা দেখে জামানি তো আমার দড়ি ছেড়ে দিয়ে ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে গোঁ গোঁ করতে আরম্ভ করেছে। দড়ির অপর প্রান্ত যদি পাথরে বাঁধা না থাকত তাহলে আমায় ফিরে ওপরে ওঠার আর কোনো সম্ভাবনা থাকত না।

জামানিকে চিনতুম বলেই তার ওপর পুরো নির্ভর করি নি। কিন্তু তবুও যা ঘটে গেল তা আমাকে রীতিমতো একটা নাড়া দিলো এবং অল্পবিস্তর আহত করল।

দড়ির দৈর্ঘ্য যা ছিল তাতে কূপের তলা পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভব ছিল না। ফলে ঘোর অন্ধকারে আমি ঝুলতে লাগলুম। দড়ি বেশি লম্বা হলে হয়ত কুয়োর তলায় পড়তুম, কিন্তু ফল কি হতো তা বলা কঠিন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আমি ঝুলতে লাগলুম। কয়েক সেকেন্ড পরে সামলে নিয়ে পা বাড়িয়ে কুয়োর দেওয়ালের গায়ে পা রেখে একটু বিশ্রাম নিয়ে ভাবতে লাগলুম আজ আমি জামানির ভরসায় নিচে নামবার চেষ্টা করব কি না। আচ্ছা এটা কি সত্যিই কাবেনা? আমার মনে কয়েকটা সন্দেহ উঁকি দিলো। এটা যদি কাবেনা না হয়? নিচে যদি কোনো প্রাগৈতিহাসিক জন্তু থাকে? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিচে নামা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করব না?

ওপরে উঠে যা দেখলুম তাতে আমি অবাক। দড়িটা কেন জামানির হাত থেকে ফসকে গিয়েছিল তা জানতে পারি নি। দেখলুম জামানি দু হাত দিয়ে মাথা ঢেকে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, নিশ্চল। কথা বলবার ক্ষমতাও বুঝি হারিয়ে ফেলেছে।

অনেক চেষ্টার পর কয়েক ইঞ্চি মাত্র মাথা তুলে সে কোনোরকমে উচ্চারণ করল ভূ·· ত! ভূত···ত! ভয়ে তার দুই চোখ বিস্ফারিত। নাইটবার্ডটাও জামানির মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। দিনের আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

ভূত কোথায়? ভূত এখনি পালাবে, দেখ। আমি ছোট একটা পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে পাখিটাকে মারতেই ক্যাঁ ক্যাঁ আওয়াজ করে ডানা মেলে সেটা উড়ে গেল। একটু পরেই সেটাকে আর দেখা গেল না।

দেখলে তো জামানি তোমার ভূত কেমন পালিয়ে গেল?

জামানির সাহস কিছু ফিরে এল, সে উঠে বসল। কুয়োর বাইরে এসে মুক্ত হাওয়ায় অক্সিজেন বুকে টেনে একটু তাজা হওয়া গেল। তখন আবার আমার

চিন্তাধারা বদলে গেল। ফিরে যাব ? হার মানব ? কে বলল এটা কাবেনা নয় ? তাহলে কয়েদীরা ভয় পেয়ে পালাবে কেন ? জামানিই বা কেন ভীষণ ভয় পাবে ?

আমি আবার কূপের ভেতর নামব। এবার জামানির ওপর নির্ভর করব না। সংকল্প করে আমি শব্দহীন অন্ধকার কূপে দড়িটা ঝুলিয়ে দিলুম তারপর দু হাত দিয়ে দড়ি ধরে নামতে আরম্ভ করলুম। দড়ি ধরে এভাবে ওঠানামা অভ্যাস নেই তাই বেশ কষ্ট হতে লাগল। ওঠবার সময় যে আরও অনেক বেশি কষ্ট পেতে হবে, অনেক বেশি কসরৎ করতে হবে তা বেশ ভালো করেই বুঝতে পারলুম। কিছু দূর নামবার পর নীরবতা ভঙ্গ করে আরও দুটো নাইটবার্ড ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করে আমাকে ডানার ঝাপটা দিয়ে উড়ে গেল। কতদূর নামতে হবে জানি না।

আরও কিছুদূর নামবার পর পায়ে একটা পাথর ঠেকল। না, তলদেশে পৌঁছই নি। কূপের দেওয়ালের গা থেকে সরু ঝুল বারান্দার মতো একটা পাথর বেরিয়েছে। আমি সেই পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। পাথরটা বেশ মজবুত ছিল নইলে আমার ভারে খসে পড়ে যেত, আমিও বিপদে পড়তুম।

কি অবস্থায় কোথায় আছি একবার বোঝবার চেষ্টা করলুম। কোনো শব্দ নেই, ঘোর অন্ধকার। ওপরে যদিও সামান্য আলোর আভাস দেখতে পাচ্ছি নিচে জমাট বাঁধা অন্ধকার। মরণকূপের একটা তল আছে তো ? নাকি অতল ? কে জানে কিছুই বুঝছি না। বনে বনে ঘুরে বেড়িয়েছি, খরস্রোতা বড় নদীতে ভেলায় ভেসেছি, মরুভূমিতেও সিমুম ঝড়ের মুখে পড়েছি, নানারকম অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু কূপের মধ্যে এমন অভিজ্ঞতা হয় নি। আমার জন্যে কি বিপদ অপেক্ষা করছে জানি না, কি করে বিপদের মোকাবিলা করব তাও জানি না। দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছেও যদি পা রাখবার মজবুত জমি না পাই তাহলে কি হবে ?

ভেবে লাভ নেই। যা হবার তা হবে, শেষ না দেখে ছাড়ছি না। নামতে আরম্ভ করলুম। আমার ভাগ্য কিছু ভালো। তারপর ঝুল বারান্দার মতো আরও চারটে পাথর পেয়েছিলুম, সেজন্যে দম নেবার সুযোগ পেয়েছিলুম।

পঞ্চম পাথরটা সামান্য বেশি চওড়া। একটু ভালোভাবে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে টর্চ জেবলে নিচেটা দেখবার চেষ্টা করলুম। আমার দুর্ভাগ্য। কূপের গা অত্যন্ত অসমতল, আঁকাবাঁকা। খানিকদূর গিয়ে টর্চের আলো বাধা পেল, তলদেশ দেখা গেল না। নিরাশ হলুম। তা বলে আমি নিরস্ত হলুম না।

জামানির কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু কি বলছে বুঝতে পারছি না। আমি উত্তর দিচ্ছি, সে শুনতে পাচ্ছে কিনা জানি না। পঁচাত্তর ফুট

লম্বা দড়ির পঞ্চাশ ফুট নেমে এসেছি। আর পঁচিশ ফুটের মধ্যে কি তলদেশ পাব না? না পেলে সব পরিশ্রম ব্যর্থ।

কূপে কোনো হানিকর গ্যাস নেই তবে দুর্গন্ধটা নাকে সহ্য হয়ে গেছে। হাত ব্যথা করছে, পা কমজোরী মনে হচ্ছে। ঘামে সারাদেহ ভিজে গেছে। দাঁড়াবার মতো আরও একটা পাথর পাওয়া গেল। সেটার ওপর দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বার করলুম। কপালের ঘাম ও চোখ মুছতে হবে।

সহসা পাথরটা খসে পড়ল। আমি চিৎকার করে উঠলুম। ভাগ্যিস দড়িটা ধরে ফেলেছিলুম নইলে বেকায়দায় পড়তে থাকলে মাথায় জোরে আঘাত লাগত। দড়ি ধরে ফেললেও আমার নিচের দিকে পড়া বন্ধ হলো না। ভাগ্যে দড়ি আমার কোমরে বাঁধা ছিল। দড়িটা ভালো করে ধরতে পারি নি। ভালো করে ধরবার চেষ্টা করছি কিন্তু দু হাতেই তীব্র যন্ত্রণা। তার ওপর কূপের দেওয়ালে ধাক্কা খাচ্ছি। মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করছি, দু হাতে ও সারা দেহে কে যেন ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছে।

যন্ত্রণার বুঝি শেষ হলো, কিন্তু এমনভাবে শেষ না হলেই ভালো হতো। দড়ি শেষ হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হলো কোমর থেকে আমি বুঝি দুভাগ হয়ে গেলুম। দড়ি বেশ মজবুত ছিল, ছিঁড়ে গেলে পাথরের টুকরোর মতো ছিটকে নিচে পড়তুম এবং তারপর কি ঘটত কে জানে। তবে আপাততঃ প্রাণে বেঁচে গেছি। হাড়গোড় না ভাঙলেও সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত, নানা জায়গা থেকে রক্তপাত হচ্ছে। হাত দিলে হাতে রক্ত লাগছে।

সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণা দিয়েছে জীবনরক্ষাকারী আমার দড়ি। দড়িতে আমার কোমর বাঁধা না থাকলে আমি নিশ্চিত নিচে পড়ে যেতুম এবং ফল হতো মারাত্মক। আমাকে আর বেঁচে ওপরে উঠে আসতে হতো না। পাথরের ওপর পড়ে হয়ত মাথা ফাটত কিংবা হাড়গোড় ভাঙত। সেই অবস্থায় ওপরে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব হতো কিন্তু এ ছাড়া সাক্ষাৎ মৃত্যু আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

দড়ির প্রান্ত কোমরে বাঁধা ছিল তাই হঠাৎ পড়ে যাওয়ার ফলে হ্যাঁচকা টানের জন্যে কোমরে ভীষণ আঘাত পেলুম। মনে হলো দেহ বুঝি দু টুকরো হয়ে গেল। সে অঘটন ঘটে নি।

ঝুলন্ত অবস্থায় কূপের দেওয়ালে একদিকে কোনোরকমে পা রেখে দেহটাকে আগে খাড়া করলুম। তারপর কোমরের বাঁধন খুলে নিচে নামা যাবে। থলের মধ্যে পিস্তল ও টর্চ ছিল। এবার বাঁধন খুলে নিচে নামার চেষ্টা করা যেতে পারে। তার আগে নিচেটা দেখা দরকার।

টর্চটা জ্বাললুম। নিচেটা বেশ প্রশস্ত, ওরই মধ্যে একটা গুহা মতো আছে।

আমি কার করোটি দেখ্ছি ?

কূপের মেঝে দেখলুম। পাথরের ওপর প্রচুর কংকাল, সবই মানুষের। চারটে কংকাল ছাড়া সবগুলো হলদে হয়ে গেছে এবং খুব পুরনো মনে হলো। কিন্তু কংকালের ভেতরে কি নাড়াচাড়া করছে? কংকালগুলো ভূত হয়ে জেগে উঠবে নাকি?
যেখানে কংকালগুলো নড়ছিল তার ওপর টর্চের আলো ফোকাস করলুম। সর্বনাশ! বিষধর গোখরো সাপ! একটা নয়, একে একে সাতটা সাপ বেরিয়ে এল। তাদের রাজ্যে অনভিপ্রেত একজন ঢুকে পড়ায় তারা বিরক্ত। মাথা তুলে হিস্‌হিস্‌ করতে লাগল। ভাগ্যক্রমে আমি তাদের নাগালের বাইরে। এইজন্যে আগে উল্লেখ করেছি আমার জন্যে সাক্ষাৎ মৃত্যু অপেক্ষা করছিল। বাঁ হাতে টর্চ ধরে একে একে ছ'টা সাপকে গুলি করলুম। সপ্তম সাপটা একটা ফাঁক দিয়ে পালিয়ে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে হাওয়া আসছিল। ফাঁকটা নিশ্চয় দীর্ঘ, তার অপর মুখ পাহাড়ের অন্যদিকে।
অনেকে মনে করেন ভারত ছাড়া আর কোথাও গোখরো সাপ নেই। এ ধারণা ভুল। সামনে দাঁত আছে এমন জাতের চৌদ্দ রকম সাপ আমি আফ্রিকায় দেখেছি তার মধ্যে চার রকম গোখরো সাপ আছে।
ছটা সাপই মরবে। সেগুলো মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। আর কোনো জীবের সন্ধান পাওয়া গেল না। এবার নামা যেতে পারে। কোমরের দড়ি খুলে এবং সেটি ধরে নিচে ঝুপ করে নেমে পড়লুম।
নামলুম এক রাশ হাড়ের ওপর। নেমে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে পা টলে পড়ে গিয়েছিলুম। উঠে দাঁড়িয়ে অসাড় হাত-পাগুলো ম্যাসাজ করে রক্তপ্রবাহ চালু করলুম। শার্ট ছিঁড়ে কয়েকটা ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করলুম। তারপর যে ফাটল দিয়ে একটা সাপ পালিয়ে গিয়েছিল সেই ফাটলটা হাড় গুঁজে বন্ধ করলুম।
টর্চ জেবলে কাছ থেকে চারদিক দেখলুম। এক জায়গায় চারটে নরকংকাল রয়েছে। চারটে কংকালেরই বাঁ হাত কাটা। চোরের সাজা হিসেবে মুমবোয়ারা চোরের বাঁ হাত কেটে দেয়।
আমার মনে পড়ল সেই রমণীর কথা যে হুইংকল সাহেবের কাছে অভিযোগ করেছিল তার চার ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এ নিশ্চয় মুমবোয়া সর্দারের কীর্তি যে এদের সাজা দিয়ে এই মরণকূপে ফেলে দিয়েছিল। যাতে কেউ এসে তাদের লাশ উদ্ধারের চেষ্টা না করে এজন্যে ঐ কূপ সম্বন্ধে বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল। হতভাগ্য ঐ চার ভাইয়ের কথা মনে করে আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করলুম। আহা! কি অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে চার ভাই মারা গেছে।
এবার এই কবরখানা থেকে আমাকে ফিরে যেতে হবে। সহসা আমি অত্যন্ত ভয় পেলুম। কারা যেন আমার সারা দেহে শত শত ছুঁচ ফোটাতে লাগল।

আমিও কি এই কূপে একদিন কংকালে পরিণত হব? আমি এখন কি করে ওপরে উঠব?
যে দড়ি আমার প্রাণ রক্ষা করেছিল সেই দড়ি এখন আমার নাগালের বাইরে। না, জার্মানি সেই দড়ি টেনে তুলে নেয় নি। দড়ির দৈর্ঘ্য যে কূপের তলদেশ পর্যন্ত নয়, কিঞ্চিৎ ছোট, বন্ধনমুক্ত হবার সময় আমার এ খেয়াল হয় নি। এখন উপায়!
দড়ি ঝুলছে কিন্তু আমার হাত পৌঁচচ্ছে না। সামনে নির্মল জল রয়েছে, আমি তৃষ্ণার্ত কিন্তু আমি হাত বাড়িয়ে সেই পানীয় জলের নাগাল পাচ্ছি না। আমার এখন সেই করুণ অবস্থা। আমি বৃথা চিন্তা করছি কেন? এখান থেকে আমাকে উদ্ধার পেতেই হবে।
সারা দেহে তীব্র বেদনা। অনেক জায়গায় কেটে গেছে ছড়ে গেছে। সামনেই দড়ি ঝুলছে, নাগালের বাইরে। কোমর থেকে দড়ি খোলবার সময় আমার একবারও কেন খেয়াল হলো না যে দড়ি ছেড়ে দিলে আমার নাগালের মধ্যে থাকবে না? কিন্তু তখন আমি কোমরের যন্ত্রণায় কাতর, মুক্তি পাবার জন্যে বাঁধন খুলতে ব্যস্ত। দড়ির হিসেব মাথায় আসে নি।
শরীরের ব্যথাবেদনা উপেক্ষা করে দড়ি ধরবার জন্যে আমি একবার, দু'বার, তিনবার লাফ দিলুম। পাঁজরে কে যেন ছোরা বসিয়ে দিচ্ছে, লাফাবার সময় এমনই অসহ্য বেদনা আমাকে সহ্য করতে হলো। দড়ির নাগাল পেলুম না, মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ফসকে গেল।
জার্মানি, জার্মানি, বেশ কয়েকবার চিৎকার করলুম। ফুসফুস বুঝি ফেটে যাবে তবুও প্রাণপণে চিৎকার করলুম। সেই শব্দ জার্মানির কানে পৌঁছল না। প্রতিধ্বনি ফিরে ফিরে এল। কি করা যায়?
বিপদে পড়লে অনেক সময়ে বুদ্ধি খোলে। গুহায় অনেক পাথর রয়েছে। তাই পরপর জড়ো করে তার ওপর উঠে দাঁড়ালুম। পাথরগুলো মজবুত করে বসানো না গেলেও তার ওপর নিজের ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে দড়ির নাগাল পেলুম। প্রথমে অন্ধকারে দড়ি দেখতে পাই নি। টর্চ জ্বাললুম। টর্চের আয়ু আর বেশিক্ষণ নয়, আলো হলদে ও ক্ষীণ হয়েছে। সেই ক্ষীণ আলোতেই দড়ির প্রান্ত ধরে টানলুম? দড়ি বেশ খানিকটা গুটিয়ে গিয়েছিল, কয়েকটা গিঁটও ছিল। গিঁট খুলে দড়ি টেনে লম্বা করলুম। আঙুলগুলো এবং হাতে খুব ব্যথা। কি করে দড়ি ধরে উঠব বুঝতে পারছি না। তবুও উঠতেই হবে। শরীরও রীতিমতো ক্লান্ত এবং শক্তিহীন।
টর্চ প্রায় নিবে এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি টর্চ ও পিস্তল থলেতে ভরে ফেললুম। পিস্তলে আর গুলি নেই, শেষ হয়ে গেছে। আর এই সঙ্গে ভরে নিলুম একটা পুরনো করোটি আর কয়েকটা হাড়। নৃতত্ত্ববিদরা হয়ত এগুলি

থেকে প্রাচীন যুগের কিছু সন্ধান পেতে পারে।

এবার দাঁতে দাঁত চেপে দড়ি বেয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা আরম্ভ করলুম। কয়েক ফুট উঠে দড়িতে পা জড়িয়ে তার ওপর ভর দিয়ে অতি কষ্টে উঠতে লাগলুম। ওঠবার সময়েও গুহার গা থেকে বেরিয়ে থাকা সেই পাথরগুলোর সাহায্যে কিছু বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেয়েছিলুম, তবুও সে যে কি যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিল তা আমি বোঝাতে পারব না। জীবনে এমন যন্ত্রণা আমি কখনও ভোগ করি নি, এমন বিপদেও পড়ি নি।

গলা শুকিয়ে গেছে। জামানিকে ডাকতে পারছি না। আমার ডাক শুনতে পেলে সে হয়ত আমাকে টেনে তুলতে পারত। কে জানে সে হয়ত পালিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ওপরে যে উঠতে পারব এমন আশা করতে পারি নি, কিন্তু তাও পারলুম।

জামানি আমার ভূত নিয়ে ফিরল

কূপের মুখ থেকে গলা বার করে দেখতে পেলুম জামানি বসে আছে। আমার শেষ বিন্দু শক্তি তখন শেষ হয়ে গেছে। উঠতে পারছি না। ছুটে এসে আমাকে টেনে তোলার ইচ্ছা জামানির মধ্যে মোটেই দেখা গেল না।

গলা দিয়ে স্বর বেরোতে চাইছে না। তবুও অনেক চেষ্টা করে বললুম, জামানি শিগগির আমাকে টেনে তোল।

জামানির কড়ে আঙুলটাও নড়ল না। সে বিকৃত কণ্ঠে বলল, মুশুঙ্গু তুমি ভূত হয়ে উঠে এসেছ, বলে সে যেন প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেল।

আমি প্রায় পড়ে যাচ্ছিলুম। দাঁত চেপে দম বন্ধ করে দড়ি ধরে কোনোরকমে সামলে নিলুম। কি করে যে পারলুম, জানি না অনেক আশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যার ব্যাখ্যা করা যায় না, এও সেইরকম একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা।

মরণকূপের ধারে রাখা সেই পাথর ধরে আমি আস্তে আস্তে অনেক কষ্টে ওপরে উঠে শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলুম। আমার তখন মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু বুঝি আসন্ন।

কাছেই জামানি একনাগাড়ে প্রলাপ বকে চলেছে, হায় মুশুঙ্গু তুমি মরে গেছ। আমি জানি ঐ মরণকূপে ঢুকলে কেউ বেঁচে ফিরে আসে না। থলের মধ্যে তুমি তোমার হাড়গোড় কেন ভরে আনলে ? আমি তো তোমার অনুগত ভৃত্য, কিন্তু আমাকে তুমি এমন শাস্তি কেন দিলে ?

জামানির প্রলাপ শুনে আমার তখন হাসবার ক্ষমতাও ছিল না।

জামানি আমার 'ভূতকে' নিয়ে যখন ক্যাম্পে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। আমি যে আর আত্তিলিও গাত্তি নই, আমার ভূত আত্তিলিও গাত্তির রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কাজকর্ম করছে, এই ধারণাটাই জামানির মাথায় শেকড় গেড়ে বসেছে। সে তার এই দৃঢ় ধারণা থেকে এক চুলও বিচ্যুত হচ্ছে না।

সে তার এই ধারণা নিয়ে সেদিন রাতে যে রান্না করেছিল তা আমার খুব ক্ষিধে না পেলে খেতে পারতুম না। সেই খাবার খেয়ে আমার বন্ধুদের সামনে তার মাথায় অপেরা হ্যাট পরাবার পরও আমার ওপর তার ধারণা বদলান গেল না। তার চোখে আমি ভূতই রয়ে গেলুম। আমি আমার ভৌতিক দশা থেকে মুক্তি না পেলে জামানি শান্তি পাবে না। আমরা তিন পাগল কাবেনার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করতে না পারলে শান্তি আসবে না এবং শীঘ্র ভূতের

উপদ্রব শুরু হবে। এইসব অসম্ভব ধারণা জামানির মাথায় বাসা বাঁধায় আমাদের সুবিধাই হলো।

যাতে আমরা কাবেনার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারি এজন্য সে পরদিন সকালে আমাদের তিনজনের সঙ্গে কাবেনায় যেতে রাজি হলো। আরও আশ্চর্যের বিষয় মাল বইবার জন্যে সে গত কালের চারজন কয়েদীকেও সঙ্গে যেতে রাজি করাল। জামানি তাদের সঙ্গে কি কথা বলেছিল, তাদের কি বুঝিয়েছিল বা কি কৌশল প্রয়োগ করেছিল আমরা জানি। না তবে তারা বিনা প্রতিবাদে আমাদের মালপত্তর নিয়ে আমাদের সঙ্গে মাত্র একদিন নয় কয়েকদিন যাওয়া আসা করেছিল। অবাক হবার মতো ব্যাপার।

আমি যে মরণকূপে নেমেছিলুম এবং আবার উঠে এসেছি এই খবর পেয়ে মুমবোয়া সর্দার কোথায় ভেগে পড়ল আর তাকে দেখা গেল না।

কূপের ভেতরে সুড়ঙ্গ, তলদেশ ও সংলগ্ন গুহাটির অনুসন্ধান চালাতে হলে কয়েকদিন সময় লাগবে এজন্যে সময় ও পরিশ্রম বাঁচাবার জন্যে আমরা আমাদের ক্যাম্প পাহাড়ের কাছে সরিয়ে আনলুম। এতে কাজ করার সুবিধা হবে।

কূপ থেকে বেশ কিছু ফসিল, পাথরের অস্ত্র ও অলংকার পাওয়া গেল। সে সবগুলি পরীক্ষা করবার পর আমরা ভাগ করে কিছু নিদর্শন পাঠালুম নর্থ রোডেশিয়া সরকারের কাছে, কিছু প্যারিসে সবরোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে, অ্যামেরিকান মিউজিয়ম অফ ন্যাচারাল হিস্টরি, অ্যারিজোনা ইউনিভারসিটি, ইটালির ফ্লোরেন্সে রয়েল অ্যানথ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়মে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গ ইউনিভারসিটিতে। তারা পরীক্ষা করে কি পাবে বলতে পারি না তবে নিদর্শনগুলি যে ভূতগ্রস্ত নয়, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।

আমাদের কাজ শেষ হওয়ার পরই আমরা চারজন কয়েদীকে পারিশ্রমিক বাবদ তাদের বেতন মিটিয়ে দিলুম। এত অর্থ তারা একসঙ্গে কোনোদিন চোখে দেখে নি। আমরা তাদের কাজে সন্তুষ্ট শুনে কমিশনার সাহেব তাদের মেয়াদের বাকি অংশ মকুব করে দিলেন। তারা তখন মুক্ত।

জামানিকে বললুম, জামানি এবার তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, তোমাকে, তোমার মাথায় অপেরা হ্যাট পরিয়ে আমরা জুলুল্যাণ্ডে তোমার গ্রামে পৌঁছে দেবো।

জামানি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারল না। তার কি এমন সৌভাগ্য হবে? সে আমাকে বলল, কি বললেন আর একবার বলুন।

কেন? তুমি কি কানে শুনতে পাও না? নাকি আমাদেব কথা বিশ্বাস কর না?

জামানি বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, বিশ্বাস করি মুশুঙ্গু, তবুও আর একবার

লুন, কারণ আমার বিশ্বাস কোনো মুশুঙ্গু জীবিত অবস্থায় আমার গ্রামে
াবে না যদি না সে ভূত হয়ে তার নিজের দেহে বাসা বেঁধে থাকে। আপনি
াপনার নিজের ভূত।

ামানির সঙ্গে তর্ক বাড়িয়ে লাভ নেই। জামানি যাক বা না যাক, তার সঙ্গে
ামরা যাই বা না যাই আমাদের জুলুল্যাণ্ডে যেতেই হবে, কারণ মুমবোয়াতে
ামরা যে কাজ করেছি তার কৃতিত্বের জন্যে আমাদের উত্তর জুলুল্যাণ্ডের
ংরক্ষিত এলাকায় যাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। লিভিংস্টোনে থাকবার
ময় আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছ থেকে নর্থ জুলুল্যাণ্ডে যাবার
নুমতি পত্র, কিছু সাজসরঞ্জাম ও আমাদের ট্রাক জোম্বেসি নদী পার
রবার জন্যে ফ্ল্যাট ক্যারিয়ারও পাওয়া গেল। জামানি অপেক্ষা আমরা বেশি
ল্লসিত। আমরা যাত্রা করব নাটাল অভিমুখে।

াত্রা তো করলুম কিন্তু তখনও জানি না আমরা আর এক উত্তেজনাপূর্ণ,
াঞ্চল্যকর, রোমাঞ্চময় বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি। আর বিপদসংকুল
টনাটি আমার জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে পূর্ণ
ক নাটক।

নাটকে নায়ক আছে, নায়িকা আছে, ভিলেন আছে এবং যথারীতি পার্শ্বচরিত্র
াছে। ভিলেনের নামটাই আগে বলা যাক। ভিলেন মানুষ নয়, ক্ষুধার্ত
রখাদক একটি সিংহ। আরও একটি ভিলেন আছে। সে হলো একজন গুণিন
া উইচ ডক্টর। বিষাক্ত তীরের মতোই তার ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ন। কয়েক শত
র্শা ও তীরধনুক সজ্জিত জুলু যোদ্ধা মোতায়েন ছিল যারা ক্ষিপ্ত হলে
নিষ্ঠুর বর্বর তাদের কাছে নিরীহ বেড়াল বিশেষ।

ায়িকা সরল নিরাবরণ এক ষোড়শী, যার একমাত্র সজ্জা রঙিন পুঁথির একটি
কামরবন্ধনী। নায়ক বলিষ্ঠ ও সাহসী এক যুবক, অশ্বের মতো টগবগে।
কানো বিপদই সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর ও করুণ দৃশ্য আমি
ভুলতে পারছি না। নায়ককে একটি গাছে বাঁধা হয়েছে। যোদ্ধারা একে একে
তার দেহে বর্শার খোঁচা দিতে থাকবে যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়।

পার্শ্বচরিত্রের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সর্বাধিনায়ক প্রধান সর্দারের নাম,
ার মুখের কথাই আইন, যার কোনো কথার প্রতিবাদ করতে কেউ সাহস করে
া। এ ছাড়া ইচ্ছা না থাকলেও আমরাও নাটকের সামিল হয়ে গিয়েছিলুম।
র ওপরও ছিল এক পাল সিংহ যারা সমস্ত এলাকাটায় দারুণ ত্রাসের সঞ্চার
করেছিল।

জুলুল্যাণ্ডের ঐ সংরক্ষিত এলাকায় পৌঁছে লক্ষ্য করলুম অধিবাসীদের মনে
ার অশান্তি। রাজনীতিক কোনো কারণ নয়। কারণ হলো অনাবৃষ্টি।

নির্দিষ্ট সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে, কিন্তু এক ফোঁটাও বৃষ্টি হ
নি। বৃষ্টি না হলে সকলের জীবন বিপন্ন, আমরাও বাদ যাব না।
বিরাট এক চুল্লীর ওপর বিরাট এক কড়া আমরা লক্ষ্য করেছিলুম যাতে জ
ফুটলে ফুটন্ত জলে কোনো জ্যান্ত মানুষকে নামিয়ে দেওয়া হয়। মানুষে
সেদ্ধ মাংস এদের খুব প্রিয়। আর অবিশ্বাস্য এক ভূমিকা গ্রহণ করেছি
আমার ক্যামেরা। ক্যামেরা না থাকলে বহু জীবনহানি হতো। সভ্যতা
সংস্পর্শে যেসব মানুষ আসে নি তাদের কাছে যে কোনো যন্ত্র ভেল্কি দেখি
তাদের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। তাই করেছিল আমার ক্যামেরা।
মঞ্চশয্যা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি হৃদয়গ্রাহী যার প্রধান আকর্ষণ উত্ত
জুলুল্যান্ডের এনইয়াতি পাহাড়ের সেই অবিসম্বাদী একনায়ক। নাটকে
অভিনয় যথাসময়ে দেখান হবে।
অধিকাংশ সরঞ্জামসহ আমাদের ট্রাক ননগোমায় রেখে দিলুম। জামা
আমাদের সঙ্গে যাবে। মাল বইবার জন্যে সে এগারোজন মালবাহী ছোক
যোগাড় করেছিল। যেসব সামগ্রী ছাড়া আমাদের চলবে না সেগুলি বাক্সবন্দ
করে ছোকরাদের ঘাড়ে চাপিয়ে উন্মুক্ত তৃণপ্রান্তর ও পরে অনুচ্চ বৃক্ষে
অরণ্যভূমি অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম দিকে আমরা এনইয়াতি পাহাড়ের দি
যাত্রা করলুম। পথে কোনো হিংস্র প্রাণীর দেখা পাই নি তবে প্রাকৃতিক শোভ
পটভূমিতে মাঝে মাঝে জিরাফ, জেব্রা ও হরিণের পাল অনির্দিষ্টভাবে ছু
পালাচ্ছিল। কিন্তু একজন মানুষেরও দেখা পেলুম না। ওরা নাকি গাছে
আড়াল থেকে আগন্তুকদের প্রতি লক্ষ্য রাখে ও যথাস্থানে খবর পাঠিয়ে দেয়।
আমরা যেখানে যাচ্ছি সেটা জুলুদের সংরক্ষিত রাজ্য। কেবলমাত্র গোষ
লড়াই ব্যতীত ইংরেজ শাসকরা হস্তক্ষেপ করে না। শাসনক্ষমতা প্রধ
সর্দারের ওপর, যে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ইংরেজ শাসকরা জুলুদের ব্যাপা
নাক গলালে ওরা মোটেই বরদাস্ত করে না। এইজন্যেই এরা এদের সুপ্রাচী
ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রেখেছে।
জুলুদের এই এলাকায় প্রবেশ করার অনুমতির জন্যে আমাকে বছরের প
বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। মুমবোয়াদের বিরক্ত না করে আমরা সরক
অর্পিত কাজে সফল হওয়ার পর ব্রিটিশ তথা রোডেশিয়া সরকার আমাকে
অনুমতি দিয়েছে। অনুমতিপত্রে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল যে আত্তিলিও গা
তার সঙ্গী ও মালবাহীদের জীবন ও সম্পদ সম্বন্ধে রোডেশিয়া সরকার দা
থাকবে না।
এই প্রস্তাবে আমি মোটেই নিরাশা বা হতাশ হইনি। জুলুদের ভাষা অ
উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছি, অনর্গল বলতে পারি। আফ্রিকায় দীর্ঘকাল ধ
ব্যাপক ভ্রমণ করে আমি বনবাসী আফ্রিকানদের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ

র্জন করেছি। তবে এনইয়াতি পাহাড়ের জুলুদের আমি না দেখলেও বা না নলেও আমার বিশ্বাস আমি ওদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব। জামানির খে শুনেছি ওরা সাহসী, অহংকারী, সৎ ও অকপট, মন ও মুখ এক। ওরা খনও ওদের প্রাচীন ঐতিহ্য আঁকড়ে আছে, পুরনো পদ্ধতি বর্জন করে নি। লুরা আফ্রিকার অন্যতম মহান আদিম জাতি।

জিপুসো সর্দারের গ্রামে

একটি পাহাড়ের গোলাকার মাথার ওপর ওদের গ্রাম। সার সার কুটির আমরা বিশ্বাস ও সাহসের সঙ্গে সেই গ্রামের দিকে এগিয়ে চললুম। এই গ্রামের তথা এই এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হলো জিপুসো, প্রবল প্রতাপ সর্দার, যার কথায় বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। এই গ্রামে আমাদের থাক না থাকা এর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। জিপুসো আমাদের প্রতি সদয় হলে আমরা গ্রামে শান্তিতে বাস করতে পারব, নির্ঝঞ্ঝাটে আমরা নরবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের গবেষণা চালাতে পারব। আর সে যদি আমাদের প্রতি বিরূপ হয় তাহলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

পাহাড়ে উঠতে উঠতে দম নেবার জন্যে একটু থেমে প্রফেসর বলল, বুঝলে হে সর্দারের বোধহয় চল্লিশটা বৌ আছে।

এমন একটা আবিষ্কারের জন্যে বিশেষ জ্ঞানের দরকার হয়। এক একজন জুলু কর্তার এক একটা গ্রাম। বাড়ির কর্তা বাস করে সবচেয়ে বড় কুটিরে। আর গোয়াল ঘিরে এক একটি কুটিরে একজন স্ত্রী ও তার সন্তানরা বাস করে। এছাড়া অন্যান্য কুটিরও আছে। জুলুদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশি না হলে একজন পুরুষ এত স্ত্রী কোথায় পাবে? একজন পুরুষের যদি কুড়িজন স্ত্রী থাকে তাহলে স্বামীর কুটির ব্যতীত অন্তত কুড়িটা কুটির এবং গোয়াল তো থাকবেই। একটা গ্রামের পক্ষে আর কি চাই? তাই জিপুসোর কুটির ঘিরে অনেকগুলি কুটির একটি গ্রাম তৈরি করেছে।

আরও কিছু এগিয়ে আমরা দেখলুম গ্রামের সামনে এক জনতা। জনতা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমরা যে আসছি এ খবর পূর্বে দিই নি অথচ এদের চর ঠিক খবর রেখেছে। আমরা টের পাই নি, ডুগডুগির শব্দও শুনি নি।

জনতার মধ্যে মাঝখানে পুরুষরা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে আর তাদের দুপাশে সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে তারা উত্তেজিতভাবে চড়ুই পাখির মতো অনর্গল চটরপটর করে কথা বলে যাচ্ছে। পরে জানতে পেরেছিলুম এইসব লোক কাছাকাছি গ্রাম থেকেও এসেছে, এমন কি কয়েক মাইল দূর থেকেও আমাদের যথাসময়ে দেখবার জন্যে দলে দলে এসেছে।

ছোট ছোট গাছের মধ্যে দেবদারু গাছের মতো মাথা উঁচু করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রধান সর্দার জিপুসো। তার পোশাকের খুব একটা আড়ম্বর নেই আমরা আসছি বলেই হয়তো লেপার্ডের চামড়া দিয়ে দেহ আবৃত করেছে আর

কোমরে একটা ঘুনসির মতো দড়িতে ঝুলছে কয়েকটি বিরল পশুর লেজ বা তাদের লোমগুচ্ছ। মাথায় পালকের মুকুট। রোদ পড়ে চিকচিক করছে, হাওয়ায় পালকগুলো তিরতির করে কাঁপছে। স্বীকার করতেই হবে জিপুসোর মধ্যে অসাধারণ একটা ব্যক্তিত্ব, তার চোখমুখ এবং বাদামী সুঠাম ও পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ বলে দিচ্ছে যে এ লোক অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র।

আমি এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে হাসিমুখে বললুম, "সালাগাতলে", শান্তি, শান্তি, শান্তিতে থাক।

জিপুসোও তার ডান হাত তুলে হাসিমুখে বলল, "সাগুবোনা জা বাবা" শান্তির দূত তোমরা এস বাবা।

জামানি সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হয়ে তার প্রভুকে প্রণাম জানাল। জামানির দিকে একবার মাত্র ক্ষণিকের জন্যে চেয়ে তার প্রণাম স্বীকার করে নিয়ে আমাদের বলল, মনে হচ্ছে তোমরা এই ছোকরার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছ।

জিপুসোর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলুম আমরা তার মন জয় করতে পেরেছি। আমরা একজন বন্ধু পেলুম, ওর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব। এই বন্ধুভাব জনতার মধ্যেও সঞ্চারিত হলো। তারা অনুমান করল মুশুঙ্গুরা তাদের ক্ষতি করতে আসে নি। জামানির মুখের অকৃত্রিম প্রাণখোলা হাসি এবং বন্ধুদের সঙ্গে আলিঙ্গন ও হাত ঝাঁকুনি যেন বলে দিলো যে আমি যাদের সঙ্গে এসেছি তারা ভালো লোক, তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।

সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা তাদের বর্শা ও ঢাল তুলে এবং "জিমালায়া" ধ্বনি তুলে এবং মেয়েরা তাদের কলকণ্ঠে আকাশ কাঁপিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানাল।

কারুকার্য খোদাই করা মেহগনি কাঠের চৌকি এনে আমাদের বসতে দেওয়া হলো। বাউলদের লাউ-এর মতো পাত্র করে এল বাজরা গাঁজিয়ে তৈরি সুরা। সুরা পান করতে করতে জিপুসো ও অন্যান্যদের সঙ্গে আমরা আলাপ করতে লাগলুম।

আমাদের তাঁবু ফেলে পাকাপাকিভাবে ক্যাম্প স্থাপন করবার জন্যে জামানি পাহাড়ে আমাদের জন্যে ছোটখাটো একটা উপত্যকা খুঁজে বার করল। বেশ গাছপালা আছে। কাছেই নির্মল জলের একটা ঝর্ণাও আছে। অনাবৃষ্টির ফলে ঝর্নাধারা এখন ক্ষীণ হলেও আমাদের জলের অভাব হবে না।

আমাদের মালবাহী ছোকরারা কয়েক দিনের মধ্যে আমাদের সমস্ত মালপত্তর পৌঁছে দিলো। আমরা গুছিয়ে বসার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জুলুরা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। এরা যে কোন যুগে বাস করছে, কুসংস্কার তথা জড়ি-বটি, জাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, রোজা, গুণিন ও ডাইনি ইত্যাদিতে এদের বিশ্বাস কতদূর গভীর তার পরিচয় ক্রমশঃ পেতে আরম্ভ করলুম। পরে প্রতিদিন এই-

সব কুসংস্কার ও বিদ্যার মোকাবিলা করতে হতো।

প্রাচীন জরুদের পরিচালনা করে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার কিন্তু তার বিরুদ্ধে কিছু বলা বিপজ্জনক। এদের কাছে জন্ম মৃত্যু, আধি-ব্যাধি, পাপ-পুণ্য, আপদ-বিপদ, প্রেম-ঘৃণা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং যে কোনো ক্ষুদ্র ঘটনাও পূর্বনির্ধারিত। এসব তাদের পূর্বপুরুষেরা ঠিক করে রেখেছেন, তাঁরাই এসব নিয়ন্ত্রণ করেন অতএব এসবের মোকাবিলার জন্যে বা তার ব্যাখ্যার জন্যে বিশেষ ব্যক্তি ও ক্ষমতার দরকার যা একমাত্র তাদের কোনো উইচ ডক্টরের আছে। আর কারও নেই, থাকতে পারে না।

নরবিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্যে জিপুসো স্বয়ং কয়েকজন নরনারীকে আদেশ করেছিল আমাদের ক্যাম্পে আসতে। আমরা তাদের ওজন, উচ্চতা, শরীরের মাপ, প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে মুখের ছাঁচ নোব এবং অন্যান্য পরীক্ষা করব। যারা আসত তারা তাদের গুরু বা গুণিনের অনুমতি নিয়ে আসত। গুরু বা গুণিন ওদের গলায় একটা কবচ ঝুলিয়ে দিত যাতে সাদা মানুষদের অশুভ কোনো ছায়া তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। রক্ষাকবচ আর কি!

যারা আসত তারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করত তবে গলায় ঝোলানো রক্ষা-কবচটি বার বার স্পর্শ করত। মেয়েরা একটু অতিরিক্ত সাজসজ্জা করে আসত। রঙিন পাথরের মালা, বা কেশে তৈল প্রদান। তাদের ওজন উচ্চতা ইত্যাদি নেবার সময় তারা তো খিলখিল করে হেসেই অস্থির।

প্রফেসর যখন তাদের মাপ নিতে নিতে হয়ত হাঁকতেন পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি এবং তা শুনে বিল খাতায় তা লিখে নিত সেই সময়ে তারা যেন ভয়ে সিঁটিয়ে যেত। এই বুঝি কিছু একটা অঘটন ঘটল। যখন মাথার, বুকের, কোমরের, হাত পায়ের মাপ নেওয়া হতো তখন তারা তাদের সঙ্গীদের দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে থাকত এবং বুকে ঝোলানো রক্ষাকবচটি এক হাতে ছুঁয়ে থাকতে ভুলত না। তবে কখনও আপত্তি করে নি বা আমাদের কাজে বাধা দেয় নি।

কাজ শেষ হয়ে গেলে যখন তাদের উপহার দেওয়া হতো তখন সে দৃশ্য উপভোগ করবার মতো। সে যে কি আনন্দ আর কতদূর খুশি তারা হতো তা তাদের সরল দৃষ্টি ও হাসি দেখে বোঝা যেত। উপহার বলতে ছোট ছুরি, জড়ানো খানিকটা তামার তার, 'টোমব্যাকো' এবং দেশলাই। মেয়েদের দেওয়া হতো নকল অলংকার, সেফটিপিন, একখণ্ড ছিট কাপড় ইত্যাদি। ছিট কাপড়টা তো তারা তখনি গায়ে জড়াত নয়ত মাথায় বাঁধবার চেষ্টা করত। তারা জানত না যে তারা আমাদের জন্যে যেটুকু কাজ করেছে তার জন্যে এই উপহার দেওয়া হলো। উপহার নিয়ে নিজেরা কত কি বলাবলি করত অপরের সঙ্গে বস্তুটির তুলনা করত। হাত পা নাড়ত, শিশুর মতো হেসে গড়িয়ে পড়ত। হয়ত ভাবত

না জানি কি অমূল্য উপহারই না পেয়েছে।

কিন্তু নরম প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে যখন মুখের ছাপ নেওয়া হতো তখন কিন্তু ব্যাপার অন্য রকম হতো। তারা প্রবল বাধা না দিলেও আরম্ভটা আমাদের মনোমত হতো না। ছাপ নেবার আগে চিৎ হয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতে হবে, নড়াচড়া চলবে না। মুখের ওপর নরম প্লাস্টার অফ প্যারিস লাগাবার পর প্লাস্টার যতক্ষণ পর্যন্ত না জমে শক্ত হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। অবশ্য নিশ্বাস নেবার জন্যে নাকে নল লাগাবার ব্যবস্থা থাকত। এতে অসুবিধে হতো। সময় সময় মাথার চুল বা ভুরু বা গোঁফ প্লাস্টারে আটকে যেত। ওরা বিরক্ত হতো। তবে অসহযোগিতা করে নি।

তবে তাদের একটা আপত্তির কারণ ছিল। প্লাস্টারের সঙ্গে চুল উঠে আসা তাদের আপত্তির কারণ নয়, আপত্তির কারণ ভিন্ন, একজন সর্দার তাদের মাথায় ঢুকিয়েছে যে দেখ বাপু তোমার মুখের ছাপ মুশুঙ্গুদের কাছে থেকে যাবে। ওরা ইচ্ছে করলে তোমার ঐ দ্বিতীয় মুখে কিছু আঘাত বা ক্ষত করে দিলে তোমার আসল মুখে তার ছাপ পড়বে।

আর উইচ ডক্টররা একের পর এক বল্লতে লাগল মুশুঙ্গুদের এইসব ব্যাপার আমরা আগে দেখি নি, শুনিও নি, তাই এর কোনো প্রতিকার আমাদের জানা নেই, আমাদের দেওয়া কবচ কোনো বিপদ থেকে জুলুদের রক্ষা করতে পারবে না। অতএব সাবধান, তোমরা যদি কোনো বিপদে পড় আমরা তার জন্যে দায়ী থাকব না।

আমরা অসুবিধেয় পড়ে গেলুম। আমাদের ক্যাম্পে জুলুরা আর আসে না। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝি ব্যর্থ হয়। কি করা যায়! ওদেরই অস্ত্র দিয়ে ওদের হারিয়ে বোঝাতে হবে যে তোমাদের উইচ ডক্টররা যা বলেছে তা ভুল।

আমাদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে। একদিন একটা সুযোগ জুটে গেল।

একদিন আমরা তাঁবুর সামনে বসে ধূমপান করতে করতে গল্পগুজব করছি এমন সময় দেখলুম একজন জুলু যোদ্ধা বিশ তিরিশ গজ দূর থেকে আমাদের এবং তাঁবুগুলো লক্ষ্য করছে। তার কৌতূহলী দৃষ্টি বলে দিচ্ছে সে আগে কখনও তাঁবু দেখে নি, শ্বেতকায় মানুষও দেখে নি। আমরা আপত্তি করছি না দেখে সে কয়েক পা এগিয়ে এল।

কাছে আসতে লক্ষ্য করলুম তার বাঁ দিকের গাল বেশ ফুলে আছে আর তার বিকৃত মুখও বলে দিলো সে দাঁতের যন্ত্রণায় খুব কণ্ট পাচ্ছে। একটা ভালো সুযোগ উপস্থিত। জুলু এবং কাফ্রিরা দাঁতের রোগে খুবই কষ্ট পায়। এরা দাঁতের ব্যথা কমাবার কোনো ওষুধ জানে না। এদের উইচ ডক্টররা দাঁতের যন্ত্রণার লাঘব করতে পারে না।

আমি তাকে কাছে ডেকে আমার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে খাতির করে টুলে বসিয়ে

তাকে কয়েকটা সিগারেট দিলুম। তারপর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলুম। তার দাঁতের কথাও উঠল। সহানুভূতির সঙ্গে তার কষ্ট শুনে তাকে বললুম যে তোমার ভাগ্য ভালো, কারণ আমরা তোমার ব্যথা এখনি কমিয়ে দোব, পরে সেরেও যাবে, আমাদের কাছে খুব ভালো ওষুধ আছে। তাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিলুম। তারপর পাশের টেন্টে গিয়ে প্রফেসরকে বললুম, তোমার একজন রোগী এসেছে। যদি একে সারিয়ে দিতে পার তাহলে আমাদের জয়-জয়কার। জুলুদের মধ্যে সাড়া পড়ে যাবে।

প্রফেসর তখনি আস্তিন গুটিয়ে কাজে নেমে পড়লেন। আমাদের ব্যবহারে জুলু যোদ্ধা আকৃষ্ট হয়েছিল। প্রফেসরেব আদেশ সে পালন করতে লাগল, কোনো আপত্তি করল না। ডাক্তার তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে লবঙ্গ তেলে তুলো ভিজিয়ে দাঁতের ফাঁকে ঢুকিয়ে দিলো। লবঙ্গ তেল দাঁতের রোগের ভালো ওষুধ। তার আগে বেদনানাশক অ্যাসপিরিন বড়ি জলে গুলে খাইয়ে দিয়েছিল।

চিকিৎসা শেষ হতেই তাকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে মেঝেতে ক্যাম্বিশের ওপর শুইয়ে দেওয়া হলো। ইতিমধ্যে বিল জুলুর মুখের ছাপ নেওয়ার জন্যে প্লাস্টার অফ প্যারিস রেডি করেছে। জুলুকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার মুখের ছাপ নেওয়া হলো। ইতিমধ্যে ওষুধের কাজ আরম্ভ হয়েছে, ব্যথার উপশম হয়েছে। গরম প্লাস্টার পড়তে তার ফোলা গাল আরাম উপভোগ করতে লাগল। লোকটি কোনো আপত্তি করল না, টুঁ শব্দটি করল না। নিশ্চল স্ট্যাচুর মতো সে চুপ করে শুয়ে রইল। প্লাস্টারের ছাপ তোলার সময় তার কয়েকগাছি ভুরু ছিঁড়ে উঠে এল, সে প্রতিবাদ করল না।

জুলু যোদ্ধা উঠে বসল। গালে হাত দিলো। আমরাও লক্ষ্য করলুম তার ফুলো কমতে আরম্ভ করেছে। বিকৃত মুখ অনেকটা কোমল হয়েছে। জুলু যোদ্ধা বোধহয় ভাবছে তাদের উইচ ডক্টররা যা পারল না এই মুশুঙ্গু ডাক্তাররা তা পেরেছে।

সে সহসা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর আমরা তাকে কিছু উপহার দেবার আগেই সে কিছু একটা বার করে প্রফেসরের হাতে গুঁজে দিলো। বোধহয় ডাক্তারের ফি দিলো। তারপর আর এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা না করে আমাদের অবাক করে দিয়ে যত জোরে পারে লাফাতে লাফাতে গ্রামের দিকে ছুটে চলল চিৎকার করতে করতে। কান পেতে শুনলুম আমাদের গুণগানই করছে।

পরদিনই দেখা গেল দ্বিতীয় মুখ সম্বন্ধে উইচ ডক্টরদের সতর্ক বাণী আর গ্রাহ্য হবে না। গুনে দেখলুম উনিশ জন দন্তরোগী ও রোগিণী আমাদের ক্যাম্পে চিকিৎসার জন্যে এসেছে। তারা আবেদন নিবেদন করতে লাগল, দাঁতের যন্ত্রণা তারা আর সহ্য করতে পারছে না, খেতে পারছে না, ঘুমোতে পারছে না,

আমরা যেন দয়া করে তাদের এই অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করি যেমন করেছি জুলু যোদ্ধাকে। চিকিৎসার সময়ে তারা কোনো বাধা দেবে না, চুপ করে সব কষ্ট সহ্য করবে।

বেদনাকাতর মানুষগুলিকে দেখে আমরাও বেদনা বোধ করলুম। তারা তাদের উচ্চ ডক্টরদের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। আমরা আমাদের কর্তব্য করলুম। আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে লবঙ্গ তেল ও অ্যাসপিরিন বড়ি ছিল। অন্যান্য ওষুধও ছিল।

উইচ ডক্টরের চিকিৎসায় কখনও কখনও দন্তরোগ হয়ত আরোগ্য হয় অথবা আপনাআপনি সেরে যায়, কিন্তু তা অনেক সময় নেয়, এবং রোগ কয়েক দিনের মধ্যে ফিরে আসে। আমাদের ওষুধের মতো এত দ্রুত বা দীর্ঘস্থায়ী কাজ দেয় না। আমাদের ওষুধের ওপর তাদের এমন বিশ্বাস জন্মাল যে তারা ক্রীতদাসের মতো আমাদের আদেশ পালন করতে লাগল।

তারা অভিভূত। নিজেদের হাতে তৈরি সামগ্রী তারা আমাদের উপহার দিতে লাগল অথচ এইসব সামগ্রী তারা আমাদের বিক্রয় করতে রাজি হয় নি। উপহারের মধ্যে ছিল অস্ত্র, অলংকার, গৃহস্থালীর বস্তু, বাদ্যযন্ত্র, চৌকি, মূর্তি, পুতুল, কাঠখোদাই, বসবার চৌকি। এগুলি নিয়ে গ্রামীণ জুলু শিল্পের একটি প্রদর্শনী করা যায়। দেশে ফিরে এমন একটা কিছু করা যাবে।

কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা অনেক জুলু মুখের প্লাস্টার ছাপ নিতে পারলুম। কোনো কারণে নিতে না চাইলে তারা নাছোড়বান্দা। আমাদের সময় না থাকলে ক্যাম্পের সামনে চুপ করে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে। এইসব অকপট সরল মানুষদের ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ। আমরা যে আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুখোশ পেলুম তা নয় অনেক জুলু বন্ধু পেলুম। আমরা তাদের মন জয় করতে পেরেছি। এর চেয়ে বেশি আর কি আশা করতে পারি? এদের আমরা অসভ্য, জংলী বলি কিন্তু এদের মতন এমন সরল, অকপট এবং অকৃত্রিম মানুষ বিরল।

আমরাও কিছু কসুর করি নি। যথাসাধ্য জুলুদের মন যুগিয়ে চলেছি। তাদের আচার-ব্যবহার মেনে নিয়েছি, কখনও অবজ্ঞা করি নি। ওরা ডাক্তারের 'ফি' হিসেবে উপহার দিয়েছে, আমরাও যেমন দিয়ে থাকি তেমন পাল্টা উপহার দিয়েছি ফলে আমরা শত শত জুলু বন্ধু লাভ করতে পেরেছিলুম।

গ্রীষ্ম ঋতু শেষ হলো এবার বর্ষা নামবে কিন্তু বর্ষার দেবতা উনুজিয়ানা তাপদগ্ধ জুলুদের ভুলে গেলেন। তাঁর আসবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। আকাশে মেঘের দেখা নেই। বর্ষা আসার সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

জুলুল্যাণ্ডের পক্ষে বর্ষা অপরিহার্য। বর্ষা এলে সবুজ ঘাসে মাঠ ভরে যায়। গবাদি পশুরা পেট ভরে ঘাস খায়। দুধের পরিমাণ যেমন বাড়ে তেমন বাড়ে

বাচ্চার সংখ্যা। বৌ কিনতে হলে গরু বিনিময় করতে হয়। গরু বিনিময় করে যোদ্ধারা ঘরে বৌ আনে। পরিবারের সকলে যত ইচ্ছা দুধ খাবার সুযোগ পায়। শিকারের অভাব হয় না তথা খাদ্যেরও টানাটানি পড়ে না। সিংহের উৎপাত কমে। তারা পুষ্ট জেব্রা ও হরিণের মাংস খেয়ে পেট ভরায়, মানুষের বস্তিতে এসে উৎপাত করে না। মানুষ তাদের আপৎকালীন রেশন, হাতের কাছে পাওয়া যায় তবে প্রাণের ঝুঁকি আছে। বর্ষা এলে মানুষ ও পশু শান্তিতে থাকে কিন্তু খরা হলে সবকিছু গোলমাল হয়ে যায়। খরা মানে জাতীয় সংকট, সমাজের সমৃদ্ধি বাধা পায়। খরা দেখা দেওয়ায় জুলুরা যেমন নিরানন্দ তেমনি আমাদেরও আনন্দের কোনো কারণ নেই। বর্তমানে আমরাও জুলুদের জীবনের সঙ্গে জড়িত।

এক মাস হয়ে গেল। এক ফোঁটাও বৃষ্টি হলো না। ঘাসের বন হলদে হয়ে গেল, গাছপালা রুক্ষ মলিন। পোকামাকড়ের উৎপাত বাড়তে লাগল। খাদ্য ও জলের অভাবে পশু মরতে লাগল। জলের সন্ধানে এবং খাদ্যেরও, পশুরা দলে দলে এ অরণ্য ছেড়ে অন্য অরণ্যের দিকে দলে দলে ছুটতে লাগল। ধুলোয় আকাশ ভরে গেল।

দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি ধুলো কমল অর্থাৎ পশুদের দেশত্যাগ বন্ধ হয়েছে। শক্তসমর্থ সব সিংহ পালিয়েছে কিন্তু বৃদ্ধ ও অসমর্থ সিংহগুলো রয়ে গেছে যারা আর দৌড়ে ও লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে শিকার ধরতে পারে না। তাদের হাতের কাছে মানুষ এবং গোয়ালে গরু আছে অতএব অনিশ্চিতের পথে ছোকরা সিংহদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যাবার দরকার কি? অভিজ্ঞতা নেই এমন কিছু তরুণ সিংহ এবং আসন্নপ্রসবা অথবা কয়েকটা কচি বাচ্চা আছে এমন সিংহিনী নিজ নিজ বাসাতেই রয়ে গেল।

গরু মোষকে শুকনো হলেও ঘাস খাওয়াতে মাঠে নিয়ে যেতে হতো। কোনো কোনো জায়গায় সবুজ ঘাস পাওয়া যেত। পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও ক্ষুধার্ত সিংহ পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। গরু, মোষ বা মানুষ যা পেত তাই টেনে নিয়ে যেত। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পাহারা কড়া করা হলো, কিন্তু সিংহও কম চালাক নয়। তারা একক গরু, মোষ বা মানুষের জন্যে ওৎ পেতে থাকত। কেউ বা কেউ তো দলছুট হয়ে আসত। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চক্ষের নিমেষে তাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যেত।

গরু, মোষ অপেক্ষা নরমাংস তাদের বেশি প্রিয়। সহজে মানুষ মারা যায় এবং মাংসও সুস্বাদু। যে সিংহ একবার মানুষের রক্তমাংসের স্বাদ পেয়েছে সে আর পশু খেতে চায় না। প্রথমবার মানুষ মারবার পর তাদের সাহস ক্রমশঃ বেড়ে যায়। সময় সময় তারা দল বেঁধে বস্তি আক্রমণ করে। রাত্রে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে এবং বাইরে আগুন যদি নিবে যায় তাহলে বিপদ। সিংহ দরজা

ভেঙে ঘরে ঢুকে শিকার নিয়ে পালিয়ে যায়।

দ্বিতীয় মাসের শেষে সারা অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। বিনা আস্ত্রে তো নয়ই এমন কি দু তিনজন মাত্র জুলুও গ্রাম থেকে দূরে যেতে সাহস করত না, সিংহের উৎপাত এমন বেড়ে গেল। তারা দলবদ্ধ হয়ে তীর ধনুক ও বর্শা নিয়ে তবেই বাড়ির বাইরে পা দিত। প্রত্যেক বাড়ির বাইরে কাঁটাযুক্ত শুকনো ডালের বেড়া দিত আর রাতে আগুন জ্বালিয়ে রাখত। সে আগুন সারারাত জ্বলত। খাদ্যের অভাব হলেও কাঠের অভাব ছিল না।

এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিন্তু সিংহের উৎপাত ঠেকান যাচ্ছে না। প্রতিদিন ডুগডুগি বাজিয়ে জানিয়ে দেওয়া হতো সিংহ কি শিকার করেছে বা তারা কটা সিংহ শিকার করেছে। কোনো সাহসী যুবক হয়ত একটা সিংহ মেরেছে বা সিংহ সকলের চোখের সামনে একটি কিশোরীকে ধরে নিয়ে গেছে, সেসব খবরও জানিয়ে দিত ওদের ডুগডুগি বেতার মারফত। ক্ষুধার্ত সিংহ ক্রমশঃ সাহসী হয়ে উঠছে। কখন যে তারা বস্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ বলতে পারবে না। দিনে রাত্রে সমান। সদা সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। জুলু যোদ্ধারা ভাবে সিংহর মাংস যদি খাওয়া যেত তাহলে খাদ্যের অভাব হতো না। স্বাদ নিয়ে দেখেছে অখাদ্য, তবে ওরা সিংহর যকৃত বা অন্য অংশ খায় কিনা খবর নিই নি।

খরা এবং সিংহভীতি আমাদের কাজেরও প্রভূত ক্ষতি করতে লাগল। নেটিভরা আমাদের ক্যাম্পে আসা বন্ধ করে দিলো বাধ্য হয়ে। বিপদের ঝুঁকি, তাদের আসতে বলতেও পারি না। আমরা অবশ্য তাদের সর্বদা সাহায্য করতে প্রস্তুত। বিলকে সহকারী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে প্রফেসর দূর দূর গ্রামে চলে যেত, ফিরত কয়েক দিন পরে, মাঝে মাঝে কয়েক সপ্তাহও কেটে যেত। সিংহর থাবা থেকে গ্রামে কেউ ফিরে আসত। আহত সেই সব ব্যক্তির চিকিৎসা করতে হতো।

ওরা দু'জন যখন ক্যাম্পে থাকত না আমি তখন রাইফেল ও যথেষ্ট টোটা সঙ্গে নিয়ে জুলু বস্তিতে ঘুরে বেড়াতুম। নানা কাহিনী সংগ্রহ করতুম, ওদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করতুম, ফটো তুলতুম তবে বেশি কাজ করতুম আমার রাইফেল দিয়ে। খরার তৃতীয় মাসের শেষে আমি একত্রিশটা সিংহ বধ করেছিলুম। তবে বত্রিশতম সিংহটি আমার চিরদিন মনে থাকবে।

আমার বত্রিশতম সিংহ

সেদিন আমি তয়াবেনির গ্রামে গিয়েছিলুম। তয়াবেনির বয়স প্রায় পঞ্চাশ, দেখতে সাধুব্যক্তির মতো, রীতিমতো সম্পদশালী। সে সর্দার বা দলনেতা নয়, বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তিও নয়, জাদুকর বা উইচ ডক্টরও নয়। কিন্তু তার গরু ও জরুর সংখ্যা প্রচুর, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। ধনী বলেই বোধহয় লোকে তাকে ভয় পায়।

তয়াবেনি কারও সঙ্গে মেলামেশা করত না, একা থাকতে পছন্দ করত, কথা কম বলত। তার বিষয়ে কেউ কথা বলতে চাইতে না, সেও অবশ্য চাইত না কারও সঙ্গে কথা বলতে। সে আমাদের ক্যাম্পে কখনও আসে নি। ক্যাম্পে আসবার জন্যে আমি বিনীতভাবে অনুনয় করে জামানিকে কয়েকবার পাঠিয়েছিলুম কিন্তু সে আসে নি।

এমন কি একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী ও স্বেচ্ছাচারী জিপুসোও তয়াবেনির পথ মাড়াত না। তয়াবেনির ব্যাপারে জিপুসো সদা সতর্ক।

তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমি জিপুসোকে সঙ্গে নিয়ে এবং উপহার-স্বরূপ একটি কম্বল নিয়ে তার গ্রামের সবচেয়ে বড় কুটিরটিতে গিয়েছিলুম। তয়াবেনি আমার দিকে একবার মাত্র চেয়ে দেখল তারপর আমার হাত থেকে কম্বলটি একরকম ছিনিয়ে ঘরের ভেতরে চলে গেল। তবে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল যে আমি তার বাড়িতে যখন ইচ্ছে আসতে পারি, সে আমাকে স্বাগত জানাবে।

আমি যতক্ষণ তয়াবেনির বাড়িতে বসেছিলুম ততক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছিলুম যে তয়াবেনি এবং জিপুসোর মধ্যে ভেতরে ভেতরে ব্যক্তিত্বের সংঘাত চলেছে, তাদের কথাবার্তা ও ব্যবহারে এটা ধরা পড়ছিল। এরপর আমি তয়াবেনির বাড়িতে চার পাঁচবার গেছি কিন্তু কোনোবারই আলাপ জমে নি।

তয়াবেনির পত্নীর সংখ্যা চৌদ্দ, কন্যার সংখ্যা তিরিশ বা কয়েকজন বেশি হতে পারে। পুত্রের সংখ্যা জানি না তবে তাদের কাউকে আমি দেখতে পাই নি। তারা বাড়ি থাকে না। আমি তার বাড়ি গেলে তার কোনো পত্নী বা কন্যা হাজির থাকলে তারা কোনো ছুতো করে ঘর থেকে উঠে যেত। পরে আর ঘরে ফিরে আসত না।

কিন্তু তয়াবেনির একটি ষোড়শী কন্যা ছিল। চঞ্চল এবং হাসিখুশি, স্বাস্থ্যবতী। সে কোনো ছুতো করে থাকত, উঠে যেত না। মেয়েটির নাম মাবুলি।

বাবাকে ভয় করত কিন্তু নিজের গা বাঁচিয়ে চলতে জানত।

মাবুলি একবার দাঁতের ব্যথায় খুব কষ্ট পাচ্ছিল। বাবাকে লুকিয়ে সে আমাদের ক্যাম্পে চলে এসে খিলখিল করে হাসতে লাগল। খুব চঞ্চল। একবার এখানে বসে, একবার ওখানে। নানা প্রশ্ন করে। তার হাসির কারণ হলো এই যে 'বাবাকে লুকিয়ে কেমন চলে এসেছি কিন্তু খবরদার বাবাকে বোলো না যেন তাহলে বাবা আমার ছাল চামড়া তুলে নেবে।' বলে সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। চোখমুখ শুকিয়ে গেল।

আমরা তাকে আশ্বস্ত করলুম। সে বলল, জানি তোমরা কিছু বলবে না কিন্তু বাবার তো অনেক গুপ্তচর আছে, ভয় তাদের। আমরা তার দাঁতের চিকিৎসা করে তার মুখের একটা মুখোশও তুলে নিলুম। মুখোশটা নিখুঁত হয়েছিল। আমরা তাকে কয়েকটা উপহার দিলুম। ভারি খুশি। আমাদের একজন চমৎকার বন্ধু লাভ হলো।

একদিন দুপুরে তয়াবেনির বাড়ি গেলুম। আগে ভালো করে লক্ষ্য করি নি বা খেয়াল করি নি। আজ ভালো করে দেখলুম। সিংহ যাতে তার গ্রামে ঢুকতে না পারে তার জন্যে সে চারদিকে মজবুত বেড়া দিয়েছে। বেড়া বেশ উঁচু এবং নিচে মাত্র যৎসামান্য ফাঁক। বেড়ার গা কাঁটায় ভর্তি। এ কাঁটা বাবলা কাঁটার চেয়েও শক্ত ও ধারাল। গ্রামে বা তার বাড়িতে ঢোকবার এখানে একটি মাত্র গেট। তয়াবেনি বুদ্ধি খাটিয়ে এমনভাবে দড়ি লাগিয়েছে যে নিজের ঘরে বসে একটা দড়ি ধরে টানলে গেট খুলে যাবে আর অপর একটা দড়ি ধরে টানলে গেট বন্ধ হয়ে যাবে। সিংহের গায়ের চামড়া নাকি পাতলা তাই ওরা কাঁটাকে ভয় পায়। রাত্রে জ্বালাবার জন্যে তয়াবেনি প্রচুর কাঠও যোগাড় করেছে। কাঁটার বেড়া দিয়ে ওর নিজস্ব গ্রামটা ঘিরতে, গেট তৈরি করতে ও জ্বালানি কাঠ মজুত করতে নিশ্চয় অনেক লোকের দরকার হয়েছিল, একশজন হবেই। তয়াবেনির মতো প্রভাবশালী মানুষের দ্বারাই এ কাজ সম্ভব।

কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম না দিনদুপুরে গোয়ালসমেত গ্রামখানা এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে আগলে রাখবার দরকার কি? দুপুরেও কি সিংহ হানা দেয়? তাহলে গ্রামবাসীরা কি দুপুরে ঝর্না থেকে জল আনতে যায় না কিংবা মাঠে গরু চরাতেও যায় না? প্রশ্নগুলি আমি তয়াবেনিকে করেছিলুম, সে জবাবও দিয়েছিল।

যাই হোক আমি তয়াবেনির বাড়ির সামনে গিয়ে ডাকাডাকি করতে ভেতর থেকে সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলল তারপর আমার সামনে নিঃশব্দে গেট খুলে গেল। গেটের ওপারে তয়াবেনি দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে ব্যস্ত হয়ে বলল, তাড়াতাড়ি এস বাবা, ঝোপেঝাড়ে সিম্বা লুকিয়ে থাকে।

ঘরের ভেতরে গিয়ে আমি তয়াবেনির প্রশংসা করলুম, বললুম ব্যবস্থা তো বেশ

মজবুত করেছ। তুমি যে এমন কাজের লোক এবং বুদ্ধিমান তা তো বুঝতে পারি নি। তয়াবেনি খুশি হলো। গেট কি করে ভেতর থেকে খোলা ও বন্ধ করা যায় তা আমাকে দেখাল। সমস্ত কাজটা কি করে সম্পন্ন হয়েছে সবই সে আমাকে যত্ন করে দেখাল।

সে বলল, গেটটা খুললে দেখবে গেটের মুখটা বেশ চওড়া। তার একটা কারণ আছে। এই তো সেদিন আমার ছেলেরা মাঠে গরু নিয়ে গিয়েছিল। সিংহের ডাক শুনতে পেয়েই আমি গেট খুলে রেখেছিলুম। আমার ছেলেরাও সিংহের ডাক শুনতে পেয়েছিল আর সঙ্গে সঙ্গে গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে এসে গেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে তবুও পালের পেছন থেকে দুটো বাছুর ধরে সিংহরা পালাল। বাছুর দুটো ধরতে না পারলে সিংহও আমার বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ত। তখন তো বিপদ ঘটত। সিংহরা বাছুর দুটো পেয়ে গেল। আপাততঃ ওদের ক্ষিদে মিটবে। আমরাও বেঁচে গেলুম। পাহাড়ের ওপারের গ্রামে আমার ভাই থাকে। ভাই তার গ্রামে এইরকম বেড়া দেবে ও গেট করবে, তাকে সাহায্য করতে আমার ছেলেরা এখন ভায়ের গ্রামে গেছে।

আজ তয়াবেনির মুখ খুলে গেছে। এর আগে আমার সঙ্গে কোনোদিন এত কথা বলে নি। কথা বলতে বলতে হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গেল। আমাকে কিছু না বলেই বাড়ির ভেতরে চলে গেল। আমি অবাক তবে কিছু মনে করলুম না কারণ এরা লেখাপড়া জানা সভ্য জগতের মানুষ নয়। এদের রীতিনীতি এই রকমই।

আমি চলে যাব কি না ভাবছি এমন সময়ে গেটের কাছেই তার মায়ের ঘরের দরজা থেকে মাবুলি উঁকি মারল। আমি হাসলুম, মাবুলিও হাসল তারপর আমাকে ওর মায়ের ঘরে যেতে বলল। ওর মা এখন তার অন্যান্য সতীনদের সঙ্গে অন্য কোনো কুটিরে আছে।

মায়ের ঘরে ঢোকবার দরজাটা নিচু, মাথা নিচু করে ঢুকতে হয়। আমি আমার রাইফেল নিয়ে ঘরে ঢোকবার পর মাবুলি বসবার জন্যে আমাকে একটা চৌকি দিলো। দেওয়ালে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রেখে আমি টুলে বসলুম। ঘরের ভেতরে বেশ আলো ছিল। তাই আমি ক্যামেরা বার করে মাবুলির কয়েকখানা ছবি তুললুম। বেশ হাসিমুখেই সে ছবি তুলল।

ছবি তোলবার পর মাবুলি সহসা গম্ভীর হয়ে গেল। এক জায়গায় চুপ করে বসতে পারছে না, কথাও বলছে না। জিজ্ঞাসা করলুম, কি ব্যাপার মাবুলি ? প্রশ্ন করতেই মাবুলি মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি কখনও কোনো জুলু মেয়েকে কাঁদতে দেখি নি। আমি অপেক্ষা করতে লাগলুম। ও নিশ্চয় এক সময়ে চুপ করবে এবং কথাও বলবে। আমার আশঙ্কা ওর বাবা না এসে পড়ে। কারও পায়ের শব্দও যেন পেলুম কিন্তু কেউ এল

না। গোয়ালে গরু ডেকে উঠল। একটা মোরগও কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। ডাক শুনে মনে হলো গরু এবং মোরগ উভয়েই ভয় পেয়েছে।

মাবুলির কান্না থামল। উঠে বসল। দু একবার নাক টেনে বলল, আমাকে মেরে ফেলবে, তয়াবেনি আমাকে মেরে ফেলবে। মেরেই ফেলবে, আমাকে শেষ করে দেবে।

কাহিনীটা ক্রমশঃ গ্রামের সকলের জানা হয়ে গেল। মাবুলি একটি ছেলেকে ভালবেসেছে। ছেলেটিকে আমি জানি। সুঠাম দেহ, সুদর্শন, তরুণ জুলু যোদ্ধা। তার কয়েকটি নাম আছে কিন্তু সে নজুয়ো নামে বেশি পরিচিত। মাবুলি অকপটে তার গভীর প্রেম স্বীকার করল। বিয়ের জন্যে যৌতুক স্বরূপ নজুয়ো তয়াবেনিকে তিরিশটা পর্যন্ত গরু দিতে চায়। প্রথমে দশটা গরু থেকে আরম্ভ করেছিল কিন্তু তয়াবেনি রাজি নয়। নজুয়ো লোক পাঠালেও তয়াবেনি তাদের সঙ্গে দেখা করে না। ব্যাপারটা হলো তয়াবেনি একদা শক্তিশালী উইচ ডক্টর ছিল কিন্তু নজুয়োর বাবা তার বিরুদ্ধে জোরালো অভিযোগ করায় বড় সর্দার জিপুসো তাব ডাক্তারী করা বন্ধ করে দেয়। এরপরে নজুয়োর বাবাকে সিংহ খেয়ে ফেলে। তখন তয়াবেনি বলল, দেখলে তো মিথ্যা অভিযোগ করার ফল। বাপ মরলেও ছেলেকে তয়াবেনি তার শত্রু মনে করত।

তয়াবেনি কত বড় উইচ ডক্টর ছিল বা সে কি অপরাধ করেছিল যার জন্যে তার ডাক্তারী করা বন্ধ হয়ে যায় এসব কথা মাবুলি বলে নি। কিন্তু একমাত্র একটি পুত্রের ওপর প্রতিহিংসা নিতে তয়াবেনি নাকি বদ্ধপরিকর। মেয়ের জন্যে তয়াবেনির মাথাব্যথা নেই। কাঁদতে কাঁদতে মাবুলি বলল তার বাবা নাকি বলেছে বিয়ে হবে না কচু, বিয়ের আগে হয় নজুয়ো মরবে নয়ত মাবুলি। একজনকে মরতেই হবে, দুজনে মরলেই বা ক্ষতি কি ?

জুলু তরুণ তরুণীর মধ্যেও যে এমন ভালবাসা থাকতে পারে তার পরিচয় আমি এই প্রথম পেলুম।

মাবুলি আমাকে বলল, আমি তোমার সাহায্য চাই।

কার যেন পায়ের শব্দ শুনলুম। তার বাবার পায়ের শব্দ মাবুলি নিশ্চয় চেনে কিন্তু সে বিচলিত হলো না। সে আমাকে বারবার অনুরোধ করতে লাগল আমি যেন তাকে সাহায্য করি। সে আমাকে বার বার বলতে লাগল আমি যেন তার বাবার সঙ্গে কথা বলি। জিপুসোকেও যেন বলি হস্তক্ষেপ করতে। হেসে খেলে এত বড় হয়েছি কিন্তু এখন মরতে বসেছি, আর পারছি না। আমি তো এমনিই মরব নয়ত বাবা আমাকে মারবে।

আমি মনে মনে চিন্তা করছি কিভাবে মাবুলিকে সাহায্য করতে পারি। মাবুলির বাবা আমার কথা হয়তো শুনবে না। জিপুসো কি হস্তক্ষেপ করতে রাজি হবে ?

সহসা লক্ষ্য করলুম মাবুলির সারা দেহ টান টান হয়ে গেল। তার মুখ শুকিয়ে গেল, চোখ দেখে মনে হলো ও ভীষণ ভয় পেয়েছে। তবে কি আমি যে পায়ের শব্দ শুনেছিলুম সে কি ওর বাবার পায়ের শব্দ ? মেয়েকে এখন মারতে আসছে ? আমার সামনেই কি চকিতে একটা নারীহত্যা ঘটে যাবে ? আমি যদি তয়াবেনিকে ভয় দেখাবার জন্যে তখনি রাইফেলটা তুলে নিতুম তাহলে আমার কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত। কিন্তু তা হলো না।

মাবুলি নড়ছে না। কি রকম যেন হয়ে গেল। মৃত্যু যেন আসন্ন। ওকে কি কেউ বিষ খাইয়েছে বা দেহে বিষ প্রয়োগ করেছে ?

মাবুলির পেছন দিকে একটা ছায়া সহসা সরে গেল, মাত্র ছ ফুট আন্দাজ দূরে। মাবুলির মুখ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেছে, সে ভীষণ ভয় পেয়েছে। সে গন্ধ পেয়েছে তাই সে আতঙ্কিত। যে ছায়া আমি দেখেছিলুম সে ছায়া নির্ভুলভাবে সিংহের লেজের ছায়া। অথচ সিংহ ঢুকবে কেন এবং কি করে ? কারণ আমি ঘরে ঢোকবার পর তয়াবেনি তো গেট বন্ধ করে দিয়েছিল।
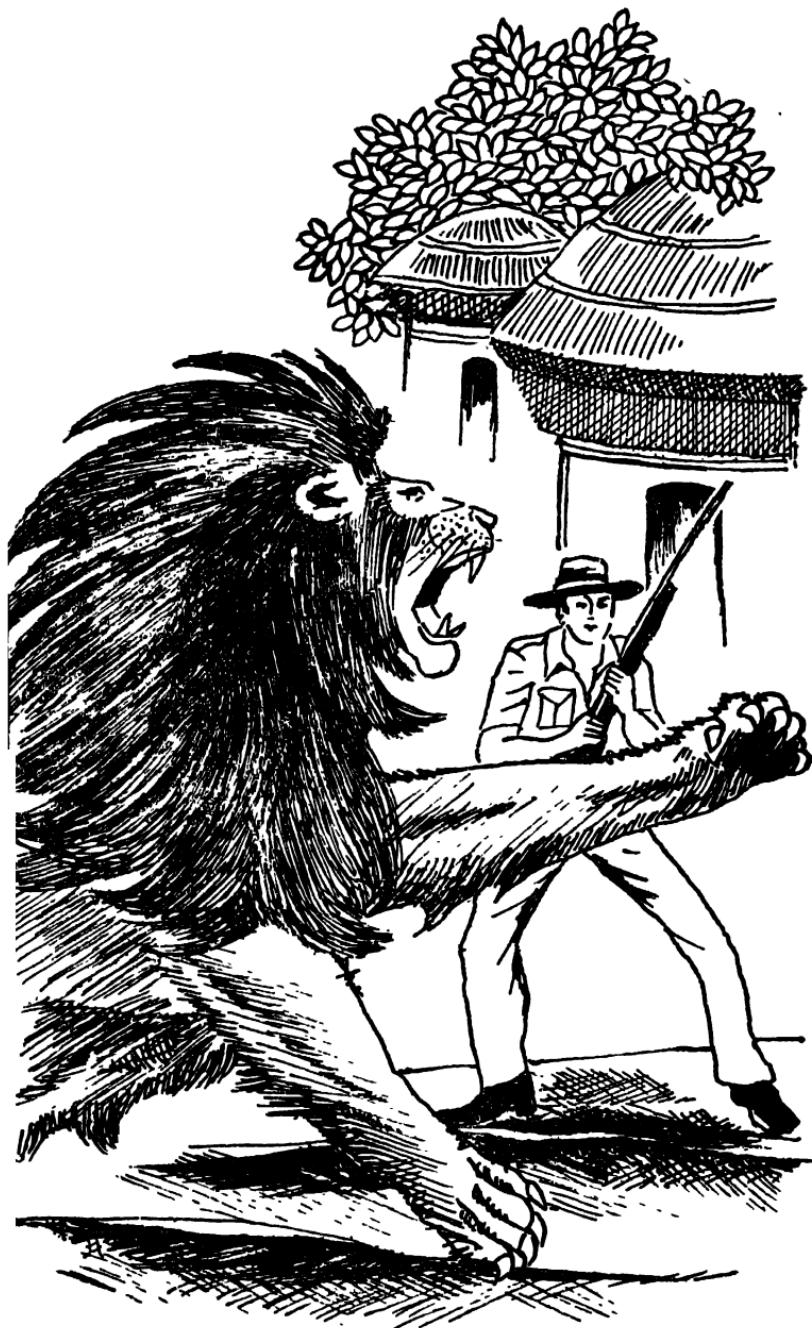
তবে কি আমাদের দুজনকেই মারবার জন্যে তয়াবেনি এক সময়ে গেট খুলে দিয়েছে। তাই কি কিছু আগে গরু ডেকেছিল, মোরগ চিৎকার করেছিল ?

নারভাস হলে চলবে না। এর চেয়েও বেশি বিপদে পড়েছি। রাইফেলটা কিছু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা আছে। সেটা হাতে তুলে নিতে হবে। নিঃশব্দে কাজ করতে হবে। সিংহর কান ভীষণ স্পর্শকাতর। শব্দ শুনতে পেলেই সে আক্রমণ করবে। হ্যাঁ, এখন সিংহর গন্ধ পাচ্ছি। কাছেই আছে।

রাইফেলটা নেবার জন্যে আমি দরজার দিকে গেলুম। যেতেই হবে, অন্য রাস্তা নেই। ঘরের মেঝেতে বাঁশের চ্যাটাই পাতা ছিল। নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার পায়ের শব্দে চ্যাটাই মড়মড় করে উঠল। আমার তো মনে হলো যেন কেউ ঢাক পিটিয়ে দিলো। সিংহটা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত নইলে এমন অসময়ে হানা দিত না। সিংহটা গোয়ালের দিকে না গিয়ে এদিকেই বা এল কি করে ? সে চিন্তা করার সময় এখন নয়। এখন চিন্তা আত্মরক্ষা করব কি করে ? সিংহ এই মুহূর্তে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়তে পারে।

মাবুলি নিশ্চল, তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। হয়ত ভাবছে এখন তাকে বাঁচাতে পারলে আমিই পারব নাকি তার আগে আমিই সিংহর পেটে যাব ? সিংহ সম্ভবত দরজার বাইরে হাঁটু মুড়ে বসে লেজ নাড়ছে অন্ততঃ আমি সেইরকম অনুমান করলুম। অনুমান করার কারণও আছে। বিরাট একটা জন্তু কাছে থাকলে, অস্পষ্ট হলেও তার দেহ থেকে উদ্ভূত নানারকম আওয়াজ পাওয়া যায়, মাটিতে লেজের ঝাপটানি বা নিশ্বাসের শব্দ। গন্ধও পাওয়া যায়।

সময় বয়ে যাচ্ছে আর দেরি করা যায় না। সূর্য ইতিমধ্যে সরে যাওয়ায় ঘরের

সেই মুহূর্তে সিংহ লাফ মারল

ভেতরে আলো কিছু কমে গেছে। সিংহ হয়ত ভেতরটা ভালো দেখতে পাচ্ছে না, চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেলেই সিংহ কি করবে কে জানে তবে মানুষের সাড়া পেলে পালিয়ে যাবে না নিশ্চয়। ও নিশ্চয় ক্ষুধার্ত নইলে এই দিন দুপুরে মানুষের গ্রামে আসত না। পশুটা আকারেও বেশ বড় মনে হচ্ছে।

মাবুলি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে, শুধু তার চোখ আমাকে লক্ষ্য করছে। সে চোখে গভীর আতঙ্ক। এক এক সেকেণ্ড পার হচ্ছে আর আমার মনে হচ্ছে একটা করে ঘণ্টা পার হচ্ছে। কে হারে কে জেতে? আমি এখন মরিয়া। রাইফেলটা হাতে তুলে নিতেই হবে নইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

চ্যাটাইয়ের ওপর আমার পায়ের শব্দ হতেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম, সিংহ লাফ না মারে। যা হয় হবে। আমি এখন দরজার সামনে, সিংহ আমাকে দেখতে পাবেই কিন্তু অন্য কোনো উপায়ও নেই। খোলা জায়গায় সিংহের মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু তখন হাতে অস্ত্র থাকে, দাঁড়িয়ে সিংহ মেরেছি। শুট্‌ করে এগিয়ে রাইফেলের ব্যারেল ধরলুম।

সিংহের গররর আওয়াজ শুনলুম। সেই মুহূর্তে আমিও রাইফেল সোজা করে ধরে প্রস্তুত। আওয়াজ এবার বেশ জোর। সিংহ লাফ মারবে। নিরাবরণ মাবুলি তখনও মাটিতে পড়ে। সিংহ তারই ওপর লাফিয়ে পড়ে কাঁচা মাংসে কামড় দেবে অথবা প্রচণ্ড জোরালো থাবার এক ঘায়ে আমাকে ঘায়েল করবে কে জানে?

অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। রাইফেলের ট্রিগারে হাত রেখে আমি মাবুলিকে বুটের আঘাত করলুম। মাবুলি সাহস করে দুটো পাল্টা খেয়ে সরে গেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিংহ লাফ মারল, সঙ্গে সঙ্গে আমি গুলি চালালুম। গুলি মোক্ষম জায়গায় লাগল না। সিংহ আমাকে ধাক্কা দিয়ে ধপাস করে পড়ল মাবুলি যেখানে শুয়েছিল। ভাগ্যিস বুদ্ধিহারা হই নি নইলে মাবুলির কি হতো কে জানে এবং মাবুলিও সাহস করে সরে গিয়েছিল।

আমি পড়ে গিয়েছিলুম কিন্তু এমন বিপদে দ্রুত কি করে উঠতে হয় সে শিক্ষা আমাদের নেওয়া আছে। রাইফেল হাতছাড়া হয় নি। বারুদের ও সিংহের গন্ধ। আমি উঠেই সিংহের দু চোখের মধ্যে গুলি করলুম, প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাংক। সিংহ গর্জন শুরু করেছিল, সে গর্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। মাবুলি উঠে বসল, আমিও। হাঁপাতে লাগলুম। মাবুলি কোনো কথা বলতে পারছে না তবে তার চোখ বলে দিলো তার ভয় দূর হয়েছে। মাবুলি আমাকে কিছু বলবার চেষ্টা করে থেমে গেল। মাবুলি কি বলতে চাইছিল? আমাকে কি ধন্যবাদ দিতে চাইছিল না অন্য কিছু বলতে চাইছিল? কথা বলবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করে শব্দটা যেন গিলে ফেলল। ধন্যবাদ নয়, অন্য কিছু বলতে চাইছিল। আমি একটু পরেই তা জানতে পারলুম।

ততক্ষণে গ্রামে সোরগোল শুরু হয়ে গেছে। সিংহের গর্জন ও দুটো বুলেটের আওয়াজ গ্রামবাসীদের সচকিত করতে যথেষ্ট। অনেকে বর্শা হাতে ছুটে এসেছে। ওদিকে গোয়ালে গরুগুলি ভয় পেয়ে রব তুলছে। অনেকের সঙ্গে তয়াবেনিও ছুটে এসেছে। তার হাতেও একটা বর্শা। চিৎকার করে কটূক্তি করছে, কার বিরুদ্ধে কে জানে? অনেকের চিৎকারে তার কথা বোঝা গেল না। সব বয়সের পুরুষ ও নারীতে চারদিক ভরে গেছে। অনেকে মৃত সিংহ লক্ষ্য করে অনেক কথাই বলছে।

আমি রাইফেলে দুটো টোটা ভরে বাইরে বেরিয়ে এলুম। হাতিয়ার সর্বদা প্রস্তুত রাখা আমার অভ্যাস। আমাকে দেখতে পেয়ে তয়াবেনি এগিয়ে এল। কুটিরের ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে আমার দিকে চাইল। সে দৃষ্টি যেন বলে দিলো এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলে। এবার বুঝতে পারলুম মাবুলি তখন কি বলতে চাইছিল, ভয়ে বলতে পারে নি।

তয়াবেনিকে তবুও জিজ্ঞাসা করলুম সিংহ কি করে তোমার কুটিরে ঢুকল?

দু হাত নেড়ে কাঁধ ঝেঁকে তয়াবেনি বলল, আমি কি করে জানব? আমি তো আমার ঘরে ছিলুম। তাবপর নাক কুঁচকে বলল, বিপদ, বিপদ, আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

মূল গেটখানা কিন্তু তয়াবেনির নিজের ঘর থেকেই খোলা ও বন্ধ করা যেত। কিন্তু তয়াবেনি কোন বিপদের সংকেত দিলো?

তয়াবেনি আবার গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করল, বিপদ আসছে, আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

বিপদ তো একটা কেটে গেল। ওর মেয়ের প্রাণ বাঁচল তবে আবার কোন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে তয়াবেনি। তার কণ্ঠস্বরও কেমন অদ্ভুত।

আমি তখন ঘরের বাইরে। কেউ মৃত সিংহটাকে ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। মাবুলির সঙ্গে যে কুটিরে বসে কথা বলছিলুম সেই কুটিরের সামনেই সেই গেট। ভিড় জমলেও গেট পার হয়ে ঐপথে একজনও আসে নি বা যায় নি। সে দিকটা ফাঁকা পড়ে আছে। আসবার মধ্যে একজন চতুষ্পদ এসেছিল যে এখন মৃত।

কিছুক্ষণ আগে গেট পার হয়ে ঐ পথে আমি এসেছি, আমার পরে আর কেউ আসে নি কিন্তু আমার বুটের চিহ্ন কোথায় গেল? বেশ বড় বুট, নরম মাটিতে বেশ গভীর ভাবে ছাপ পড়ে। সে ছাপ গেল কোথায়?

বেশ দেখা যাচ্ছে কেউ বুটের ছাপগুলো মুছে দিয়েছে। তাড়াতাড়ি কোনো গাছের ডাল দিয়ে। সেইসঙ্গে তার নিজের পায়ের ছাপও মুছে গেছে। তবুও পায়ের কয়েকটা ছাপ রয়েছে।

সে কে ? কেন ? এবং কি জন্যে ?
তয়াবেনি আমার পেছনে। তাকে বলব কি বলব না করেও প্রশ্নটা করে ফেললুম। ঘাড় ফিরিয়ে তয়াবেনির পায়ের দিকে চেয়ে দেখলুম। দুটো পা ধুলোয় ভর্তি।
তয়াবেনিকে সোজাসুজি প্রশ্ন না করে বললুম, কাজটা ঠিকভাবে করা হয় নি, ফাঁক থেকে গেছে। যাকগে এখন গেটটা খুলে দাও।
ভেবেছিলুম তয়াবেনি বোধহয় ক্ষেপে যাবে। তার হাতে বর্শাটা তখনও ছিল। ইচ্ছে করলে আমাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে পারে। তাই আমিও রাইফেলটা এমন ভাবে ধরেছিলুম যে ও বর্শা তাক করার সঙ্গে সঙ্গে ওকে আহত করবার জন্যে গুলি চালাব।
তয়াবেনি কিছুই করল না, শুধু হেসে দড়ি টেনে গেট খুলে দিলো। আমি গেটের দিকে এগিয়ে চললুম। গেটের কাছে আমার বুটের প্রথম ছাপটা রয়ে গেছে, তয়াবেনির দৃষ্টি সেদিক এড়িয়ে গেছে। আমি বুটের ছাপ দেখিয়ে বললুম, তয়াবেনি এই ছাপটা তোমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হয় নি, এখন আর কিছু করা যাবে না।
আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম যে তার অপকর্ম আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে। তয়াবেনি কোনো উত্তর দিলো না। কুটিল চোখে সে শুধু হাসল। কে জানে পরে সাফাই গাইবার জন্যে ইচ্ছে করেই হয়ত বুটের ছাপটা রেখে দিয়েছিল। ব্যাপারটা একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। মাবুলি আমাকে যা বলেছিল সবই তয়াবেনি শুনেছে। তারপর সে নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দড়ি টেনে গেট খুলে দিয়েছে। সিংহ হঠাৎ আগেই গোয়ালের কাছে ঘোরাফেরা করছিল। গেট খোলা দেখতে পেয়ে কিন্তু ঢুকে পড়েছে। গরু অপেক্ষা মানুষ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ, মানুষের মাংসও সুস্বাদু। সিংহকে ঢুকতে দেখে সে দড়ি টেনে আবার গেট বন্ধ করে দিয়েছে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে অপেক্ষা করছিল সিংহটা কখন তার ঐ চপলমতি মেয়েটাকে আর যে বিদেশীটা নাক গলাচ্ছে তাদের খতম করবে? তারপর বন্দুকের গুলি শুনে দাঁত দিয়ে নিজের দাঁত কামড়েছিল। প্ল্যান ভেস্তে গেল।
গেট থেকে বেরিয়ে আমি আমাদের ক্যাম্পের দিকে হেঁটে চললুম। উন্মুক্ত প্রান্তর, ঝোপঝাড়, পাহাড়ের খাত, এসবের মধ্যে সিংহ ওৎ পেতে থাকতে পারে। তাই চারদিকে নজর রেখে ও কান খাড়া করে হেঁটে চলেছিলুম।
ক্যাম্পে ফিরে বিশ্রাম নিয়ে কিছু খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিলুম। গরম দেশে দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে বিকেল ও সন্ধ্যার পর মেজাজটা ঠিক থাকে। রাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাই ওঠে না। ঘুম থেকে উঠে বাইরে এসে একটা চেয়ারে বসলুম। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে। অনেক দূরে যেন একটা সিংহ

হুঙ্কার দিলো।

সেদিন সিংহর সঙ্গে আমার বেশ একহাত হয়ে গেল, সেই কথা ভাবতে ভাবতে তয়ার্বেনি, মাবুলি আর নজুয়োও আমাকে ভাবিয়ে তুলল। মাবুলি এবং নজুয়োর মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। ঘটনাটা বড় সর্দার জিপুসোকে যত শীঘ্র সম্ভব জানিয়ে দেওয়া উচিত। জিপুসো নিশ্চয় আমার কথা বিশ্বাস করবে। কাল সকালেই আমি জিপুসোর সঙ্গে দেখা করে ঘটনাটা জানাব।

বৃষ্টি কি হবে ?

আমরা যেদিন কাবেনা আবিষ্কার করেছিলুম সেদিন জামানি চড়ুইপাখির মতো অনর্গল কথা বলতে আরম্ভ করেছিল, তারপর উত্তেজনা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারও কথা বলা কমে এসেছিল কিন্তু সেদিন রাত্রে আমি যখন খেতে বসেছি তখন জামানি আবার সেইদিনের মতো মুখর হয়ে উঠল। তাঁবুতে ঢুকেই বলল, মুশুঙ্গু খুব খারাপ খবর, খুব খারাপ।

আমাকে আর প্রশ্ন করতে হলো না খারাপ খবরটা কি ? সে নিজেই বলল, সারাদিন ধরেই ডুগডুগি মারফত খবর চালাচালি হচ্ছে। আরও দুটো বস্তিতে সিংহ হানা দিয়েছে। খবর পেয়েই প্রফেসর ও বিল যারা ক্যাম্পে ফিরে এসে বিশ্রাম না নিয়েই সেবাকাজের জন্যে ঐ বস্তি দুটোর দিকে ছুটে গেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পশ্চিমে কোনো দুটো বস্তিতে। সেখানকার বাসিন্দারা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহী হয়েছে।

বিদ্রোহী ? কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

জামানি বলল, কেন ? সর্দার আর গুণিনদের বিরুদ্ধে। ওরা সিম্বার আক্রমণ ঠেকাতে পারছে না। কত মানুষ আর গরু সিম্বার দল খেয়ে ফেলেছে, মানুষ ক্ষেপে যাবে না। বড় সর্দার জিপুসোর একজন ছোট সর্দার ওখানে একটা বস্তিতে খাজনা আদায় করতে গিয়েছিল তাকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে। বস্তির লোকেরা উন্মত্ত তাই বড় সর্দার বাছা বাছা দুশো যোদ্ধা নিয়ে তাদের থামাতে গেছেন।

জিপুসো এখানে নেই ? খারাপ খবর। তাহলে মাবুলির বিষয়ে তার সঙ্গে কাল কথা বলা হবে না। ইতিমধ্যে কিছু ঘটে যেতে পারে। আমার দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল।

জামানি থামে নি। সে বলছে, তারপর সুকুমবানা···

নামটা উচ্চারণ করেই জিভ কেটে সে থেমে গেল। কথাটা যেন গিলে ফেলল। এক সেকেন্ডও আর না দাঁড়িয়ে কিচেনের দিকে ছুটে পালাল।

সুকুমবানাকে আমি জানি। সে হলো জুলু শিকারীদের উইচ ডক্টর। লোকটা সুবিধের নয়, আক্ষরিক অর্থে যাকে বলে বুনো সে তাই। তার সঙ্গে কারও বনে না একমাত্র বনে তয়াবোনির সঙ্গে। তয়াবোনির সে পরম বন্ধু। কয়েক দিন আগে তাকে আর তয়াবোনিকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলুম। তাদের হাত নাড়া ও চোখের ইঙ্গিত দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল ওরা কোনো কুমতলব আঁটছে।

খাওয়া শেষ করে আমি জামানিকে আমার তাঁবুতে ডাকলুম। পরদিন তাকে কি করতে হবে এজন্যে প্রত্যহ আমি তাকে এই সময়েই ডাকি। কিন্তু সুকুমবানার কথা তুলতেই সে যেন আঁৎকে উঠল। সুকুমবানা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মন্ত্র পড়ে ওকে বুঝি গাধা বানিয়ে দেবে। আমার প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে সে আফশোস করতে লাগল, কেন মরতে নামটা উচ্চারণ করতে গেলুম, সুকুমবানা টের পেলে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে। মুশুংগু আমাকে মাপ কর, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি বললুম, তা হবে না, ঝেড়ে কাশো। যা জানতে পেরেছ সব আমাকে বল নইলে আমার ভূত তোমার সর্বনাশ করবে। সেই মৃত্যুকূপ থেকে বেঁচে ফিরে আসবার পর থেকে তো জামানি বিশ্বাস করে যে আমার ভূতও আমার সংগে থাকে। এখন সে ভয় পেয়ে গেল। এগোলেও বিপদ পেছোলেও বিপদ। তার চেয়ে এখন সামনে যে রয়েছে তার হাত থেকে তো বাঁচি। এই ভেবেই বোধহয় জামানি একটু একটু করে আমাকে অনেক খবরই জানাল। আমি এত আশা করি নি। তবে দুঃসংবাদ সে গড়গড় করে বলে যায় নি। মাঝে মাঝে মোচড় দিতে হয়েছিল। তবে সে আমাকে বলেছিল আমি যেন বড় সর্দারকে অর্থাৎ জিপুসোকে কিছু না বলি।

জামানি আমাকে যা বলেছিল তা সংক্ষেপে হলো এই যে বৃষ্টির দেবতা উনজিয়ানাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে সব রকম অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি কোনো কিছুতেই কান দেন নি। এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়ে নি। উপরন্তু সিংহর সংখ্যা বাড়ছে, তারা ক্রমশঃ বেপরোয়া হয়ে উঠছে, তাদের সামলানো যাচ্ছে না। জুলুরা হতাশ হয়ে পড়ছে, তারা তাদের গুণিন, উইচ ডক্টর, রোজা ও নেতাদের ওপর চাপ দিচ্ছে, একটা কিছু কর নইলে যে আমরা সকলে মারা পড়লুম। এমন কি কোনো গুণিনকে তারা অপমান পর্যন্ত করেছে, প্রহারের ভয়ও দেখিয়েছে। তয়াবেনির ছেলেরা লোক ক্ষেপিয়ে তুলছে। তয়াবেনিরও স্বার্থ আছে। জিপুসোর ওপর সে প্রতিহিংসা নিতে তো চায়ই উপরন্তু তাকে স্থানচ্যুত করে বড় সর্দার হতে চায়।

তাহলে তয়াবেনি আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। তার ছেলেরা গেট তৈরি করবার জন্যে কাকার বাড়ি যায় নি। তয়াবেনির ছেলেরা এখন বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে ঘুরে দল ভারী করছে। বলতে গেলে তারা একটা বিদ্রোহী দল তৈরি করে ফেলেছে এবং তারা সুকুমবানার পরামর্শ অনুসারে চলছে। সুকুমবানা স্বয়ং উনজিয়ানার সংগে আলোচনা করেছে অন্ততঃ জামানির তাই খবর।

উনজিয়ানা ও সুকামবানার আলোচনার কথা বলতে বলতে জামানি কি রকম হয়ে গেল, তার মুখ শুকিয়ে গেল। মাঝে মাঝে কথা থামিয়ে ওপর দিকে মুখ তুলে কারও কাছে ক্ষমা চাইতে লাগল। তার অবস্থা এমন হলো বুঝি এখনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাকে সাহস যোগাতে সে অবশ্য সামলে নিল। তারপর

অত্যন্ত গোপনীয় খবরটি সে আগে চারদিক চেয়ে এমন কি তাঁবুর বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখে এসে ফিশফিশ করে আমাকে বলল যে বৃষ্টির দেবতা স্বয়ং উনজিয়ানা সুকুমবানাকে দর্শন দিয়ে বলেছেন যে এই সংকটের মূলে আছে আর একজন জুলু যোদ্ধা যার দৃষ্টি ক্ষতিসাধন করছে। সেই লোকটাকে খুঁজে বার করে তাকে চরম দণ্ড দেওয়া না হলে দেশে বৃষ্টি হবে না, শান্তিও ফিরবে না। সেই দুষ্ট লোকটাকে খুঁজে বার করতে হলে, গন্ধমেলা করতে হবে। শব্দটা শুনতে ভালো কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর এই মেলার মূল অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান যে সফল করতে পারে সে হলো সুকুমবানা। বড় সর্দারের বিরুদ্ধেও উনজিয়ানার একটু অভিযোগ আছে। তার হিংসাও এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ।

আমি বললুম, জিপুসো কাকে হিংসা করে? তয়াবেনিকে?

আমার উত্তর শুনে জামানি যেন ঘাবড়ে গেল। সে জিপুসোর নাম বলতে চায় নি। জামানি হয়ত এইখানেই থেমে যেত কিন্তু নামটা আমি ফাঁস করে দিতে সে আরও কিছু খবর দিতে উৎসাহিত হলো।

কিন্তু যে জামানি আমাদের ক্যাম্প থেকে কোথাও যায় না সে এত খবর সংগ্রহ করল কি করে? সে বলল, জিপুসো বিদ্রোহ দমন করবার জন্যে পশ্চিমে যাবার আগে গন্ধমেলা করবার জন্যে সুকুমবানা তার অনুমতি চেয়েছিল কিন্তু জিপুসো অনুমতি দেয় নি, কারণ এই অনুষ্ঠানে নানা ছলে নরবলি দেওয়া হয় এবং সেই নরবলি উপলক্ষ্য করে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়।

আমি যেন নিজের মনেই বললুম, গন্ধমেলাটা ওরা তাহলে কাল করবে।

জামানি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো, না, মুশুংগু কাল নয়। তারপর সে চুপ করে গেল। একটা কথাও বলল না বা তার মুখ থেকে কোনো কথা বার করা গেল না।

পরদিন আমি ক্যাম্প থেকে বেরোলুম না। সারাদিন ক্যাম্পে রইলুম আর শুনতে লাগলুম ডুগডুগির অবিরাম আওয়াজ, ডিম ডিম ডিম ডিম ডুম ডুম ডুম ডুম ডাগ ডাগ ডাগ ডাগ ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ··· । মার্কনি রেডিও আবিষ্কার করার অনেক আগে থাকতেই আফ্রিকার আদিবাসীদের এই বেতার মারফত সংবাদ আদানপ্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে। অ্যামেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা ধোঁয়া মারফত বার্তা পাঠাত।

আমার ক্যাম্পে যে কয়েকজন জুলু ছোকরা কাজ করত তাদের যখন জিজ্ঞাসা করলুম, কি হে ডুগডুগিতে কি খবর বলছে? আমাদের কোনো বিপদ ঘটবে না তো?

ওরা বোকা সাজল, বলল ওরা ঐ সাংকেতিক ভাষা জানে না, কে জানে কি বলছে? জামানিও বোকা সাজল, বলল সে কিছুই ধরতে পারছে না। ওরা

বোধহয় নতুন কিছু শব্দ ব্যবহার করছে।

আমি যে সময়ে ঘুম থেকে উঠি পরদিন সকালে তার অনেক আগে আমার ঘুম ভেঙে গেল। কেন আগে ঘুম ভাঙল? কারণ কি? অনুভব করলুম চারদিকে দুঃস্বপ্নের মতো একটা নীরবতা বিরাজ করছে। কোনো শব্দ নেই। আশ্চর্য! একটা পাখি বা কুকুরও ডাকছে না। অবশ্য পাখিরা এই খরার দেশ ছেড়ে আগেই অন্যত্র চলে গেছে আর কুকুর? তারাও তো পালিয়েছে। কয়েকটা না খেতে পেয়ে ধুঁকছে বা মরেছে।

ক্যাম্প খাট থেকে নেমে তাঁবুর মুখ খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখলুম রাতের পাহারাদার মানুষগুলো নিবে আসা আগুনের সামনে প্রস্তরমূর্তির মতো নিশ্চল হয়ে বসে আছে। কয়েকটা ছোকরা নিঃশব্দে সকালের নাস্তা তৈরি করছে। ডুগডুগি নীরব। এ যেন প্রাণহীন এক রাজ্য। আজ নীরবতাই যেন কথা বলছে। তৈরি থাক, শীঘ্রই সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটতে চলেছে, সংকেত তো তোমরা পেয়েই গেছ। জিপুসো তখন পশ্চিমে, তার কানে যেন কোনো বার্তা না পৌঁছয়।

বাইরে বেরিয়ে দেখা যাক ব্যাপারটা কি? স্নান সেরে, পোশাক পরে ব্রেকফাস্ট খেয়ে জামানিকে বললুম, আমার লাঞ্চ ব্যাগ, ক্যামেরা আর রাইফেল নিয়ে আয়। জামানি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, আমার আদেশ পালন করবার কোনো লক্ষণ কিন্তু দেখা গেল না। এবার কড়া ভাষায় অর্ডার করতে হলো কিরে কানে কথা যাচ্ছে না?

জামানি জিনিসপত্তরগুলো আনতে তাকে বললুম, রাইফেল নিয়ে তুইও আমার সঙ্গে চল। আমরা তয়াবেনির গ্রামে যাব।

জানতুম এ আদেশ অন্ততঃ জামানি পালন করবে না। এমন আদেশ সে আশা করেছিল কিনা জানি না তবে ঘোর আপত্তি তো জানালই উপরন্তু ক্যাম্প থেকে বেরোতে আমাকেও বার বার নিষেধ করতে লাগল। তারপর সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। এক চুলও নড়ল না। সে যেন হঠাৎ একটা স্ট্যাচু হয়ে গেছে। বুঝলুম জামানিকে স্থানচ্যুত করা যাবে না। আমাকে একাই যেতে হবে।

তয়াবেনির গ্রাম আমাদের গ্রাম থেকে এক ঘণ্টার হাঁটাপথ। যাত্রা করলুম। পথে মাত্র একটা সিংহর সঙ্গে দেখা হলো। ছবি তোলবার জন্যে সে যেন অপেক্ষা করছিল। ছবি তুললুম কিন্তু গুলি করতে হলো না। ক্যামেরা দিয়েই 'শুট' করলুম। গুলি করতে ইচ্ছাও ছিল না। গুলির শব্দে কেউ আকৃষ্ট হোক তাও আমার ইচ্ছা ছিল না। কারণ আরও কিছু পরে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় উঠে যা দেখেছিলুম তারপর গুলির আওয়াজ করা চলত না।

তয়াবেনির গ্রামও একটা পাহাড়ের মাথায়। এই পাহাড়টার মাথা থেকে দেখা

যাচ্ছে। তয়াবেনির গরুর পাল এসময়ে গোয়ালে আবন্ধ থাকে না, মাঠে বার করে দেওয়া হয়, কিন্তু গরুগুলো গোয়ালে বন্ধ রয়েছে। তার কুটিরের ফটক খোলা রয়েছে, সেখানে অনেক রমণী জড়ো হয়েছে। তারা ফটকের ভেতরেই রয়েছে কিন্তু বাইরে কয়েক শত পুরুষ, নানা দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতে বর্শা, মাঝে মাঝে বর্শা তুলে উল্লাসে চিৎকার করছে, রোদ পড়ে বর্শার ফলাগুলো ঝকমকিয়ে উঠছে।

তারপর লক্ষ্য করলুম আশপাশের সব ঝোপঝাড় আগুন জেবলে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, কালো ছাই স্তূপাকার হয়ে জমে রয়েছে। সিংহ যাতে ঝোপে লুকিয়ে থাকতে না পারে এই জন্যেই ঝোপগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। পাহাড় ও পাথরের খাঁজে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশ বড়সড় একটা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

এখন আমার পক্ষে ক্যাম্পে ফিরে যাওয়াই উচিত। ওদের ব্যাপারে আমার নাক গলানো উচিত নয়, অথবা যেখানে আছি সেখানেই দাঁড়িয়ে দেখি ওরা কি করে। যদিও এখান থেকে স্পষ্ট কিছু শোনা বা দেখা যাবে না। নাকি এগিয়ে গিয়ে এমন একটা অনুষ্ঠান দেখব যা কোনো শ্বেতকায় মানুষ দেখে নি। কিছু দুর্লভ ছবিও তুলতে পারব এবং কে জানে বৃথা রক্তপাতও হয়ত বন্ধ করতে পারব। তাই ভালো, এগিয়েই যাই।

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলুম। যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম রাইফেলটা সেখানেই নামিয়ে রাখলুম, তারপর মাথা উঁচু করে জনতার দিকে এগিয়ে চললুম। আমি নিরস্ত্র। ওদেয় জানিয়ে দিতে চাই আমি দর্শক হিসেবে এসেছি, আমি শান্তি চাই, আমি তোমাদের বন্ধু, আমার জীবন মরণ তোমাদের হাতে। তাছাড়া শতখানেক বর্শা এবং বিষাক্ত তীরের বন্ধু একটা মাত্র রাইফেল কি করবে?

আমি যখন পাহাড় থেকে প্রায় নেমে এসেছি তখন কেউ যেন সাবধানবাণী উচ্চারণ করল। কাকে সাবধান করল? আমাকে না নিজেদের? জনতা সহসা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। সকলেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে যেতেই জনতা আবার আগের মতো সরব হলো এবং কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে উঠতে লাগল। আমি গ্রাহ্য না করে, না থেমে, বিপরীত দিকে একটা ঢালু জায়গা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললুম। আজ ওরা সকল সৌজন্যবোধ শিকেয় তুলে রেখেছে। অন্যান্য দিন ওরা আমাকে কিছু খাতির করে, স্যালুট করে, হাসে কিন্তু আজ যেন ওরা আমাকে জানাতে চায় মুশুঙ্গু তুমি কেন এখানে এসেছ? আমরা চাই না তুমি এখানে থাক।

ডান হাত তুলে এবং নেড়ে জনতাকে লক্ষ্য করে আমি বেশ জোরে বললুম, 'সালাগতলে', শান্তি, শান্তি।

মাত্র একজন সাড়া দিলো। লোকটি বৃদ্ধ। জুলু মহলে জ্ঞানী বলে পরিচিত।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সে সমাধান করেছে। এখনও তার পরামর্শ নেওয়া হয়। তার মাথায় কোনো জন্তুর সিং বসানো মুকুট। যৌবনে সে অনেক শ্বেতকায় হত্যা করেছে, এই মুকুট হলো তার প্রতীক। সম্ভবতঃ সিং-এর সংখ্যা নিহত সাহেবের সংখ্যা জানিয়ে দেয়।

এই বৃদ্ধ আমার বিশিষ্ট বন্ধু। এখন সোজা হয়ে হাঁটতে পারে না, পাও কাঁপে, তবুও উঠে এসে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল। আমি তাকে অনুরোধ করলুম, তুমি এদের বল আমি এখানে এসেছি দর্শক হিসেবে, আমার কোনো মতলব নেই। আমি এখানে যা দেখব বা শুনব তার কণামাত্রও আমি সরকারী কর্তাদের জানাব না।

বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ হাত তুলে জনতাকে শান্ত হতে বলে আমার কথা জনতাকে জানিয়ে দিলো। সে আরও জানিয়ে দিলো যে আমার সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই শুধু আছে একটা ম্যাজিক বক্স অর্থাৎ আমার ক্যামেরাটি। বৃদ্ধ জনতাকে মনে করিয়ে দিলো যে আমরা ওদের অনেকের চিকিৎসা করে সুস্থ করেছি, সিংহ মেরে অনেকের প্রাণ বাঁচিয়েছি। সিংহের দ্বারা আহত ব্যক্তিদের এখনও চিকিৎসা করছি এবং অনেক উপহারও দিয়েছি।

বৃদ্ধ থামলে সুকুমবানা একটা বক্তৃতা দিলো যার সারাংশ হলো, সাদা চামড়া-গুলো চুলোয় যাক। সুকুমবানার বক্তৃতা শেষ হলে আরও কেউ কেউ বক্তৃতা দেবার লোভ সামলাতে পারল না। কেউ আমার উপস্থিতি সমর্থন করল, কেউ বলল আমাদের বিরুদ্ধে। তবে লক্ষ্য করে দেখলুম আমরা যাদের চিকিৎসা করেছি বা অন্যভাবে উপকার করেছি তারা কেউ আমাদের বিরুদ্ধে বলে নি। এই "অসভ্য জংলী" জুলুরা এখনও দুমুখো নীতি শেখে নি।

আমি আমার কান খাড়া রেখেছি, সব শুনছি যেন ভান করছি আমি কিছু জানি না। শুনছি না, আমার 'ম্যাজিক বক্স' দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো ছবি তুলছি।

তয়াবেনিকে দেখতে পাচ্ছি না, সে বোধহয় এখনও আসে নি। সে আসবার আগে একটা কাজ করা যাক। আমি সেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বললুম তুমি একটা 'মতদান' নাও, বেশির ভাগ লোক যদি চায় আমি এই মিটিং থেকে এখনি চলে যাব।

বৃদ্ধ বলল, ভালো কথা বলেছ। তার ঘোষণা অনুসারে যারা আমার পক্ষে তারা তাদের বর্শা তুলে আমার প্রতি সমর্থন জানাল। আমার ভোট বেশি হলো। আমি থেকে গেলুম। বিরুদ্ধ দল জনতার রায় মেনে নিল। আমিও চলে গেলুম।

বিরক্তি চেপে সুকুমবানা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে জনতার উদ্দেশ্যে কিছু আদেশ দিলো। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল, এখন কাছাকাছি এসে বসে

পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল। কি আলোচনা আমি জানি না। জনতা যেন আমার অস্তিত্ব ভুলেই গেল।

জনতার মধ্য থেকে সঙ্গীতের একটা সুর ভেসে এল। এই সঙ্গীত যেন একটা ইঙ্গিত। সঙ্গীত আরম্ভ হতেই তয়াবেনি তার কুটির থেকে বেরিয়ে এল দুমদুম করে পা ফেলতে ফেলতে, যেন বড় সর্দার আসছে। দেখে মনে হলো সে যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। তয়াবেনিকে দেখেই মেয়ের দল উঠে চলে গেল আর পুরুষরা দুধারে সরে গিয়ে তয়াবেনিকে পথ করে দিলো।

তয়াবেনির কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। জনতার বৃত্তের মধ্যে মাটিতে একটা বর্শা পোঁতা ছিল। রোদ পড়ে ফলাটা চকচক করছিল, তার দৃষ্টি সেই ফলার দিকে। সঙ্গীতের সুর উচ্চগ্রাম থেকে নিম্নগ্রামে নেমে এল। সঙ্গীতের সুরে তয়াবেনির চাবুকের মতো দেহটা তালে তালে হেলতে দুলতে লাগল। এক সময়ে সঙ্গীত থেমে গেল।

তয়াবেনির আন্দোলিত দেহ নিশ্চল হলো। তার মুখের ভাব ও দৃষ্টি দেখে মনে হলো সে কিছু একটা করতে চলেছে। তার দেহে বোধহয় কেউ ভর করেছে।

তয়াবেনি মাটিতে পোঁতা সেই বর্শাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এখন সে সহসা একটা লাফ দিয়ে দূরে সরে গেল। ইতিমধ্যে যোদ্ধারা সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তয়াবেনি একে একে যোদ্ধাদের গায়ের গন্ধ শুঁকতে লাগল। একে একে সে সকল যোদ্ধার গায়ের গন্ধ শুঁকল। তারপর ফিরে এসে সে আবার কারও গায়ের গন্ধ দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার শুঁকতে লাগল। দেহের গন্ধ নেবার সময় তার ক্ষিপ্রতা দেখলে অবাক হতে হয়। যন্ত্রচালিতের মতো সে দ্রুতবেগে সারবন্দী মানুষগুলোর গায়ের গন্ধ শুঁকে বেড়াতে লাগল কিন্তু একবারও তাকে নাক কুঁচকোতে দেখলুম না। তয়াবেনির হালচাল দেখে আমার সন্দেহ হলো ওর অন্য মতলব আছে, আসামী সে আগেই ঠিক করে রেখেছে। এখন যা করছে তা লোকদেখানো মাত্র। আসামী কে হতে পারে অনুমান করে আমি রীতিমতো শংকিত হলুম এবং মাবুলির জন্যে দুঃখিত হলুম।

জন্তুদের ঘ্রাণশক্তি প্রখর বিশেষ করে কুকুরের। যে মানুষ নিজেকে গুণিন বলে পরিচয় দেয় সে হয়ত দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে গন্ধ বিচার করতে পারে, নির্দোষ বা দোষী লোক খুঁজে বার করতে পারে। তয়াবেনির এই বিশেষ গুণ আছে কিনা এবং দীর্ঘ দিন অনভ্যাসের ফলে তার সেই শক্তি বজায় আছে কিনা জানি না।

চুরি ডাকাতি বা হত্যার আসামীর দেহের গন্ধ হয়ত গুণিনরা ধরতে পারে, কিন্তু দেশে বৃষ্টি হলো না সেজন্যে বিশেষ একজন অপরাধী এবং তার গায়ের গন্ধ অন্যরকম হবে এটা কি করে সম্ভব? তবে জুলুরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তারা

যুক্তিহীন অনেক ব্যাপার বিশ্বাস করে।

আমি তখন মেয়েদের ছবি তোলবার চেষ্টা করছিলুম। জনতার ভেতর থেকে একটা হিস্‌হিস শব্দ শোনা যাচ্ছিল। সে শব্দ সহসা থেমে গেল। তয়াবেনির কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে চাইলুম। এক পৈশাচিক উল্লাসে সে চিৎকার করে উঠেছে, এই সেই শয়তান, এরই জন্যে আকাশে জলভরা মেঘ শুকিয়ে যাচ্ছে।

সমবেত জনতা উল্লাসে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল। আসামী যখন ধরা পড়েছে তাকে সাজা দিলেই বুঝি ঝরঝর করে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

আসামী কে ?

আসামী কে ? আমি দেখবার চেষ্টা করছি আর সেই মুহূর্তে একটি কালো কিশোরী আমার পাশ দিয়ে তীরবেগে ছুটে পালাল। তাকে আমি চিনতে পারলুম, মাবুলি।

সকলে তখন তয়াবেনি ও আসামীকে দেখবার জন্যে উৎসুক তাই মাবুলিকে কেউ লক্ষ্য করে নি। আমি তাকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলুম। তাকে ডাকলে অনেকের দৃষ্টি তার দিকে পড়বে ; তাকে বাধা দেবে। মাবুলি নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্যে যাচ্ছে, তার সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আমি থেমে গেলুম।

জনতার সে কি উল্লাস। যেন হঠাৎ বৃষ্টি নেমে গেছে, পৃথিবী শীতল হয়েছে। অরণ্যবাসী, ঘর্মাক্ত কৃষ্ণাঙ্গ নিরাবরণ পুরুষের এমন সমবেত উল্লম্ফন ও বর্শা আন্দোলন করে নৃত্য আমি দেখি নি। তয়াবেনি কাউকে ধরে টেনে আনছে। আসামীর মুখ আমি তখনও দেখি নি। কিন্তু মাবুলির ক্ষিপ্রতা আমাকে আসামীর নাম বলে দিলো। আমার অনুমান তাহলে মিথ্যা নয়। কি সর্বনাশ হতে চলেছে। এই উন্মত্ত জনতার হাত থেকে বেচারা নজুয়োকে কে রক্ষা করবে ?

তয়াবেনির হাত থেকে বেচারা এখন জনতার হাতে চলে গেছে। টানা হ্যাঁচড়াতে তার সামান্য পরিধেয় ছিন্নভিন্ন হয়ে কোথায় পড়ে গেছে। উলঙ্গ দেহটাকে ধরে জনতা নিয়ে চলল একটা গাছের দিকে। জনতার ধিক্কার ও কটূক্তি তার কানে পৌঁচছে কিনা কে জানে। সে এখন জীবন্মৃত।

পত্রহীন বড় একটা গাছ। বেশ মোটা গাছ। অমসৃণ ও রুক্ষ্ম গুঁড়ি। গাছটাকে ওরা বলে "যন্ত্রণার গাছ"। জামানি আমাকে কোনো সময়ে গাছটার কথা বলেছিল। অপরাধীকে এই গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় তারপর যোদ্ধারা বর্শা হাতে তাকে ঘিরে গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে বর্শার ফলক দিয়ে তার নিরাবরণ দেহে খোঁচা মারতে থাকে। রক্তে তার দেহ ভিজে যায়। যে পর্যন্ত না রক্তক্ষয়ে তার মৃত্যু হয় সে পর্যন্ত এই বর্শানৃত্য চলতে থাকে। তাই এই গাছের নাম যন্ত্রণা বৃক্ষ।

আমাকে কি এমন নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখতে হবে ? এই অন্যায় ও ঘৃণিত কাজ কি তয়াবেনির করবার অধিকার আছে ? সে কথা ভাববার সময় আছে কিন্তু আপাততঃ আমি চিন্তায় পড়লুম। সিংহ যেমন মানুষের রক্তর স্বাদ পেয়ে আরও রক্তর জন্যে ক্ষেপে যায় তেমনি জঙ্গলের এই মানুষগুলিও রক্ত দেখে নিষ্ঠুর উল্লাসে উল্লসিত হয়ে আমাকে আক্রমণ করবে না। 'আসামী' ধরা

পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা ক্ষেপে গেছে। তারা এখন কোনো যুক্তি তর্ক মানবে না। ওরা এখনই রক্তপিপাসু প্রাণীতে পরিণত, পশুর সঙ্গে ওদের প্রভেদ নেই।

আমি কি চুপি চুপি সরে পড়ব? বন্দুকটা তুলে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাব? কিন্তু নিরাবরণ একটা কিশোরী মেয়ে যদি সিংহর ভয় তুচ্ছ করে তার দয়িতের মুক্তির জন্য—যা অনিশ্চিত, কোথাও ছুটে যেতে পারে তাহলে আমি একজন শক্তসমর্থ পুরুষ কোন মুখে ভীরুর মতো স্থান ত্যাগ করব?

নজুয়োকে গাছের কাছে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। বেচারার সারা গা ঘামে ভিজে গেছে, গাল বেয়ে ঘাম আর চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, থরথর করে কাঁপছে। গোলমাল অনেক কমে গেছে। সুকুমবানা নানা জনকে নানা নির্দেশ দিচ্ছে। যারা নজুয়োকে ঘিরে বর্শা হাতে নৃত্য করবে তাদের বলছে গাছ ঘিরে বৃত্ত রচনা করতে।

তিনজন জ্ঞানী বৃদ্ধ আছে। তাদের মতামত শুনে কিছু বলতে দেওয়া হবে। যে বৃদ্ধ আমার সঙ্গে হ্যান্ডশ্যেক করেছিল তাকে প্রথম সুযোগ দেওয়া হলো। বৃদ্ধ নজুয়োকে জিজ্ঞাসা করল সে দোষী কি না। যতদূর সম্ভব জোরে ঘাড় নেড়ে নজুয়ো তার দোষ অস্বীকার করল। সে কি জানে না দেশে অনাবৃষ্টি হলে তারও ক্ষতি অতএব জেনেশুনে সে কেন পাপ করতে যাবে যেখানে ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে। বৃদ্ধ মত দিলো যে বড় সর্দার জিপুসো না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করা হোক। জনতার তরফ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ চোখ মটকে বাঁকা হাসি হেসে বলল, আসামী ধরা যখন পড়েছে তখন আর বড় সর্দারের জন্যে অপেক্ষা করে লাভ নেই। ডুগডুগির আওয়াজ শুনতে না পেয়ে বড় সর্দার কিছু সন্দেহ করে এখনি ফিরে আসতে পারে। জনতার তরফ থেকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া শোনা গেল, কেউ সমর্থন করল, কেউ প্রতিবাদ।

তয়াবেনির দিকে কটাক্ষ করে তৃতীয় বৃদ্ধ বলল, আসামী ধরা পড়েছে, এখনি শাস্তিও দেওয়া উচিত তবুও আমাদের প্রচলিত রীতি মেনে চলা উচিত। তার পাপ প্রমাণ করে নেওয়া হোক। ফুটন্ত গরম জলে নজুয়োর ডান হাত ডুবিয়ে দেওয়া হবে। হাতে যদি ফোস্কা পড়ে তাহলে তার অপরাধ প্রমাণিত হবে নচেৎ সে নির্দোষ।

জনতা এবার বর্শা তুলে সোল্লাসে তাকে সমর্থন জানাল। তয়াবেনি যেন তৈরি হয়েই ছিল। তার কুটিরে জল ফোটানো হচ্ছিল। তৃতীয় বৃদ্ধের রায় শেষ হতে না হতেই সে ছুটে গিয়ে এক পাত্র ফুটন্ত জল নিজের কুটির থেকে নিয়ে এল।

নজুয়ো তখন বৃথা পালাবার চেষ্টা করছে। পাত্রটা মাটিতে নামিয়ে নজুয়োর

ডান হাত সজোরে ধরে গরম জলে ডুবিয়ে দিয়ে চেপে ধরে রইল। নজুয়ো যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। তার কাতর ক্রন্দন কারও মন গলাতে পারল না বরঞ্চ জনতার চিৎকারে তার কান্না চাপা পড়ে গেল।

ভাবলুম বলি তয়াবেনি এবং অনেকেই তো নির্দোষ। তারা তাদের হাত গরম জলে ডুবিয়ে দিক, দেখি কেমন ফোস্কা না পড়ে? কিন্তু কাকে বলব? কে আমার কথা শুনবে?

সুকুমবানা চিৎকার করে উঠল, নজুয়ো অপরাধী। সে জল ভরা মেঘ শুকিয়ে দিয়েছে, সিংহের দল ক্ষেপিয়েছে, আমাদের অনাহারে রাখবার জন্যে সব শিকার তাড়িয়েছে। মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু! বর্শার খোঁচা দিয়ে তিলে তিলে ওকে মারা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে দশ বারোজন যোদ্ধা ছুটে এসে উলঙ্গ নজুয়োকে গাছের সঙ্গে চেপে ধরে গরুর চামড়ার দড়ি দিয়ে তাকে গাছের সঙ্গে এত জোরে বাঁধল যে তখনি দেহের নরম অংশ ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। উঃ! আমি আর দেখতে পারছি না।

কেউ একটা গান আরম্ভ করল। জনতার অনেকে কোরাসে গলা মেলাতে লাগল। নজুয়োকে ঘিরে নাচ শুরু হলো। যোদ্ধারা গানের সুরে গলা মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে নজুয়োকে ঘিরে নাচতে নাচতে তাদের বর্শা নজুয়োর দেহের খুব কাছে নিয়ে যেতে লাগল কিন্তু স্পর্শ করল না।

বুঝলুম এটুকু হলো ভূমিকা। নাচ যত চলবে নজুয়োর দেহ থেকে দূরত্ব তত কমবে এবং বর্শাগুলি ওর দেহ বিদ্ধ করতে থাকবে, রক্ত ঝরাবে, যে পর্যন্ত না তাজা প্রাণটা ওর দেহপিণ্ড ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

আমি লেখাপড়া জানা একজন সভ্য মানুষ। এই নিষ্ঠুর মৃত্যু কি আমাকে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে? আমি এতই অসহায়? কিছুই করবার নেই।

হায়! এখনি যদি বৃষ্টি নামে? কিন্তু কোনো লক্ষণও তো দেখছি না। আকাশ নির্মেঘ। দু একখানা মেঘ দূরে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তারা কি বৃষ্টি বয়ে আনছে? এখনি বৃষ্টি হবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

নজুয়ো এবং আমাদের তিনজনকেও বাঁচাবার জন্যে কিছু একটা করতেই হবে। জুলুরা একবার ক্ষেপে গেলে তাদের থামান যাবে না। তিরিশ বছর আগে একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল। এক রাত্রে জুলুরা উন্মত্ত হয়ে নাগালের মধ্যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ নরনারী ও শিশুদের নির্মম ভাবে হত্যা করেছিল। নিহতের সংখ্যা কত? দু হাজার দুশো। এমন ঘটনা আবার ঘটতে বাধা কোথায়? এবার তো সংখ্যা নগণ্য, মাত্র তিনজন।

কিন্তু এমন নৃশংসভাবে একজন যুবককে মরতে দেওয়া উচিত নয় এবং অসহায়-ভাবে মরাও ঠিক নয়। কিছু একটা এখনি করা দরকার। আমি একা এবং

উঃ ! আমি আর দেখতে পাচ্ছি না

নিরস্ত্র, কি করতে পারি ?

একটা মাত্র উপায় আছে। মাবুলি সম্ভবতঃ, সম্ভবতঃ কেন নিশ্চয়, বড় সর্দার জিপুসোকে খবর দিতে গেছে। মাবুলি জিপুসোর কাছে পৌঁছিতে ও তাকে নিয়ে ফিরে আসতে দু ঘণ্টা সময় লাগবে। নজুয়োর মৃত্যু আমাকে এই দু ঘণ্টা স্থগিত রাখতে হবে। বৃত্তাকারে মরণ নৃত্য বন্ধ করতে হবে।

আমার সঙ্গে সর্বদা পকেটে একটা পকেট ব্যারোমিটার থাকে। গত কালের চেয়ে কাঁটা কয়েক পয়েণ্ট নেমে গেছে এবং ধীরে ধীরে 'রেন' চিহ্নর দিকে কাঁটা এগিয়ে চলেছে। আশা করা যায় কয়েক দিনের মধ্যেই বৃষ্টি নামবে। কিন্তু কয়েক দিন নয় আমি যে চাই এখনি বৃষ্টি নামুক ।

এখন বেলা এগারোটা। মাবুলি যাবার পর এখনও এক ঘণ্টা হয় নি। মরণ-নৃত্যের যোদ্ধাদের কণ্ঠস্বর চড়ছে, পায়ের গতি বাড়ছে। তাদের বর্শাফলক এখনও নজুয়োর দেহ স্পর্শ করে নি। নজুয়োর মাথা ঝুলে পড়েছে। মনে হয় সে আত্মসমর্পণ করেছে। যা ঘটবার তা ঘটুক। তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরোচ্ছে না। দু চোখ বন্ধ। একটা সজীব গাছ যেন সহসা মলিন হয়ে গেছে। আমার সমস্যা হলো প্রায় দেড় ঘণ্টা আন্দাজ সময় কি করে এদের ঠেকিয়ে রাখব ? আমার ঘড়িতে এগারোটা বেজে আঠারো মিনিট। নৃত্যকারীরা সহসা চিৎকার করে উঠল। প্রথম রক্ত ঝরল, বেশি নয়, সামান্য। নজুয়োর বাম উরুতে বর্শার ফলক খোঁচা মেরেছে। ফলকের ডগেও লাল রক্ত চিকচিক করছে।

যত জোরে সম্ভব আমি চিৎকার করে উঠলুম, থাম, থাম।

সহসা আমার চিৎকার শুনে নিয়ম ভেঙে নাচিয়ের দল থেমে গেল।

আরও গলা চড়িয়ে আমি বলতে লাগলুম, বৃষ্টি আসছে, জুলুভাইরা নিরাশ হোয়ো না, বৃষ্টি আসছে। উনজিয়ানা জলভরা কালো মেঘ পাঠাচ্ছেন।

তাদের এভাবে থামিয়ে দেওয়ায় তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, যেন বোলতার বাসায় ঢিল পড়ল। তবুও তারা আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইল। কোথায় কালো মেঘ ? তারা গজগজ করতে লাগল, আমার প্রতি কটূক্তিও। আমি ততক্ষণে বৃত্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।

আমি বলি, একটু অপেক্ষা কর, একটু চুপ কর, একটু।

আমার সেই বৃদ্ধ জ্ঞানী বন্ধু আমাকে বসতে বলল এবং জিজ্ঞাসা করল তোমার ম্যাজিক বাক্সয় কি কোনো খবর এসেছে ?

আমি দারুণ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি, কি পরিণতি হবে জানি না। আমার উদ্দেশ্য শুধু সময় নেওয়া কারণ আমি জানি বৃষ্টি দু তিন দিনের মধ্যে আসবে না। কিন্তু জিপুসো যদি না আসতে পারে ? তাহলে যে কি সর্বনাশ হবে তা এখন আমার ভাববার সময় নেই। তবুও চেষ্টা তো করতেই হবে। তাই

আমি আর একটা চাল চাললুম।
কিছু যেন একটা করতে যাচ্ছি এই রকম ভাব দেখিয়ে আমি ক্যামেরার লেনস নজুয়োর দিকে তাক করে এগিয়ে গিয়ে লেনস যখন প্রায় তার বুকে ঠেকেছে তখন তাকে তাড়াতাড়ি অথচ খুব আস্তে বললুম, প্রাণভরে চিৎকার করে ওঠ।
নজুয়ো বোধহয় ভেবেছিল ওর মৃত্যুযন্ত্রণার অবসান করতে আমি বুঝি যন্ত্রটা দিয়ে এখনি মেরে ফেলব নইলে এমন মর্মভেদী কাতর চিৎকার কেউ করতে পারে না।
আমি তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে গর্বের সঙ্গে বললুম, দেখলে কি কাণ্ডটা হলো? আমার ম্যাজিক বক্সের মাত্র একটা চোখ দেখেই নজুয়ো এত ভয় পেয়েছে যা তোমাদের একশটা বর্শা করতে পারে নি।
এইভাবে ধোঁকা দেওয়ায় কিছু ফল হলো। ওদের মনে সন্দেহ জাগল। আমি ওদের মনোভাব ধরে রাখবার জন্যে জুলু সর্দারদের মতো বক্তৃতা আরম্ভ করলুম এবং ওরা তা শুনতেও লাগল। যা বলছি তার মাথা মুণ্ডু নেই, কিন্তু সরল, অশিক্ষিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন বনবাসীদের ধোঁকা দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।
দেখলুম সুকুমবানা তয়াবেনির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বক্তৃতা থামিয়ে আমিও তাদের কাছে গিয়ে বললুম, বল তোমরা কি বলবে? কিছু নিশ্চয় বলার আছে।
ওরা তখন রাগে ফুঁসছে, আমার কথার কোনো জবাব দিলো না বা জবাব দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না।
ওরা দুজনে কিছু না বললেও অন্যান্য অনেকে এক সঙ্গে আমাকে অনেক প্রশ্ন করতে লাগল। আমি তাদের থামাবার চেষ্টা করলুম না। আমি চাই শুধু সময়।
সঙ্গে অনেক সিগারেট এনেছিলুম। আমি এখন বিলি করতে লাগলুম। উত্তর জুলুল্যাণ্ডে এই জিনিসটি বিরল। সকলেই একটি সিগারেট পেতে আগ্রহী। সিগারেট দেবার সময় লক্ষ্য করলুম ওরা আমার মিত্র। নজুয়োর ব্যাপারটা ওরা সাময়িক ভাবে ভুলে গেল। ওরা মন দিয়ে সিগারেট টানতে লাগল। যতক্ষণ পারে ওরা সিগারেট টানুক, আমি কিছু সময় তো পাব। যারা নজুয়োর দেহে বর্শা মারবে তারা দেখলুম নির্বিকার, তারা তাদের শিকারের কথা বেমালুম ভুলে গেছে যেন।
এক সময়ে ধূমপান শেষ হলো। ধীরে ধীরে গুঞ্জনও থামল। তয়াবেনি আমার কথা বিশ্বাস করে নি। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় তোমার বৃষ্টি?
তয়াবেনি এমন প্রশ্ন করলে আমি কি উত্তর দেবো তা আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলুম। তার সামনে আমার ব্যারোমিটার ধরে বললুম, এই যে এদিকে

ভাল করে দেখ, ছোট্ট খুদে বর্শাটা কেমন নাচছে, নাচতে নাচতে বৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বুঝলুম আমার ধাপ্পা ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আমাকে সময় নিতে হবে তাই বেপরোয়া হয়ে আর একটা চাল চাললুম। যেখানে আমি দাঁড়িয়েছিলুম সেখান থেকে বেশ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ব্যারোমিটার দেখে যেন হিসেব করছি এমন ভাব দেখিয়ে আমি আমার বুট দিয়ে মাটিতে একটা চিহ্ন করে বললুম গাছের ডগের ছায়া যখন এই দাগ ছোঁবে তখন দেখো বৃষ্টি নামবে। কেউ কেউ এগিয়ে এসে আমার ব্যারোমিটারের কাঁটা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতে লাগল। কারও চোখ বিস্ময়ে বড় হলো, কি হবে রে বাবা! ঐ খুদে বর্শা কি সত্যিই বাদল নামাবে?

ভাগ্যিস এই জুলুরা সভ্য জগতের সংস্পর্শে আসে নি নইলে এতক্ষণে কি কাণ্ড ঘটত ভাবতেও আমার গা শিউরে উঠছে। বুটের দাগে ছায়া পৌঁছিতে তখনও অনেকটা সময় লাগবে। তার মধ্যে মাবুলি আর জিপুসো কি ফিরে আসবে না?

জুলুদের হয়তো কিছুক্ষণ বিশ্রামের দরকার ছিল। আমার কথা মেনে নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব আরম্ভ করল। তয়াবেনি এবং সুকুমবানা আমার কোনো কথা বিশ্বাস করে নি বলব না, বিশ্বাস করার ইচ্ছাই নেই। যেভাবে হোক তারা নজুয়োকে হত্যা করতে চায়, দু ঘণ্টা আগে আর পরে; ওরা দুজন না থাকলে আমি একটা সন্তোষজনক মীমাংসা করে দিতে পারতুম। কিন্তু এই দুই শয়তান সব গোলমাল করে দিচ্ছে। তবে আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

সেই তিন জ্ঞানী বৃদ্ধ নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করছিল। একজন তো আমার সমর্থক ছিলই, দ্বিতীয় জন তয়াবেনির পক্ষে, কিন্তু তৃতীয় জন নিরপেক্ষ। তাকে যদি আমার দলে টানতে পারি!

নিরপেক্ষ হলেও সে আমাকে বলল, এ তল্লাটে তয়াবেনির তুল্য গুণিন নেই, সে রাতকে দিন করতে পারে।

আমি বলি, তোমার কথা বুঝলুম, কিন্তু দেখ আমার এই ছোট্ট ম্যাজিক বক্স অতবড় তয়াবেনিকে খুদে করে দিতে পারে। এস, এক চোখ বুজে দেখ। সে দেখল তয়াবেনি তার নখের সমান ছোট হয়ে গেছে কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না। সে আমার দলে এল না। তবে সেই দৃশ্য দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে এলোমেলো বকতে লাগল।

তার দেখাদেখি আরও অনেকে আমার ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে ব্যাপারটা দেখতে চাইল। দেখালুম। এইভাবে যতক্ষণ ওদের ঠেকিয়ে রাখা যায় ততই আমার লাভ। তা এই দেখাদেখিতে আধ ঘণ্টা সময় কাটানো গেল।

ওদিকে গাছের ছায়া তো থেমে নেই, সে এগিয়ে আসছে। আমি হিসেব করে দেখলুম আমি যেখানে বুটের দাগ দিয়েছিলুম সেখানে ছায়া পেঁছিতে অন্ততঃ এক ঘণ্টা লাগবে। তার মধ্যে জিপুসো কি এসে পড়বে না ?

আমি জুলুদের গাছের ছায়া মনে করিয়ে দিলুম। বললুম গাছের ডগের ছায়া আমার বুটের দাগ পেঁছিনো পর্যন্ত তোমরা অপেক্ষা কর। তার মধ্যে বৃষ্টি না এলে তোমরা নজুয়োকে নিয়ে যা ইচ্ছে কোরো।

ভাগ্য ভালো যে অধিকাংশ জুলু রাজি হলো। বুঝলুম এতদিন ধরে ওদের চিকিৎসা করা ও উপহার দেওয়া বৃথা হয় নি। জুলুদের মধ্যে আমাদের অনেক বন্ধু হয়েছে।

তয়াবেনি ভোলবার মানুষ নয়। সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, নজুয়োর পরে সাদা চামড়ার লোকটা।

আমি জানি সে আমাকে একা নয়, আমাদের তিনজনকেই হত্যা করতে অন্ততঃ চেষ্টা করবে। আমাদেরও তো সমর্থক আছে, তারা কি বাধা দেবে না ? এবং তারা সংখ্যায় ভারি।

বাকি একটা ঘণ্টার ওপর অনেকের জীবন মরণ নির্ভর করছে। সময়টা যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত আমি কি হেরে যাব ?

তয়াবেনি আর সুকুমবানা বিরক্ত হয়ে কুটিরে ফিরে গেল। সেখানে বসে তারা কুমতলব আঁটবে। নজুয়ো আমার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। আমি অনর্গল বকে চলেছি। কি বলছি তাও জানি না ওরা কি বুঝছে তাও জানি না তবে ওদের আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারছি। সময় যত এগিয়ে আসছে আমার রক্তচাপও তত বাড়ছে। যদি সফল না হই তাহলে শুধু যে নজুয়ো এবং আমাদের তিনজনের প্রাণ যাবে তা নয়, ওদের মধ্যে এখন দুটো দল হয়েছে, একদল জিপুসোর সমর্থক আর একদল তয়াবেনির। এই দুই দলে নিশ্চয় মারামারি কাটাকাটি হবে, তখন যে কত প্রাণ অকালে নষ্ট হবে কে জানে।

তয়াবেনি পাত্র ভর্তি করে সুরা পাঠিয়ে চলেছে। মেয়েরা পুরুষদের সেই সুরা পরিবেশন করছে। পাত্রের পর পাত্র। জুলু যোদ্ধাদের সুরায় অরুচি নেই, তারা পাত্রের পর পাত্র খালি করছে। মাতাল হতে দেরি নেই, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না।

সুকুমবানা আর তয়াবেনি বোধহয় দূর থেকে অথবা লোক মারফত গাছের ছায়ার দিকে নজর রেখেছিল তাই ছায়া যেই চিহ্নিত স্থান স্পর্শ করেছে অমনি দুই মাতব্বর ঘটনাস্থলে হাজির। তারপর তারা একবার ছায়ার দিকে একবার আকাশের দিকে এবং পরে আমার দিকে যেভাবে চাইল তাতে বুঝলুম আমার কিছু করার নেই। আমি হেরে যেতে বসেছি।

ওরা আপাততঃ আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মরণ-নৃত্য শুরু করতে বলল।

নজুয়োর মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ওরা বোধহয় আমার মোকাবিলা করবে না। এবার ওরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নাচে ও বর্শা আন্দোলনে এবার তেজ আছে। নাচিয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে নজুয়োর দেহের বিভিন্ন অংশে বর্শার ছুঁচলো ডগা দিয়ে খোঁচা মারতে লাগল, কখনও বুকে, কখনও উরুতে আবার কখনও পেটে। যত সময় যায় আঘাতও তত গভীর হতে থাকে, রক্তস্রোতও বাড়তে থাকে।

আমার তখন ঘাম দিচ্ছে। শার্ট ভিজে গেছে। চোখ মুখ মুছতে মুছতে রুমালও ভিজে গেছে। রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে সিংহ মেরেছি, গণ্ডার মেরেছি, হাতিও মেরেছি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ট্রিগার টিপেছি কিন্তু এখন আমি দিশেহারা, কি করব, বুঝতে পারছি না।

আমি আশা করছিলুম, মাবুলি জিপুসোর সামনে হাজির হতে পারুক আর না পারুক, ডুগডুগির আওয়াজ শুনতে না পেলে জিপুসো বিপদ আশঙ্কা করে নিশ্চয় একদল সশস্ত্র বাহিনী পাঠাবে এবং সে বাহিনী অনেক আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু কোথায় কি? আমার মনে একে একে যদির প্রশ্ন উঠতে লাগল, আশা শুধু আশা।

ওদিকে নাচের গতি যেমন বাড়ছে, আঘাতের গভীরতাও তত বাড়ছে, রক্তস্রোতও বাড়ছে। নজুয়ো আর কতক্ষণ যুঝবে?

এতক্ষণ নজুয়োর বুকে কেউ আঘাত করে নি, এবার সে আঘাতও এল। হৃৎপিণ্ডের ঠিক ওপরে একজন খোঁচা মারল। এবার হয়ত ঐ জায়গাতেই পর পর আঘাত পড়বে, ক্ষত গভীর হতে থাকবে। তারপর? ছেলেটার হৃৎপিণ্ড চিরতরে স্তব্ধ হবে। তারপরও হয়তো আরও বর্শার আঘাত পড়বে, দেহ ছিন্ন-ভিন্ন হবে। রক্তাক্ত সেইসব বর্শা তারপর আমাকে ঘিরে ধরবে। নজুয়োর মতো সাহস আমার নেই।

জুলু যোদ্ধাদের উল্লাস ছাপিয়ে সরু রিনরিনে একটা কণ্ঠস্বর আমার কানে পৌঁছল, নজুয়ো, নজুয়ো। কে ডাকে? মেয়েলি কণ্ঠে নজুয়োকে কে ডাকে? আমার কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। এ তো মাবুলির গলা, নজুয়ো, নজুয়ো।

তারপর আমার দু চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত। মাবুলি হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ভেঙে ছুটে আসছে। আমি যেখানে আমার রাইফেল রেখে এসেছিলুম সেই অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় এক ঝাঁক বর্শাফলক রোদের কিরণে ঝকমক করে উঠল। তারপর জুলু যোদ্ধাদের ঘর্মসিক্ত কালো দেহ।

আমার রক্তচাপ নেমে এল। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে এল।

মাবুলি এসে আমার পায়ের কাছে পড়ল। আমি তাকে দু হাতে তুলে ধরে বললুম, নজুয়ো এখনও বেঁচে আছে।

হাঁফাতে হাঁফাতে সে যে উত্তর দিলো তা শুনে আমি অবাক। মাবুলি বলল,

তুমিও তো বেঁচে আছ।
আঃ আমরা বেঁচে গেলুম সেই সঙ্গে একটা রক্তবন্যা এড়ান গেল।
জিপুসোর রক্ষীবাহিনী দেখে তয়াবেনির যোদ্ধাবাহিনী ভীত হয়ে ইতস্ততঃ পালাতে লাগল। জিপুসোর বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছবার আগেই চারদিক ফর্সা। বড় সর্দার তার বাহিনী নিয়ে গাছের কাছে আসবার আগেই মাবুলি উঠে জীবন্মৃত নজুয়াকে জড়িয়ে ধরল। মাবুলি জিতে গেল।
দু দিন পরে বৃষ্টি নামল।
এরপর একদিন বিচারসভা বসল। জিপুসো স্বয়ং বিচারক। যেসব যোদ্ধারা অংশগ্রহণ করেছিল তাদের জরিমানা হলো। প্রত্যেককে দিতে হবে দুটি করে সেরা গাই, তিনটি করে বাছুর ও চারটি করে সেরা ছাগল ও একটি করে বর্শা বাজেয়াপ্ত করা হলো।
প্রাপ্ত গাইবাছুর ও ছাগল থেকে তিন চতুর্থাংশ ভাগ দেওয়া হলো নজুয়োকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে। আদালতের ব্যয় হিসেবে বাকি অংশ জিপুসোর প্রাপ্য। বিচারের জন্যে তয়াবেনিকে সদরে পাঠান হলো। বলা বাহুল্য মাবুলির সঙ্গে নজুয়োর বিয়ে জিপুসোই দিলো সঙ্গে প্রচুর যৌতুক ও উপহার। জিপুসো জামানিরও বিয়ে দিলেন তবে একটি নয় দুটি মেয়ের সঙ্গে। জামানিকে সে তার প্রধান মুনশী নিযুক্ত করে তয়াবেনির সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দিলো।
জিপুসোকে বললুম এনইয়াতি পাহাড়ের উত্তরে জুলুল্যাণ্ডের জন্যে আমরা বেশ কিছু কাজ করেছি। জুলুদের উচিত আমাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। জুলুরা মৌখিকভাবে কৃতজ্ঞতা তো জানালই সেই সঙ্গে আমাদের রাশিকৃত উপহার দিলো যা তাদের নিজের হাতে তৈরি এবং এর কোনো একটিও তারা আগে আমাদের কাছে বিক্রি করতে চায় নি।
এবার আমরা ক্যাম্প গুটিয়ে ফিরব। জিপুসো তার লোকেদের আদেশ দিল আমাদের সমস্ত মালপত্র, যেখানে আমাদের ট্রাক আছে সে পর্যন্ত বিনা পারিশ্রমিকে পৌঁছে দিতে। আমরা অবশ্য ওদের আপত্তি সত্ত্বেও শুধু হাতে ফিরিয়ে দিই নি।
ফেরবার পথে আমরা বৃষ্টিতে ভিজে ঢোল হয়ে গিয়েছিলুম।

গোরিলা রাজ্যে

শেষ পর্যন্ত আমরা সভ্যজগতে ফিরে এলুম। প্রফেসর আপাততঃ ফ্রান্সে ফিরে যাবেন। বিল মোজাম্বিকের কোনো বন্দর থেকে জাহাজে উঠে দেশে ফিরবে। বিল জাহাজে উঠেছিল এবং এক যুবতীর সঙ্গে তার আলাপ হয়। যুবতীকে সে বিবাহ করেছিল। বিল পরে আফ্রিকায় ফিরে এসেছিল কারণ হাতি শিকারের বাসনা সে ত্যাগ করতে পারে নি। তার কাহিনী পরে বলব। আমার মতলব ছিল আফ্রিকার জায়াণ্ট গোরিলাদের বিষয় খোঁজ খবর নেওয়া এবং ছবি তোলা। জায়াণ্ট গোরিলা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নেই। তারা থাকে গভীর অরণ্যে যেখানে সভ্য মানুষ তো দূরের কথা আফ্রিকার আদিবাসীরাই প্রবেশ করতে ভয় পায়।

বন্য মহিষের আক্রমণে গোড়ালিতে ভীষণ চোট পেয়ে আমার ক্যাম্পে প্রায় তিন সপ্তাহ আমাকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল। আরোগ্য লাভ করে এবং ডাক্তারের অনুমতি পেয়ে আমি একদিন মধ্য আফ্রিকার সর্বোচ্চ হ্রদ কিভুর তীরে বুকাভু শহরে উপস্থিত হলুম।

সামনেই গভীর জঙ্গল ঘেরা পাহাড়শ্রেণী। হাজার মাইল ব্যাপী এই জঙ্গল এত গভীর যে দিনের আলো সেখানে প্রবেশ করে না। এই জঙ্গল দুর্ভেদ্য। কোনো সভ্য মানুষ এই জঙ্গলে প্রবেশ করেছে কিনা জানি না। কোনো মানুষ এই জঙ্গলে বাস করে না। এই জঙ্গলেই বাস করে ঝাঁকে ঝাঁকে গোরিলা। এত বেশি গোরিলা আর কোনো অরণ্যে দেখা যায় না।

আফ্রিকার বামন আদিবাসী নির্ভীক পিগমিরাও এই জঙ্গলে রীতিমতো তৈরি হয়ে প্রবেশ করে এবং সন্ধ্যার অনেক আগেই ফিরে আসে।

এই জঙ্গলে যেমন বিরাট আকারের মহীরুহ আছে তেমনি ছোট গাছে ও লতায় নিচের জমি পরিপূর্ণ। গাছ না কেটে অনেক অঞ্চলে প্রবেশ করা যায় না। ক্বচিৎ ফাঁকা জায়গা দেখা যায়।

পিগমিরা বলে জায়াণ্ট গোরিলাদের সর্দার প্রতিদিন সূর্য ওঠার আগে অরণ্য কাঁপিয়ে হুংকার দিয়ে রাত্রির সমাপ্তি শেষ করে এবং সূর্যকে ওঠার অনুমতি দেয়। সেই বজ্রসম হুংকার শুনলে মানুষের সারা শরীর হিম হয়ে যায়, মানুষ ভীত হয়ে কাঁপতে থাকে। পিগমিরা সেই গোরিলা সর্দারকে বলে 'আনগাগি'। আনগাগি হুংকার না দিলে সূর্য উঠতেই পারবে না, এমনই তার ক্ষমতা।

এই কিভু অরণ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আমি একদল পিগমি গাইড মনোনীত করেছি। তারা আমাকে দু বার জানিয়েছে যে তারা আমার জন্যে অপেক্ষা

করছে।
কিভুর এই গভীর অরণ্যে প্রবেশ করার জন্যে বেলজিয়াম সরকারের বিশেষ অনুমতি লাগে। এই দেশ তখন বেলজিয়ম সরকারের অধীন ছিল। অনুমতি সহজে মেলে নি। বেলজিয়ম সরকার আমার সাতটি অভিযানের তথ্যাদি খুঁটিয়ে বিচার করেছিল। শেষ পর্যন্ত বেলজিয়ম সরকারের উপনিবেশের ভারপ্রাপ্ত এক অনিচ্ছুক মন্ত্রীর কাছ থেকে এই পারমিট আদায় করতে হয়েছিল। তিন মাসের জন্যে আমাকে এই পারমিট দেওয়া হয়েছিল। পারমিটের অনেক শর্ত ছিল যার মধ্যে অন্যতম ছিল আমি কোনো গোরিলা মারতে পারব না এবং আমার যদি মৃত্যু হয় সেজন্যে বেলজিয়ম সরকার কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না।
নানারকম সাজ-সরঞ্জাম লাগবে। সেগুলি বাক্সয় ভরে উত্তমরূপে প্যাক করা হয়েছে। প্রথমে মালবাহী পোর্টার পাই নি পরে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের সহযোগিতায় পোর্টার পাওয়া গিয়েছিল। পোর্টাররা ঐ গোরিলা ফরেস্টের কাছে যেতেই ভয় পায়।
যাত্রার পূর্বে ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের সঙ্গে দেখা করা উচিত। এই সাক্ষাৎকার শুধু সৌজন্যমূলক নয়, নিয়ম। এই নিয়ম ভাঙা কখনই উচিত নয় কারণ পরে আমি অসুবিধায় পড়তে পারি।
ডি সি বিস্ময় প্রকাশ করে আমাকে স্পষ্টই বললেন, তুমি এই পারমিট কি করে পেলে? বিরল বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বেলজিয়ম সরকার নতুন আইন ধার্য করেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই পারমিট দেওয়া যায় না তাই আমি এই পারমিটের সমর্থনের জন্যে ব্রুসেলসে টেলিগ্রাম করেছিলুম।
আমি বললুম, শুধু এই পারমিট নয়, জোহানেসবার্গের উইটওয়াটার স্র্যাণ্ড ইউনিভারসিটি আমাকে অনুরোধ করেছে তাদের জন্যে একটি জায়াণ্ট গোরিলা ধরে আনতে। জানি না সে কাজ সম্ভব হবে কি না।
ডি সি আবার অবাক হলেন এবং এজন্যে ঐ ইউনিভারসিটির কর্তাদের টেলিগ্রাম করবেন কি না সে কথা বললেন না তবে আমাকে বললেন, গোরিলাদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানি না, তাদের গোষ্ঠী চরিত্র বা ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অনেক কিছু জানতে বাকি। এখনও পর্যন্ত গোরিলাদের ভালো ফটোগ্রাফও আমরা তুলতে পারি নি। আশা করি তুমি সফল হবে তবে বাপু মনে রেখ, গোরিলা বধ করতে পারবে না তাহলে সাজা পেতে হবে আর সে সাজা হালকা নয়।
আমি তখন ডি সি-কে প্রশ্ন করি সাজাটা কি রকম? জেল না জরিমানা?
ডি সি বললেন, জেল জরিমানার ব্যবস্থা তো আছেই এমন কি এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে, কঙ্গোতে তাকে হয়ত আর ফিরে আসতে দেওয়াই

হবে না আর জরিমানা যদি করা হয় তাহলে কম পক্ষে কুড়ি হাজার ফ্রাংক।
শাস্তির বহর শুনে আমি অবাক কারণ আমি জানি কিছুদিন আগে আমার পরিচিত একজন বেলজিয়ম একজন আফ্রিকানকে গুলি করে মেরে ফেলেছিল। সম্ভবতঃ অনিচ্ছাকৃত ভাবে বা দুর্ঘটনাক্রমে কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার ফ্রাংক জরিমানা দিয়ে সেই বেলজিয়ম রেহাই পেয়েছিল।
ডি সি-এর কাছে আরও শুনলুম যে আমার পারমিটের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর যদি আমি গোরিলা কর্তৃক আক্রান্ত হই এবং সেটাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হই তাহলে আর আমার নিস্তার নেই। যদি না নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারি যে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি গোরিলাটাকে মারতে বাধ্য হয়েছিলুম তাহলেও আমাকে জরিমানা তো দিতেই হবে উপরন্তু কয়েক মাসের জেল। জরিমানা দিতে না পারলে আরও কয়েক মাস জেল।
শাস্তির পরিমাণ আমার বাড়াবাড়ি মনে হলো কিন্তু ডি সি বললেন বাধ্য হয়েই আমাদের এমন কড়া আইন করতে হয়েছে, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে নির্বিচারে পশু হত্যা করতে দেওয়া যায় না। বিদেশী প্ল্যান্টার, শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী, শিকারী, এরা বেপরোয়া। দরকার থাক বা না থাক হাতে একটা বন্দুক থাকলে আর রক্ষা নেই, জন্তু দেখলেই গুলি চালাবে। একবার তো দুজন মহিলা জঙ্গলে ঢুকে যে মুহূর্তে গোরিলা দেখতে পেয়েছে অমনি গুলি চালাতে আরম্ভ করেছে। হয়তো তারা জঙ্গল এবং গোরিলা চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অথবা স্রেফ শুধু গোরিলা মেরে বাহবা আদায় করতে চায়। তারা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে কয়েকটা গোরিলা মেরে ফেলে, কয়েকটাকে রীতিমতো জখম করে। মৃত ও আহত গোরিলার মধ্যে দু একটার পেটে বাচ্চাও ছিল। তারা অবশ্য প্রতিবাদ করেছিল। বলেছিল প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গোরিলা না মেরে উপায় ছিল না অথচ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তা নয়। এ সবের জন্যেই আইন কড়া করতে হয়েছে।
ডি সি-কে আমি আশ্বস্ত করলুম, আমাকে নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা ভোগ করতে হবে না। আমি গোরিলা হত্যা করতে কঙ্গোতে আসি নি, গোরিলা আমি মারব না। আবার উদ্দেশ্য ভিন্ন। তবে দরকার হলে দু একটা জীবন্ত গোরিলা ধরতে পারি। তারপর হাসতে হাসতে বললুম, আপনাদের আইন তো গোরিলা হত্যার বিরুদ্ধে, ধরার বিরুদ্ধে নয়!
ডি সি-কে আমি সন্তুষ্ট রাখতে চাই কারণ পোর্টার সংগ্রহে ও অন্যান্য কাজে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন এবং আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে তাঁর সমর্থন আছে। আমার কথায় তো কোনো পোর্টার কিভুর জঙ্গলের কাছে যেতেই রাজি হচ্ছিল না, ডি সি সাহায্য না করলে আমি বিপাকে পড়তুম। আমি কিভুর জঙ্গলের ভেতরে ঢুকব শুনে পোর্টাররা তো প্রথমে

আমাকে পাগল ভেবেছিল এবং আমি যখন জোর করে বললুম যে তোমরা যাও আর না যাও আমি একাই ঐ জংগলে ঢুকব তখন ওরা ভয় পেয়েছিল। যার সাহায্যে আমার অভিযান সফল হতে চলেছে তাকে আমি চটাতে পারি না।

কিন্তুর গোরিলা ফরেস্টে পৌঁছে দিতে আমাদের জন্যে বাঁধানো রাস্তা নেই, থাকলে তো আমরা ট্রাকে চেপেই যেতে পারতুম। যে পথ ছিল, মাল নিয়ে সে পথ দিয়ে দ্রুত চলা যায় না তাই ধীর গতিতে আমাদের সারাদিন হাঁটতে হলো এবং গোরিলা ফরেস্টের প্রান্তে একটা মালভূমিতে পৌঁছলুম। এর পরই ঘন জংগলে ভর্তি পাহাড় প্রায় খাড়া উঠে গেছে। জংগল যে এমন ঘন ও ভয়ংকর হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দূর থেকে দেখে মনে হয় যেন একটা কালো মেঘ পাহাড়টাকে চেপে ধরেছে।
আমার পিগমি গাইডরা আগেই এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। পোর্টাররা তাদের দেখে হাসতে লাগল। এরা আগে পিগমি দেখে নি। উচ্চতায় কেউ চার ফুটের বেশি নয় কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মানুষ। কারও কারও দাড়ি গোঁফ আছে। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। মুখের ভঙ্গি অনেকটা বাঁদরের মতো। লজ্জা কি ওরা জানে না তবুও কোমরে কিছু আটকানো আছে। সরু পা দেখে মনে হবে পায়ে বুঝি জোর নেই, পিলে রোগীর মতো পেট ফুলো। বাঁদরের মতো মুখভঙ্গি হলে কি হয় একটা গাম্ভীর্য বিদ্যমান। এরা হলো মামবুটি পিগমি। মোটেই সুদর্শন নয় কিন্তু গভীর অরণ্যে যেখানে দিনের আলো প্রবেশ করে না সেখানে এরা অপরিহার্য।
ওদের নেতা একজন ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধ। মাথার সব চুল পেকেছে কি না দেখা যাচ্ছে না কারণ বেবুনের চামড়া দিয়ে মাথার অনেকটা ঢাকা, চামড়াটা টুপিও নয়, পাগড়িও নয়, একটা মস্তক বন্ধনী বিশেষ। নাক চ্যাপ্টা, নাকের গর্ত দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে, চোখদুটো চকচক করছে। আমার পোর্টারদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।
বৃদ্ধ পিগমি আমার দিকে এগিয়ে এসে খনখনে গলায় 'ইয়ামবো, বওনা' বলে আমাকে সম্বোধন করল, অর্থাৎ 'নমস্কার, সাহেব'। তারপর তার ছোট বর্শা মাটিতে গেড়ে সেটা ধরে ঝুঁকে আমাকে কৌতূহলের সংগে লক্ষ্য করতে লাগল। অরণ্যচারী হলেও এরা আগে শ্বেতাঙ্গ দেখেছে তবুও নতুন মানুষের প্রতি আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।

আমি লোকটির নাম জানতুম। ও হলো পিগমিদের সর্দার, নাম সুলতানি কাশচিউলা। বেশ কিছুদিন হলো আমার জন্যে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। সর্দারের দেখাদেখি বাকি পিগমিরাও আমাকে 'ইয়ামবো, বওনা' বলে সম্বোধন জানিয়ে নিজ নিজ বর্শার ওপর ঝুঁকে আমাকে লক্ষ্য করতে লাগল। সাহেবটা

কেমন এই বোধহয় তাদের জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরতে পারবে তো? গোরিলা দেখলে ভয়ে পালাবে না তো?

পিগমিদের দেখে আমারও নানা কৌতূহল হলো। প্রথম নজরে মনে হলো এরা ধূর্ত। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। পিগমিরা আমার অনুমতি না নিয়েই কাজে লেগে পড়ল। তারা আমার তাঁবু খাটাতে লাগল। বুঝলুম এরা এসব কাজে অভ্যস্ত। শিকার অভিযান, যাকে বলে সাফারি তার সঙ্গে এরা পরিচিত। নিশ্চয় পূর্বে অন্য সাফারিতে যোগ দিয়েছিল।

তাঁবু খাটানো শেষ হতেই যেসব পোর্টার আমার সঙ্গে এসেছিল তারা সারবন্দী দাঁড়িয়ে পড়ল। অর্থাৎ সাহেব আমাদের মজুরী মিটিয়ে দাও। আমরা এই শয়তানের জঙ্গলে আর এক মিনিটও থাকতে চাই না। মজুরী তো মাথা পিছু মাত্র দুই ফ্রাঙ্ক করে তাই হাতে পেতে না পেতে তারা ছুটে পালাল। টমব্যাকো বকশিস দিতুম, সেজন্যে তারা অপেক্ষা করল না। সারাদিন পরিশ্রমের যৎসামান্য মজুরী পেয়েই তারা সন্তুষ্ট। ওরা এতই দীন যে বেশি কিছু আশা করতে ওরা ভুলেই গেছে। কিংবা ভয়ে সাহেবদের কাছে কিছু দাবি করতে ভয় পায়। সাহেব যদি মেরে ফেলে!

ইতিমধ্যে পিগমিরা নিজেদের জন্যে ডালপালা আর পাতা, শ্যাওলা দিয়ে নিজেদের জন্যে একটা কুটির বানিয়ে নিয়েছে। আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসেছে। আমার কুক ওদের জন্যে প্রচুর সিম বিচি সেদ্ধ করে নুন ও মসলা মিশিয়ে ওদের খেতে দিয়েছে। কুক ওদের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে হাসছিল। এই হাসি পিগমিদের পছন্দ নয়, ওরা মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল কিন্তু প্রচুর সুখাদ্য পেয়ে ওরা বোধহয় কুককে ক্ষমা করল।

ওরা বোধহয় অনেক দিন পরে সভ্যজগতের কিছু খাবার পেল। তাই খাবার পরিবেশিত হওয়া মাত্র চেটেপুটে সব সাফ করে ফেলল। খাওয়া শেষ হতে আর দেরি করল না। ভালো করে আগুন জ্বালিয়ে শুয়ে পড়ল। আগুন যেমন জীবজন্তুকে দূরে রাখে তেমনি মশাকেও। এই বনে প্রচুর মশা। প্রচুর মশার বংশ আগুনে ধ্বংস হয়।

পরদিন পুব আকাশ ফর্সা হতে না হতেই আমি বহুদিনের আকাঙ্খিত সেই ডাক শুনলুম যে ডাক শোনবার জন্যে আমি দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করে আসছি। অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যে সে ডাক সত্যিই আমার মতো পোড়খাওয়া শিকারীরও বুক কাঁপিয়ে দিতে পারে। এ ডাক যে শোনে নি সে নিশ্চয় মূর্ছা যাবে। আমি পাগলা হাতির ডাক শুনেছি, যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছি। সে শব্দে অনেকের কান ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে কিন্তু সেই গোরিলা সর্দারের হাড়-কাঁপানো ডাকের চরিত্র স্বতন্ত্র।

ডাক শুনেই আমি আমার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলুম। পিগমিরা উঠে পড়েছে, তারা আগুনের ধারে জড়ো হয়েছে।
উত্তেজিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, ন্‌গাগি?
গম্ভীর কণ্ঠে কাশচিউলা উত্তর দিলো। নাডিও, ন্‌গাগি হ্যাঁ, গোরিলা। বাকি সকলে ঘাড় নেড়ে জানাল, এতে আর সন্দেহ কি? তারা কিভু লেকের পূব দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দূরে নিচে লেকের স্বচ্ছ জলে উদিত সূর্য প্রতিফলিত। লেকের জল লাল বর্ণ ধারণ করেছে। সে এক অপূর্ব শোভা।
কিছুক্ষণ পরেই আমি অরণ্যে প্রবেশ করবার জন্যে প্রস্তুত। পিগমিরা বোধহয় সর্বদাই প্রস্তুত থাকে। ইসারা করলেই হলো।
সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আমার মনে থাকবে। বড় বড় গাছের দেওয়াল। তারই ফাঁকে ফাঁকে কত রকম সরু মোটা লতা, ঝোপঝাড়। পচা পাতা ও শ্যাওলার স্তূপে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যায়। দশ পা চলতে কয়েক মণ মাল তোলবার সমান পরিশ্রম করতে হয়। সাদা মানুষদের পক্ষে এইভাবে চলা রীতিমতো দুঃসাধ্য। এ ছাড়া কোথায় কি বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে। জীবজন্তুর অস্তিত্ব না হয় টের পাওয়া যেতে পারে কিন্তু বিষাক্ত সাপ? কখন কোন ঝোপ থেকে ফণা তুলে ছোবল মারবে বা গাছের ডাল থেকে লাফ মারবে কে জানে? তবে এই বিপদসংকুল অরণ্যে রঙিন প্রজাপতির দল মন ভুলিয়ে দেয়! সে যেন উড়ন্ত ফুলের শোভা। নাম-না-জানা নানারকম ফুলও দেখা যায়। ক্লান্ত চোখকে তৃপ্তি দেয়।
সবচেয়ে বিরক্তিকর হলো কাঁটাওয়ালা লতাগুলো বা কাঁটার ঝোপ। দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে ছাড়ে। কাঁটার ক্ষতের জ্বালা অসহ্য। অরণ্য এতই গভীর যে ভেতরে বাতাস প্রবেশ করে না। তারপর পাহাড়ের উচ্চতা ক্রমশঃ বাড়ছে। অল্প পরিশ্রমেই হাঁফ ধরে, বুক ঢিব ঢিব করে। বৃষ্টির ফোঁটার মতো গাছের পাতা থেকে শিশিরবিন্দু পড়ে কাঁটায় ছেঁড়া আমার জামা ভিজিয়ে দিচ্ছে। নানাভাবে এই অরণ্য আমার সঙ্গে শত্রুতা করছে। কানে যেন ঝিঁঝিঁ ডাকছে, মাথাও বুঝি ঠিক কাজ করছে না। দেহ রীতিমতো ঘর্মাক্ত।
শক্ত করে রাইফেল ধরে, দাঁত চেপে মনের জোরে সব বাধা অতিক্রম করবার চেষ্টা করছি।
কাশচিউলা আর তার বারোজন পিগমি যেন খোলা মাঠ দিয়ে হেঁটে চলেছে। আমি অবাক। খালি পায়ে, খালি গায়ে কাঁটাওয়ালা লতা গাছ তুচ্ছ করে ওরা কেমন চলেছে, গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত পড়ছে না। প্রতি পদক্ষেপের জন্যে আমাকে যেখানে লড়াই করতে হচ্ছে সেখানে ওরা কেমন দিব্যি হেঁটে চলেছে। কোথায় কোন গাছের ফাঁক দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যেতে হবে, কোন ঝোপ

এড়াতে হবে, কোথায় সাপ থাকতে পারে এসব যেন ওদের মুখস্থ। আমার দুর্দশা দেখে ওরা হয়ত মনে মনে হাসছে যদিও তাদের মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাথায় খাটো, ওজনে হালকা, বর্ণে বুড়ো গাছের গুঁড়ির মতো, ছায়ার মতো নিঃশব্দে চলেছে। এই কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, আবার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। পিগমি সর্দার আমাকে সর্বদা সাহায্য করছে।

হঠাৎ বন কাঁপিয়ে কোথা থেকে মর্মভেদী এক চিৎকার আমাকে চকিত করল। আমি চমকে উঠলুম। সে চিৎকার যে কি রকম তা আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। সেই মর্মভেদী ধ্বনি ক্ষিপ্ত সিংহের ডাকের মতো, আহত মানুষের যন্ত্রণা-কাতর ক্রন্দন অথবা মার খাওয়া কুকুরের মতো অথবা উভয় ধ্বনির মিশ্রণ তা আমি বলতে পারব না। এমন ডাক আমি শুনি নি। সেই ডাক নিস্তব্ধ অরণ্যকে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। আমি যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়লুম। স্তব্ধ হয়ে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। কারণ সেই ডাকে আরও অনুরূপ ডাক সমস্ত বনভূমি বিদীর্ণ করল। বিনামেঘে সহসা কয়েকটা বজ্রপাত হলেও আমি চমকে উঠতুম না। সেটা তো স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ব্যাপার কিন্তু এ যে আমার কাছে অস্বাভাবিক।

তারপরই আবার সব নীরব। গাছের পাতার খসখসানি ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

জানি না এই কণ্ঠস্বরের অধিকারী বিরাটকায় মর্কটরা কোথায় আছে। তবে একটা বিশ্রী গন্ধ আমার নাকে ধাক্কা দিলো। আমার মনে হলো কোথায় কোন ফাঁক থেকে বিশাল একটা লোমশ হাত বেরিয়ে তার অতিকায় থাবা দিয়ে আমার মুণ্ডুটা ধরে তুলে আমাকে পর্যবেক্ষণ করবে। এবং আত্মরক্ষার জন্যে আমি গুলি চালাতে পারব না। বেঁচে ফিরলে বেলজিয়ম সরকারকে কুড়ি হাজার ফ্রাংক জরিমানা দিতে হবে অথবা কারাবাস।

গোরিলা সম্বন্ধে আমি সত্য মিথ্যা মিলিয়ে অনেক গল্প শুনেছি। গোরিলাকে লক্ষ্য করে কেউ যদি গুলি করে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তবে তার আর নিস্তার নেই। গোরিলা চকিতে শিকারীকে ধরে ফেলবে তারপর মরণ আলিঙ্গনে তাকে বুকে চেপে ধরবে যে পর্যন্ত না তার হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়, তারপর লাশটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। গোরিলা প্রচণ্ড শক্তি ধরে, বড় গোরিলা রাইফেল ভেঙে দিতে পারে। একটি থাপ্পড়ে একটা মানুষকে মেরে ফেলতে পারে। কত পিগমিকে এইভাবে মেরে ফেলেছে।

সহসা আমার ডান দিকে গাছের সরু ডাল ভাঙার আওয়াজ পেলুম। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ফিরিয়ে কিন্তু কিছু দেখতে পেলুম না। কোনো গাছও নড়ছে না। আবার ডাল ভাঙার শব্দ, তবুও আমার সামনে কিন্তু এবারও কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। একটু পরে আবার শব্দ। দেখতে না পেলেও ডাল ভাঙার

ও গাছের পাতার সড়সড় শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কোনো গোরিলা কোথাও যাচ্ছে। হয় আমাদের দেখতে পায় নি বা গ্রাহ্য করছে না অথবা অন্যদিকে কোথাও ওর তাড়া আছে।

আমার অনুমান ঠিক। গোরিলারা এখন তাদের রাতের বাসা ছেড়ে এই পাহাড়ের মাথা ছেড়ে নিচের দিকে কোথাও নেমে যাচ্ছে। ওদের বিরক্ত না করলে এখন ওরা আমাদের বিরক্ত করবে না। অবশ্য অন্ধকার থাকতে ভোর-বেলাতেই ওদের সর্দার আমাদের সাবধান করে দিয়েছে, হয়ত শেষবারের জন্যে, এখান থেকে কেটে পড় নইলে সর্বনাশ হবে।

প্রথম দিন আমার পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আর পারছি না, দম বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার ক্যাম্পে ফেরা যাক। ফিরতেও তো পরিশ্রম। কম্পাস বার করে দিক ঠিক করে ক্যাসিচিউলাকে বললুম, চল হে এবার ফেরা যাক। আজ আর নয়, অনেক হয়েছে।

পিগমিদের ভাষা এখনও আয়ত্ত করতে পারি নি। মনে হলো সর্দার আমার কথা বুঝতে পারে নি। তাই ইসারা করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম, সেই সঙ্গে ওদের ভাষার পরিচিত কয়েকটা শব্দও ব্যবহার করল। ক্যাসিচিউলা ঘাড় নেড়ে আমাকে জানিয়ে দিলো সে বুঝতে পেরেছে, বওয়ানা ক্যাম্পে ফিরতে চায় কিন্তু সে দিক পরিবর্তন করে ক্যাম্পের দিকে পা বাড়াল না। আমি বিরক্ত হয়ে প্রায় ওকে ধমক দিলুম তবুও সে অটল, নিজের পথে চলতে লাগল। হাত নেড়ে আমাকে বোঝাতে চাইল ঘাবড়াও মাৎ।

আমি ভাবি আচ্ছা পাল্লায় পড়লুম তো। হাতে কম্পাস থাকলেও এই দুর্ভেদ্য জঙ্গল ভেদ করে আমার পক্ষে একা যাওয়া সম্ভব নয়। প্রায় পাঁচ ছ ঘণ্টার পথ। ও তো চলল উলটো দিকে। ক্যাম্পে ফিরতে তো আরও সময় লাগবে।

এবার অনুরোধ। তাও সে গ্রাহ্য করল। ক্যাসিচিউলা নিজের পথে চলতে লাগল। আশ্চর্য? দু ঘণ্টার মধ্যে ক্যাসিচিউলা আমাকে ক্যাম্পে পেঁৗছে দিলো। ওদের দিক নির্ণয়ের জ্ঞান দেখে আমি অবাক। ওরা কখনও দিক ভুল করে না। কম্পাস নেই বা কম্পাস খারাপ হয়ে গেছে এমন অবস্থায় কত অভিযাত্রী, রত্নানুসন্ধানী বা শিকারী বনের মধ্যে পথ হারিয়ে অনাহারে, তৃষ্ণায় ও ক্লান্তিতে মারা গেছে।

ক্যাম্পে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছি কিন্তু তখনও মাটিতে জল পড়ে নি। আপাততঃ গাছের পাতা ভিজছে, বৃষ্টি আটকাচ্ছে, একটু পরে ভাসিয়ে দেবে। প্রবল বৃষ্টি হয় এই জঙ্গলে। বৃষ্টি থামার পর সেদিন বিকেলে প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। ক্যাসিচিউলা তার পাতার কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এসে বলল সব মেঘ চলে গেল এখন কয়েক দিন বৃষ্টি হবে না। মনে মনে বললুম, ভারি আমার আবহাওয়াবিদ এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য এদের প্রাকৃতিক অনুভূতি। সত্যিই এরপর কয়েক দিন বৃষ্টি হয় নি। পশুরা জানি অনেক প্রাকৃতিক ঘটনার আভাস পূর্বেই পেয়ে সতর্ক হয়। যেমন বর্ষার আগে পোকামাকড় চঞ্চল হয়, ভূমিকম্পর আগে বেড়াল ক্রমাগত কাঁদতে থাকে, বৃষ্টির পূর্বে পিঁপড়ে সার দিয়ে খাবার সংগ্রহ করে নিরাপদ স্থানে সঞ্চয় করে। তা পিগমিরা তো বনেই বাস করে। ওরাও বোধহয় বন্যপ্রাণীর অনেক অনুভূতি আয়ত্ত করেছে অথবা বনের পাখি বা পোকা-মাকড়েরা গতিবিধি দেখে পূর্বাভাস দিতে পারে। ক্যাসিচিউলার পূর্বাভাস সত্য হোক আর মিথ্যা হোক আপাততঃ বৃষ্টি না হলে আমার পক্ষে মঙ্গল নইলে ক্যাম্প গুটিয়ে ফিরতে হবে।

এখন পিগমিরাই আমার সাথী, ওদের সঙ্গেই থাকি বলে বনে বনে ঘুরে বেড়াই। ওদের সঙ্গে মিশে দেখলুম ওদের বিষয় আমি কিছুই জানি না। এই খাটো মানুষটা আফ্রিকার যে কোনো আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের এমন একটা স্বকীয়তা আছে যা আর কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর নেই। এদের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান জ্ঞান প্রচণ্ড। সভ্য মানুষদের মধ্যে এমন আত্মসম্মান জ্ঞান বিরল।

অর্থের বিনিময়ে এদের দিয়ে কেউ কোনো কাজ করাতে পারে নি বা কর আদায় করতে পারে নি। এদের কোনো পুঁজি নেই, কোনো সম্পদ নেই। বর্শা, তীরধনুক এবং ছোরা ও পাতার কুটির নিয়েই এরা সন্তুষ্ট। কোনো দুশ্চিন্তা নেই, কাল কি খাব সেজন্যে চিন্তাও নেই। অতি অল্পে এরা সন্তুষ্ট এবং পরনির্ভরশীল নয়।

কয়েকটা ডাল, কিছু পাতা ও শুকনো শ্যাওলা দিয়ে যেমন তেমন করে এরা সামান্য বাসস্থান বানিয়ে নেয়। অরণ্যই তাদের যৎসামান্য আহার যোগায়, বুনো সিম, কলা, কয়েক রকম বীজ, ফল, শেকড় এবং গোরিলারা যে মিওন্ডো ফসল খেতে ভালবাসে সেই ফসল। মিওন্ডো হলো বুনো সেলারি।

ওদের সামান্য তিনটি অস্ত্র, বর্শা, তীরধনুক ও ছোরা এবং ছোট সাইজের বাঁকানো তলোয়ার ওরা তৈরি করে বনে প্রাপ্ত কাঠ থেকে। বর্শা তৈরি করে আয়রন উড থেকে। তীরধনুকের জন্যেও নমনীয় কাঠ পাওয়া যায়, তবে ছোরা ও চতুর্থীর বাঁকানো চাঁদের মতো তলোয়ার তৈরী করে দেয় ওদের উইচ ডক্টর। লোহা গলিয়ে কি ভাবে অস্ত্র তৈরী করতে হয় তা উইচ ডক্টররা জানে।

বন তো পশুর আবাস। খর্বাকায় হাতি, পাহাড়ী ছোট হরিণ, বেড়ালজাতীয় ছোট পশু, ইঁদুর, বা ইঁদুরজাতীয় পশুর অভাব নেই, অতএব খাদ্যেরও অভাব নেই এবং পশুর যৎসামান্য চামড়া ওদের লজ্জা নিবারণ করতে যথেষ্ট। পাখির মাংসও অঢেল। তেলমসলার দরকার নেই, আগুনে ঝলসে খেয়ে নেয়। অর্থের ওদের প্রয়োজন নেই। অর্থ কি ওরা জানলেও ব্যবহার করে না এমন

ক বৌ বেচবার জন্যেও নয়, কারণ বিনা পণে ও যৌতুকে ওরা বিয়ে করে এবং ওদের ছোটখাটো বৌটিও গয়নার জন্যে আবদার করে না। অতএব পরিশ্রম করে অর্থ রোজগারের চেষ্টা কেন ? যদি কোনো লোক চাকরি বা ব্যবসা না করে, মজুরী না খাটে এবং কারও কোনো সম্পদ ব্যবহার না করে তাহলে সে কর দেবে কেন ?

বলজিয়নারা দেশ দখল করবার পর খাজনা আদায় করবার চেষ্টা করেছিল। সেই জন্যে তারা মামবুটি পিগমিদের বস্তিতে সঙ্গে রক্ষী নিয়ে ট্যাক্স কলেক্টর পাঠানো দিত, কিন্তু তারা একটিও পিগমির দেখা পায় নি তবে কার কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে। ওরা বনের যে অংশে আত্মগোপন করেছিল সেখানে মানুষ ঢুকতে সাহস করে না, ওরাই সাহস করে। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সুবুদ্ধির উদয় হয়েছিল। ওরা তো কারও সাতে পাঁচে নেই, ওদের বাদ দাও। সেই থেকে আর খাজনার জন্যে ওদের কেউ বিরক্ত করে নি। তবে গভীর গোরিলা ফরেস্টে ওদের তুল্য বিশ্বাসী গাইড পাওয়া যায় না।

অতএব পিগমিরা তাদের দুশ্চিন্তাহীন দরিদ্র-জীবন পরম সুখে অতিবাহিত করছে। আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান পুরুষানুক্রমে বজায় রেখে চলেছে, কারও কারও ধারে না। তাদের এই আত্মসম্মানবোধ এতই প্রবল যে পয়সা দিলেও ওরা হালকা মোটও বইবে না তাই আমিও চেষ্টা করি নি। ভালবেসে পয়সা দিলেও ছোঁবে না। স্বেচ্ছায় ওরা আমার রাইফেল বা সরঞ্জামসহ ক্যামেরা বয়েছে, বিনিময়ে কিছুই নেয় নি। সামান্য নুন বা পোড়া সিগারেটের শেষ অংশ ওদের খুশি করতে যথেষ্ট। কিন্তু পয়সা কখনও নয়।

আগেই বলেছি গাইড বা শিকারের সঙ্গী বা সহকারী হিসেবে ওরা অতুলনীয়। ওরা যেভাবে সহায়তা করে তা পয়সার বিনিময়ে পাওয়া যায় না। বুদ্ধিমান, স্নেহ ও সহানুভূতিশীল, বিশ্বাসী, সাপ বা হিংস্র বন্যপ্রাণীর কবল থেকে রক্ষা ও সতর্ক করতে সর্বদা প্রস্তুত, আজ্ঞাবাহী এবং অতিমাত্রায় সাহসী। বনে কখন কি বিপদ হতে পারে তার মাত্রা কত দূর তা জানা সম্ভব নয়, কিন্তু যত বড় বা যত হিংস্র সে প্রাণী হোক না কেন ওরা ওদের সামান্য অস্ত্র বর্শা, তীরধনুক বা লম্বা ছোরা দিয়ে তার মোকাবিলা করে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও সাহসের সঙ্গে। আফ্রিকায় যত বন্যপ্রাণী আছে, হাতি, গণ্ডার, সিংহ, কুমির তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক হলো গোরিলা, সেই গোরিলাকেও ওরা আক্রমণ করতে ভয় পায় না।

গভীর গোরিলা-ফরেস্টে থাকতে থাকতে আমার বামন পিগমি বন্ধুদের সহায়তায় গোরিলা-জীবন সম্বন্ধে আমি অনেক তথ্য সংগ্রহ করলুম। একটা ব্যাপার শুধু রপ্ত করতে পারছি না, সেটা হলো ঐ গভীর জঙ্গল ভেদ করে হাঁটাচলা। ক্যাম্প থেকে যাত্রা করে যদিও বা কয়েক ঘণ্টা অমানবিক শ্রম সহ্য

করে চলতে পারি কিন্তু ফেরার সময় মনে হয় প্রাণ বুঝি বেরিয়ে যাবে। একদিন ঠিক করলুম কয়েক দিন বিশ্রাম নেওয়া যাক কিন্তু পরদিন সকাল হতেই নীরব রহস্যময় বন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। ক্যাসিচিউলাকে ডেকে বলি চল হে।

জানি না ক্যাসিচিউলা কি করে জানতে পারে গোরিলার পাল গত রাত্রে কোথায় বাসা বেঁধেছিল। ক্যাসিচিউলা আমাকে ঠিক সেই গাছের কাছে মানে বাসায় নিয়ে যাবে। গোরিলারা কখনও এক বাসায় এক রাত্রির বেশি কাটায় না, তারা নিত্য নতুন বাসা বাঁধে। একই বাসায় পর পর দু দিন ঘুমোয় না। এইজন্যে পরদিন সকালে গিয়ে পরিত্যক্ত বাসা দেখা যায়। সাধারণতঃ দুটো পাশাপাশি বাসা দেখা যায় এবং প্রতি বাসার নির্মাণ-কৌশল একই রকম। একটা বাসায় হয়তো দেখা যায় চারটে গোরিলা ঘুমিয়েছিল আর পাশেরটায় ছ'টা গোরিলা। ক্যাসিচিউলা বললো তার অর্থ দুটো পরিবার ছিল, দিনে ঐ দুটো পরিবার একই সঙ্গে ভ্রমণ করেছিল। রাত্রেও ওরা দলের পৃথক সত্তা বজায় রাখে, এমনই ওদের অভ্যাস।

পাশাপাশি অথচ কাছাকাছি দুটো বড় গাছের নিচে বাসা দুটো দেখা গেল। লক্ষ্য করে দেখলুম বাসা বানাতে ও তাকে আরামদায়ক করতে যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়েছে ও পরিশ্রম করতে হয়েছে। যে জমির ওপর বাসা বানিয়েছে সেখান থেকে ঝোপঝাড় কাঁটাগাছ ইত্যাদি উপড়ে তুলে ফেলে জমি পরিষ্কার করেছে। তার ওপর শ্যাওলা, নরম পাতা ও ঘাস দিয়ে বেশ পুরু কোমল শয্যা তৈরি করেছে। আবার লতা টাঙিয়ে পর্দারও ব্যবস্থা করেছে।

গোরিলা পরিবারে যখন শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তখন পুরুষ গোরিলারা মা ও শিশুর জন্যে গাছের উঁচু ডালে শ্যাওলা ও লতা-পাতার গদি দিয়ে উত্তমরূপে বাসা তৈরি করে দেয় আর পুরুষরা সেই গাছের গোড়ায় নিজেদের কুঁড়ে তৈরি করে নেয়। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দেবার জন্যে ঘাস চিবিয়ে নরম করে 'কুশন' তৈরি করে। সেই কুশনে ঠেস দিয়ে তারা ঘুমোয় কিন্তু ওদের ঘুম বেশ সজাগ। সামান্য আওয়াজে ওরা জেগে ওঠে এবং বিপদ দেখলে তখনি প্রস্তুত হয়।

ভোরে বাসা ছেড়ে গোরিলারা কি করে এবং রাতের বাসায় আর ফিরে আসে না কেন দেখা যাক। গোরিলাদের এই দৈনন্দিন কার্যসূচি দেখবার জন্যে ক্যাসিচিউলা আমাকে সাহায্য করেছিল।

সে গোরিলার পায়ের ছাপ দেখবার জন্যে আগে আগে চলল। পিগমিরা জীব-জন্তুর পায়ের ছাপ দেখতে ও চিনতে এতই অভ্যস্ত যে আমি তাদের এই কৌশল ধরতেই পারলুম না। আমার চোখে কোনো চিহ্ন ধরা পড়ছে না কিন্তু ক্যাসিচিউলা ঠিক চিনতে পারে। আমি যখন বিশ্বাস করতে চাই না তখন সে

আমাকে দেখিয়ে দেয়, যাকে বলে চোখে আঙুল দিয়ে ঠিক সেইভাবে, তখন আমি বিশ্বাস না করে পারি না। তবে সব ছাপ কি অস্পষ্ট বা আমার চোখে অদৃশ্য? তা নয়। অনেক ছাপ বেশ স্পষ্ট। নরম জমিতে তো ছাপ বেশ গভীর। এই গভীর ছাপ দেখে পিগমিরা বলে দিচ্ছে কোন পায়ের ছাপ কোন গোরিলার। আমার চোখে সব গোরিলা দেখতে একরকম কিন্তু পিগমিদের চোখে তা নয়, ওরা অরণ্যের প্রতিটি গোরিলাকে চেনে, তাদের নামও দিয়েছে। পায়ের ছাপ দেখে ওরা গোরিলার নামও বলে দিচ্ছে।

কাদার ওপর একটা পায়ের ছাপ পেলুম। লোভ সামলাতে পারলুম না। প্লাস্টার অফ প্যারিসের ছাপ নোব। তার আগে পায়ের ছাপটা মেপে দেখলুম, লম্বায় সাড়ে চৌদ্দ ইঞ্চি, এক ফুটেরও বেশি, চওড়া ছয় ইঞ্চি কিন্তু বুড়ো আঙুল থেকে কড়ে আঙুল পর্যন্ত প্রায় আট ইঞ্চি। ঐ একই নরম জমিতে পায়ের ছাপের গভীরতা যে কোনো পিগমির পায়ের ছাপ অপেক্ষা চার গুণ বেশি। এই দেখে গোরিলার ওজন অনুমান করা যায়। কি বিশাল বপু তার! সব জাতের গোরিলাই এত বড় ও ভারি হয় না, ছোট সাইজের গোরিলাও আছে। [বিখ্যাত শিকারী মার্টিন জনসন ও তাঁর পত্নী আসা কঙ্গোর ছোট জাতের গোরিলাদের নিয়ে 'কঙ্গোরিলা' নামে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের একটি ডকুমেণ্টারি ফিল্ম করেছিলেন যা কলকাতায় দেখান হয়েছিল।]

আমরা যেমন সহজে বই পড়ি, ক্যাসিচিউলা তেমনি টপাটপ পায়ের ছাপ দেখে তার সঙ্গী পিগমিদের গোরিলার নাম বলে দিতে লাগল। পরে আমাকে পায়ের ছাপের পার্থক্য বুঝিয়ে দিলো। পিগমি ও অন্য বনবাসীরা জন্তুর পায়ের ছাপ দেখে বলে দিতে পারে কোনটা পুরুষের আর কোনটা মেয়ের এবং কত নতুন বা পুরানো। পায়ের ছাপ শিকারীদের খুবই সাহায্য করে।

আমাদের আগে গোরিলার দল চলেছে। তাদের মাঝে মাঝে দূরে দেখতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি না। আমরা খুব সাবধানে চলেছি যাতে একটুও শব্দ না হয়। গোরিলার শ্রবণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ। আমি কখনও খালি চোখে, কখনও দূরবিন লাগিয়ে বা কখনও গাছে উঠে আমি যতদূর পারি গোরিলাদের দেখছি। তাদের প্রতিটি নড়াচড়া লক্ষ্য করছি। এমন চমৎকার সুযোগ কি আর পাব?

গোরিলা যে পরিমাণ খাদ্য খায় তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। তা তো খাবেই নইলে অত বড় দেহটাকে দু পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখবে কি করে আর ক্ষিপ্রগতিতে নড়াচড়া চলাফেরা করবে কি করে? গোরিলার দেহের তুলনায় তার পা কিন্তু ছোট। পা বড় হলে আর রক্ষে ছিল না।

গোরিলারা কি খায় দেখবার জন্যে একবার একটা ছোট দলকে অনুসরণ করেছিলুম। তারা দু পাশ দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে। একটা ফাঁকা

জায়গায় ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানে বড় গাছ নেই। প্রচুর মিয়োণ্ডো জন্মেছে, বুনো সেলারি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে ওরা সেই বুনো সেলারি মুঠো মুঠো তুলে গাল ভর্তি করতে লাগল আর সেই সঙ্গে নিজেদের ভাষায় বা ইশারা ইঙ্গিতে গল্প করতেও লাগল। বিরাট থাবায় এক একবার প্রচুর সেলারি উঠছে আর পেটে চালান হয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলুম ওরা পুরো গাছটা মুখে পুরছে না। ডাঁটা থেকে পাতাগুলো ছাড়িয়ে নিয়ে মুখে পুরছে। চিবোতে চিবোতে মুখকে একটুও বিশ্রাম দিচ্ছে না। মুখে পুরেই আবার শাক তুলে ডাঁটা থেকে পাতা ছাড়িয়ে মুখে পুরছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মিয়োণ্ডো সাফ হয়ে গেল। সর্দার গরগর করে কি ইঙ্গিত করল কে জানে। দল চলল অন্য ক্ষেতের সন্ধানে।

এবার আমি বুঝতে পারলুম গোরিলারা কেন সেই সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অক্লান্তভাবে সারাদিনটা ঘুরে বেড়ায়। শুধুই আহারের সন্ধানে এবং সন্ধান পেলে পেট ভরাতে ব্যস্ত হয়। কে জানে সারাদিন ধরে খেয়েও ওদের জালার মতো পেট ভরে কি না। তবে ওরা যখন বসে তখন ওদের পেট ওদের হ্রস্ব পদযুগল ঢেকে দেয়। তার মানে পাকস্থলী খাদ্য পূরিত হয়ে এতই স্ফীত হয় যে নিম্নাঙ্গ চাপা পড়ে যায়, দেখা যায় না।

গোরিলারা নিরামিষভোজী। ওদের প্রিয় খাদ্য হলো মিয়োণ্ডো অর্থাৎ বুনো সেলারি, কচি বাঁশের কোঁড়, বুনো পেঁয়াজ আর বুনো কদলী। এসবই বনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তবে সংগ্রহ করবার জন্যে বনে বনে বিচরণ করতে হয়। এক জায়গার ভোজ্য শেষ হয়ে গেলেই আবার অন্য ক্ষেত্রের সন্ধানে যেতে হয়। চলার বিরাম নেই। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেয়।

রাত্রে যে বাসায় ওরা ঘুমিয়েছিল, সকালে উঠে খাদ্যের সন্ধানে গোরিলাকে অনেক দূরে চলে যেতে হয়। পুরানো বাসায় ফিরে আসতে হলে আবার অনেকটা পথ হাঁটতে হবে। রাত্রিও হয়ে যাবে, তার চেয়ে যেখানে উদরপূর্তি সম্পূর্ণ হয়েছে তারই কাছে নতুন বাসা বানিয়ে নেওয়া অনেক সহজ। অন্ধকারে খুঁজে খুঁজে পুরানো বাসায় ফেরার পরিশ্রম তো বাঁচবে।

বেলা একটা দুটো আন্দাজ সময়ে গোরিলারা বিশ্রাম নেয়। এক দফা পেট ভর্তি হয়ে যায়, ক্লান্তি দূর হয়, ঘুম পায়। আর সত্যিই ধাড়ী গোরিলারা তখন ঘুমোয়। বাঙালীদের ভাতঘুমের মতো আর কি। ওরা ঘাসের ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। কোনো গোরিলা গাছে ঠেস দিয়েও ঢুলতে থাকে। বাচ্চা আর ছোকরাগুলো হুটোপাটি লাফালাফি করে। মাকে বিরক্ত করে, চড়চাপড়ও খায়; আর সেই কোদাল সদৃশ্য হাড়ের একটা থাপ্পড় খেয়ে গোরিলা বাচ্চা কয়েকটা পাল্টা খেয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, মায়ের গায়ের লম্বা

চুল ধরে টানে। বাচ্চাগুলোর গায়েও কি কম জোর নাকি? এই দৃশ্য রীতিমতো উপভোগ্য। তবে দূর থেকে অত্যন্ত সাবধানে ও নিঃশব্দে দেখতে হয়। গোরিলারা টের পেলে যমালয়ে পাঠিয়ে দেবে।

সর্দার গোরিলার দায়িত্ব অনেক। সে সব সময়ে দলের আগে আগে চলে এবং ফেরে সবার শেষে। দলের সকলে যখন আহার করতে ব্যস্ত তখন সে চারদিকে টহল দেয় যাতে কেউ আহারের ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে না পারে। অন্য কোনো জন্তু আহারে ভাগ বসাতে না আসে।

ধাড়ী গোরিলার উচ্চতা কম করে সাড়ে ছয় ফুট। সারা দেহ ঢেউ খেলানো কালো লোমে ভর্তি কিন্তু কোমরের লোম ছোট, কাঁটা গাছের ঘর্ষণে ছিন্ন-ভিন্ন। সেই বিশাল দেহ যখন নদনদ করে হেলে দুলে চলতে থাকে তখন তা দেখে রসিকজন হয়তো মনে মনে সৈন্যদের কুচকাওয়াজের ব্যাণ্ড বাজাতে চাইবেন।

বন্য গোরিলার কোমরের লোম যে কারণে অদৃশ্য হয় ঠিক সেই কারণে বন্য সিংহরও কেশরও ছিন্নভিন্ন। চিড়িয়াখানায় সিংহের কেশর দেখবার মতো কিন্তু আফ্রিকায় সিংহ বাস করে লম্বা ঘাসের বনে যে ঘাসের কিনারা ভাঙা কাঁচের মতো ধারাল। সেই ঘাসে ঘর্ষণ লেগে সিংহর কেশর ছিঁড়ে যায়।

গোরিলার দল যখন ভ্রমণে বা আহারের সন্ধানে বেরোয় (ওদের আর কাজ কি?) তখন বেশ দূর থেকে ওদের অনুসরণ করতে হয়। টের পেলে কি হবে তা না বলাই ভালো। গোরিলা যদিও বা মানুষের উপস্থিতি টের পায় এবং তখন তার মেজাজ যদি ভালো থাকে তাহলে সে মানুষকে আক্রমণ করে না, উলটে ছুটে পালায় এবং এত দ্রুত যে তাদের পাত্তা পেতে বেগ পেতে হয়। আমরা অবশ্য অত্যন্ত সতর্কভাবে এবং যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে গোরিলাদের অনুসরণ করতুম। ফলে আমরা যতদূর সম্ভব কাছ থেকেই গোরিলাদের লক্ষ্য করতে পারতুম। সব কৃতিত্ব ক্যাসিচিউলার প্রাপ্য।

দুপুরে গোরিলার দল যখন বিশ্রাম নিত আমরাও তখন আমাদের যাত্রা ভঙ্গ করে অপেক্ষা করতুম। এই সময়ে আমি পিগমিদের সঙ্গে গল্প করতুম। ক্যাসিচিউলার মুখ থেকে একদিন শুনলুম সে গোরিলা সর্দারকে কিটুম্বো বলে। তার মতে কিটুম্বো হলো গোরিলাদের সম্রাট। গোরিলা তার শত্রু হলেও কিটুম্বোর সে প্রশংসা করে।

ক্যাসিচিউলাকে প্রশ্ন করেছিলুম সে কিটুম্বোকে মারবার চেষ্টা করে নি কেন? উত্তরে বলেছিল এখন আর গোরিলা মারবার কোনো উপায় নেই কারণ বওয়ানারা গোরিলা হত্যা বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয় ক্যাসিচিউলা বা অন্য পিগমিরা কিটুম্বোকে রীতিমতো ভয় পায়। তাকে মারতে গেলে নিজেদের না মরতে হয়। বেলজিয়মদের আইন ওদের নিরস্ত

করে নি, ভয় ওদের নিরস্ত করেছে। কিন্তু কিটুম্বোকে মারবার দরকার কি? দৈত্যস্বরূপ একটা গোরিলা উদাহরণ হয়ে থাকুক না? কিন্তু তখন কি আমিই জানতুম যে কিটুম্বোর আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, আর বেশি দিন বাঁচবার অধিকার তাকে দেওয়া হয় নি।

গোরিলা ফরেস্টে আসবার কয়েকদিন আগে একদিন বিকেলে চায়ের টেবিলে বুকাভুর ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার আমাকে বলেছিলেন :

জানেন মসিঁয়ে গ্যাত্তি, পিগমিদের রীতি হলো গোরিলা হত্যা করা, এটা ওদের মধ্যে বংশপরম্পরায় চলে আসছে। গোরিলার মাংস ওদের প্রিয়। ওরা লুকিয়ে গোরিলা হত্যা করে। গোরিলা মরলে সে খবরটা আমরা পিগমিদের কাছ থেকেই পাই, কিন্তু ওরা নিজেরা যদি গোরিলা মারে তবে সে খবর তো ওরা আমাদের দেবে না। তবে বড় জাতের জায়াণ্ট গোরিলাদের ওরা সত্যিই ভয় পায়। এই হলো গোরিলা ও পিগমিদের সম্পর্ক। সুযোগ পেলে ওরা গোরিলা মেরে তার মাংস খাবে এবং গোরিলাদের অযথা বিরক্ত করলে বা আক্রমণ করলে তারাও পিগমি মারবে।

ক্যাসিচিউলা যদিও আমাকে বলল যে বওয়ানারা গোরিলা মারা বন্ধ করে দিয়েছে তাই তারা আর গোরিলা মারে না কিন্তু সে আমাকে বলল যে কিটুম্বো ছাড়া অন্য একটা দলে আরও একটা জায়াণ্ট গোরিলা আছে, সুযোগ পেলে সেটাকে সে মারবে। অন্য কেউ মারলেও তার আপত্তি নেই। একবার সুযোগ আসুক না, গোরিলাটাকে একবার যদি বাগে পাওয়া যায় তবে সে ও তার মামবুটি পিগমিরা গোরিলাটাকে ছেড়ে দেবে না।

ক্যাসিচিউলা কোনোদিন সেই গোরিলাটা মারতে পারে নি, তার দেখাও পায় নি। তার আগে জায়াণ্ট গোরিলার হাতে ক্যাসিচিউলাকেই প্রাণ দিতে হলো।

অন্য দলের সেই জায়াণ্ট গোরিলাটার পিগমিরা নাম দিয়েছিল মোয়ামি আনানগি, যার অর্থ রাজা গোরিলা। এর চেয়ে বড় ও শক্তিশালী জায়াণ্ট গোরিলা পিগমিদের জানা ছিল না। তার মেজাজও ভালো ছিল না অর্থাৎ বদমেজাজী। মোয়ামি ছিল পিগমিদের এক নম্বর শত্রু।

এই মোয়ামি গোরিলাটাকে ক্যাসিচিউলা তার অন্তর থেকে যারপরনেই ঘৃণা করত। ঘৃণা করবার উপযুক্ত কারণ ছিল। কয়েক বছর আগে গোরিলাটা ক্যাসিচিউলার ছ'জন শিকারীকে নির্মমভাবে মেরে ফেলেছিল। ঐ ছয়জনের মধ্যে ক্যাসিচিউলার এক ছেলেও ছিল।

পিগমিরা সাদা উই আহারের সঙ্গে চাটনি হিসেবে খায়। একদিন যখন ঐ ছ'জন বনে বেশ পুষ্ট দেখে উইপোকা সংগ্রহ করছিল তখন যাকে বলে বিনা প্ররোচনায় মোয়ামি গোরিলা ওদের আক্রমণ করে। নিজের বুকে ঘুষি মারতে মারতে সংহার-মূর্তিতে সে তেড়ে এসে ওদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে।

ক্যাসিচিউলার ছেলে ও আর একটা পিগমিকে সে ধরে ফেলে নিজের বুকে তাদের টিপে ধরে মেরে লাশ দুটোকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তাদের হাড়গোড় চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, দেহ হয়েছিল পিণ্ডবৎ। এতেও সে সন্তুষ্ট হয় নি।

বাকি চারজন পিগমি তখন প্রাণভরে পালাচ্ছে। মোয়ামি তাদের তাড়া করল। গাছপালা ভেঙে সে উন্মাদের মতো ছুটে চলেছে। তার মাথায় বোধহয় আগুন জ্বলছে। সামনে যে পড়বে তার নিস্তার নেই। পলায়মান ক্ষুদে পিগমিরা বুঝল আজ তাদের নিস্তার নেই তবুও প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা তো করতে হবে। এরকম ক্ষেত্রে একটা কৌশল তাদের জানা আছে।

গোরিলার তাড়া খেয়ে পিগমিরা পালাতে পালাতে না থেমে ফলক উঁচু করে বর্শাটা মাটিতে হেলিয়ে গোড়াটা গেঁথে দেয়। গোরিলা যেদিক থেকে আসছে ফলাটা সেই দিকে হেলান থাকে। ফলাটা গাছের পাতার আড়ালে থাকে। গোরিলা সবেগে ছুটে আসবার সময় বর্শার ফলা পেটে বিঁধে যায়। উন্মত্ত গোরিলারা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটবার সময় প্রায়ই এই ফাঁদে পড়ে। মোয়ামির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটল। লতাপাতার আড়ালে একটা বর্শা থাকায় অথবা সেই ক্ষিপ্ত গোরিলার তখন বর্শা দেখবার অবকাশ কোথায় ?

নিরাপদ দূরত্ব থেকে পিগমিরা দেখল মোয়ামি হঠাৎ থেমে গেল তারপর এক হাড়-কাঁপানো যন্ত্রণাকাতর অন্তর্ভেদী চিৎকারে সারা বনভূমি কেঁপে উঠল। সে যে কি চিৎকার তা লিখে বা বলে বোঝান সম্ভব নয়। সেই মর্মভেদী চিৎকারের সঙ্গে মিশে আছে ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসা।

পিগমিরা দেখল গোরিলাটা বর্শাটা দু হাত দিয়ে ধরে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেটা পেট থেকে বার করবার চেষ্টা করছে। বার করতে পারছে না, কারণ বর্শার ফলকের নিচে দুটো বাঁকানো আংটা আছে যা পেটের মধ্যে গেঁথে বসেছে। মানুষ বা বাঁদর হলে তখনি মরে যেত কিন্তু গোরিলার প্রাণ খুব মজবুত।

মোয়ামির আর তাড়া করবার শক্তি নেই। সে বর্শাটা ধরে টানাটানি করতে করতে ও নিজের ভাষায় অভিসম্পাত দিতে দিতে ফিরে চলল। কে জানে অরণ্যের আরও কোনো গভীর অঞ্চলে গিয়ে সে হয়তো মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করবে অথবা দলে ফিরে গিয়ে অন্যান্য গোরিলাদের নিজের দুর্দশা দেখাবে। এরপর কয়েক মাস মোয়ামির সাড়াশব্দ নেই। ক্যাসিচিউলা ও অন্য পিগমিরা ভাবল আপদ গেছে, তারা নিশ্চিন্ত হলো।

তারপর একদিন মোয়ামি সহসা ফিরে এল। এবার সে আরও হিংস্র, আরও রাগী। পিগমিরা বিপদ গনল এবং প্রতিজ্ঞা করল যেভাবে হোক মোয়ামিকে শেষ করতেই হবে নইলে সে পিগমি বংশকে নির্বংশ করে ছাড়বে। পিগমিরা মোয়ামির গতিবিধির খবর রাখতে লাগল।

মোয়ামির এই দুর্দশার কাহিনী পিগমিরা নেচেকুঁদে অভিনয় করে আমাকে শুনিয়েছিল। ক্ষুদে মানুষগুলো লাফাচ্ছে, কাঁদছে, চিৎকার করছে, হাত পা ছুঁড়ছে সে দেখতে বেশ মজা লাগছিল। আমি কিন্তু তখন তাদের এই কাহিনী বিশ্বাস করি নি।

কিছুদিন পরে।

একদিন সকালে যাত্রা আরম্ভ করার আগে ক্যাসিচিউলা ও অন্যান্য পিগমিরা মুখ তুলে কিসের যেন ঘ্রাণ নিতে লাগল, কিছু শোনবার যেন চেষ্টা করতে লাগল। তারা অশুভ কিছু আশঙ্কা করলেও নিরুৎসাহ হয়ে সেদিন যাত্রা স্থগিত রাখল না।

অন্যদিন গোরিলা অনুসন্ধানে ক্যাসিচিউলা আমার আগে যায়—আজ সে আমাকে এগিয়ে যেতে বলল।
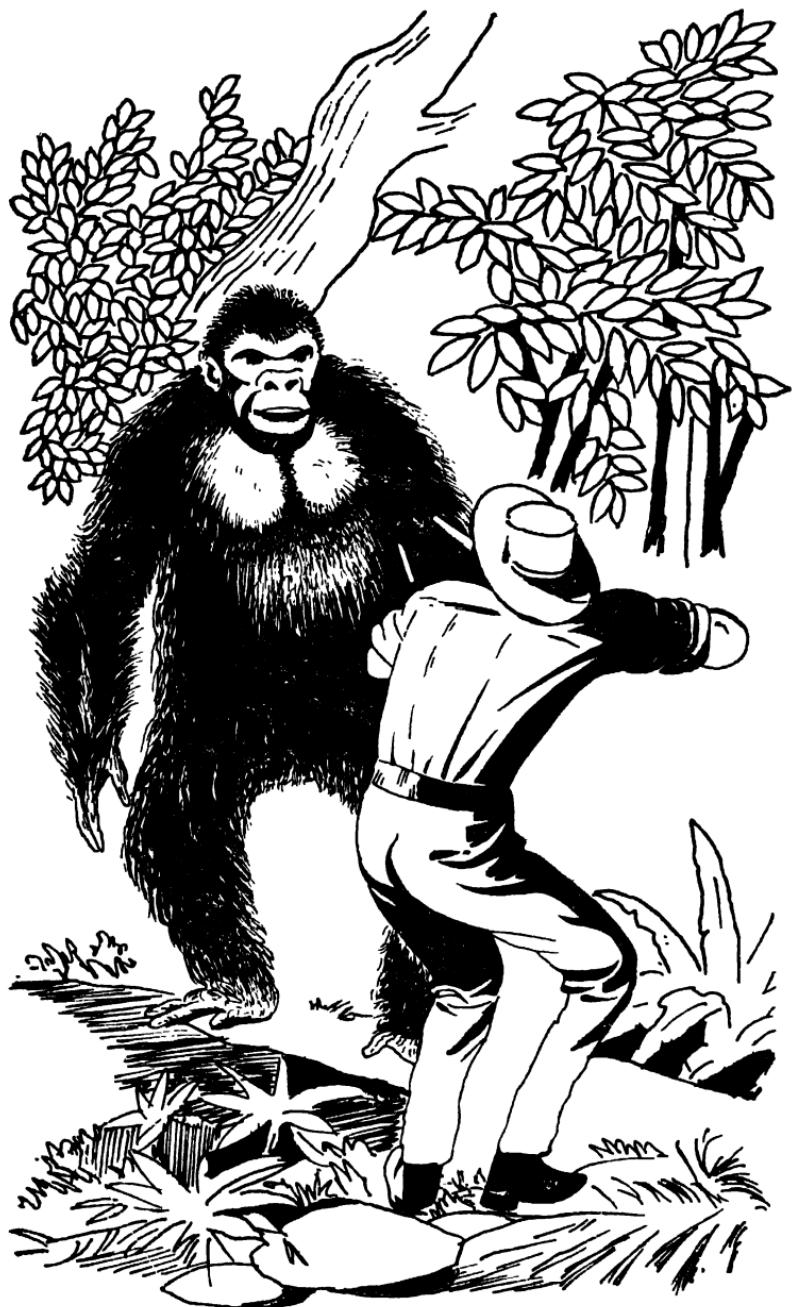
দুপুর নাগাদ আমার মনে হলো আমরা শীঘ্রই কিটুম্বো গোরিলা ও তার দলের দেখা পাব। এখন তারা কোথাও হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে।

চলতে চলতে ক্যাসিচিউলা থেমে গিয়ে বাতাসের ঘ্রাণ নিতে লাগল। তারপর আশপাশের গাছপালা লক্ষ্য করতে লাগল। এ রকম তো সে প্রায়ই করে কিন্তু এবার যেন বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ক্যাসিচিউলা সামনে খাড়া একটা চড়াইয়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ওপরে উঠতে বলল। তার অনুমান ওপরে উঠলে আমরা কিটুম্বো ও তার দল দেখতে পাব। সে তাড়া দিতে লাগল।

তাড়া খেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আমি হাঁপিয়ে উঠলুম। দম নিতে নিতে আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম অথচ এই সময়ে আমার সতর্ক হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমি তখনও জানতে পারি নি একদল গোরিলার কত কাছে আমি এসে পড়েছি অথচ ক্যাসিচিউলার সেটা জানা এবং আমাকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল। তা সে করে নি, সে ভুল করেছিল এবং তাকে প্রাণ দিয়ে এই ভুলের দণ্ড দিতে হয়েছিল। ক্ষিপ্ত জায়াণ্ট গোরিলার সংহার মূর্তির সঙ্গে আমারও পরিচয় ছিল না বিশেষ সেই গোরিলা যদি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়।

ক্যাসিচিউলার নির্দেশমতো আমি তখন এগিয়ে চলেছি। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে খাড়াই পার হতে পারছি না। রাইফেল সামলে প্রায় হামাগুড়ি দিতে হচ্ছে। রাইফেল ফস্কে গেলে সমূহ বিপদ। হাতিয়ার সর্বদা প্রস্তুত রাখতে হয়।

ক্যাসিচিউলা সর্বদা আমার আগে যায় এবং অন্যান্য পিগমিরা আমাকে ঘিরে থাকে। এই ব্যবস্থাতেই আমি অভ্যস্ত কিন্তু আজ পরিবেশ ভিন্ন রকম। তবুও আমার মনে হচ্ছিল পিগমিরা আমার পাশেই আছে, তারা আমাকে অনুসরণ করছে না। যদিও পরিবেশ আজ ভিন্ন এবং আমি অত্যন্ত ক্লান্ত তবুও চিন্তা আমাকে ছাড়ে নি।

আমি মোয়ামির দিকে রাইফেল তাক করলুম

আমি ভাবছি ওপর থেকে একটা গোরিলা যদি হঠাৎ এসে আমাদের আক্রমণ করে তখন পিগমিরা কি তাদের বর্শা ছুঁড়ে তার আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে ? সন্দেহ হচ্ছে। আমি রাইফেল তাক করতে করতে চলেছি। গোরিলা শুধু তার চাপেই দু চারটে পিগমিকে যমালয়ে পাঠিয়ে দেবে। ঢালু জমিতে আমাদের অসুবিধে অনেক। যত শীঘ্র সম্ভব খাড়াইটা পার হয়ে ওপরে সমান জমিতে পৌঁছন দরকার।

আমার বুকে তখন কে দমাদ্দম করে হাতুড়ির ঘা পিটছে, ফুসফুস বুঝি ফেটে যাবে। দম বুঝি বন্ধ হয়ে এল। কপাল থেকে দরদর করে ঘাম ঝরছে, দৃষ্টি ঝাপসা। কোনো রকমে এক খণ্ড সমান জমিতে পৌঁছন গেল। চারদিকে এক অশুভ নীরবতা প্রকৃতি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গাছের ডালে কলোবাস বাঁদর-গুলো আজ কোথায় পালিয়েছে। তাদের কিচিমিচি নেই। পাখি তো নেইই, পোকাগুলোই বা আজ তাদের ঐকতান বাজাচ্ছে না কেন। আশ্চর্য !

এই সমতল জমিতে ওঠার সময় একটা লায়ানা লতা সাপের মতো আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল। এখন দম নিতে নিতে তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করছিলুম। কিছুক্ষণ চেষ্টার ফলে মুক্ত হলুম।

আমি ক্যাসিচিউলাকে ডাকতে যাচ্ছিলুম। তাকে বলতে যাচ্ছিলুম এবার তুমি আমার আগে চল আর সেই সময়ে যেন বন কাঁপিয়ে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো। সে যে কি বীভৎস চিৎকার সে আমি কি বলব ? পরপর তিন বার, আমার কান বুঝি ফেটে যাবে।

কোথা থেকে একটা নয়, দুটো নয়, তিনটে গোরিলা ধেয়ে এল। যার মাথা সবচেয়ে উঁচু সে কিটুম্বো নয়, একদা আহত মোয়ামি আনসারি, প্রতিহিংসা নেবার জন্যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছে। শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। আমি তখন একা।

মোয়ামির চোখে তখন আগুন জ্বলছে, দাঁত কিড়মিড় করছে। বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আর এক সেকেন্ড দেরি নয়। আমাকে মরতে হবে। যতই ক্লান্ত হয়ে থাকি না কেন হাতিয়ার রেডি রেখেছিলুম অথবা চিৎকার শুনেই রেডি হয়েছিলুম। আমি মোয়ামির দিকে রাইফেল তাক করলুম। রাইফেল দেখে কি মোয়ামি আরও ক্ষেপে গেল। সে তার থাবা দুটো আমার দিকে প্রসারিত করল। কোদালের মতো না হলেও ধারাল ছুরির ফলার মতো সেই নখ। মোয়ামি যেন বলছে এই নখ দিয়ে তোমাকে আমি চিরে ফেলব, পালাবে কোথায় ? আর দেরি নয়। আমি ট্রিগার টিপলুম, গুলি ছুটল কিন্তু মোয়ামি গুলি খেয়েও থামল না। সে এখন মাত্র কুড়ি ফুট দূরে। এত কাছ থেকে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারি না। আমি আবার গুলি করলুম। মোয়ামি এবার থেমে গেল। টলতে টলতে আমার দিকে কয়েক

পা এগিয়ে আসবার চেষ্টা করতে করতে গাছের ছোট গাছটা ভেঙে ধ্পাস করে আমার সামনে পড়ল। পাহাড় নাকি ? হবে হয়তো। কি বিরাট এই জায়াণ্ট গোরিলার অবয়ব। গাছটার একটা ডাল ভেঙে আমার গায়ে পড়ল।
আরও দুটো গোরিলা আছে, মাদী। সে দুটো আমাদের আক্রমণের চেষ্টা করে নি অথচ সে দুটোকে মারা যায় না। ডি সি-র সতর্কবাণী মনে পড়ল, গোরিলা মেরো না। আকাশের দিকে আমি পরপর দুটো গুলি করলুম। কারণ বলতে পারি না, গোরিলা দুটো পালিয়ে গেল। পালিয়ে গেল কি ? না, পালায় নি। অথচ তাদের দেখা যাচ্ছিল না।
আমি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে রাইফেলে ভর দিয়ে বসে পড়লুম। ক্যাসিচিউলা ও পিগমির দল ছুটে এল। সবার আগে ক্যাসিচিউলা। তার চলন দেখে মনে হলো সেই যেন মোয়ামিকে মেরেছে, ছেলেকে হত্যা করার প্রতিশোধ নিয়েছে। বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে মৃত মোয়ামির পেটের ওপর একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বলল, এই যে দেখে যাও, বর্শার ক্ষত চিহ্ন এখনও রয়েছে। সে খুবই উৎফুল্ল।
ফেরবার পথে এবারও ক্যাসিচিউলা সবার পশ্চাতে। চড়াই থেকে নেমে আমরা চলেছি। আমার পাশেই একজন পিগমি চলছিল। সে সহসা থেমে গিয়ে কিসের ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করল। তারপর শুনলুম পাতার সড়সড় শব্দ। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলুম একটা গোরিলা ক্যাসিচিউলাকে তুলে ধরে ছুটে পালাল। ক্যাসিচিউলার মর্মভেদী চিৎকার আজও আমি ভুলতে পারি নি। তার লাশ যখন পাওয়া গেল তখন তা আর চেনবার উপায় ছিল না।

শয়তান কুমির

সুদীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে, অনেক বিপদের মোকাবিলা করে আমরা যখন ওয়াকাপাগায় পৌঁছলুম তখন আমরা সকলে রীতিমতো ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত।

ভেবেছিলুম প্রতিবারের মতো এবারও গ্রামের নরনারী বালক বৃদ্ধ আমাদের দেখেই ছুটে আসবে। হা হতোস্মি! কোথায় কে? গ্রামে বুঝি একটাও মানুষ নেই তা কে ছুটে আসবে? কয়েকটা ছাগল ছাড়া একটাও অন্য জীব দেখা গেল না।

আমার মালবাহীদের সর্দার কাপালালোকে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? সবাই কি কোনো ভয় পেয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে?

আমার আদেশের অপেক্ষা না করে সে তার মালবাহীদের বলল সব মাল নামিয়ে ফেলতে। ওদের যখন মাল নামান হলো তখন কাপালালো আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কিছু শুনতে পাচ্ছেন? পুব দিকে আঙুল দেখাল।

অনেক দূর থেকে যেন গান ভেসে আসছে। একসঙ্গে অনেকে গান গাইছে। গানের সুর মনে হলো নদীর দিক থেকে ভেসে আসছে। নদীর ধারে কি কোনো উৎসব হচ্ছে, নাকি মেলা বসেছে তাই গ্রামের সব মানুষ সেখানে জড়ো হয়েছে? আমি জিজ্ঞাসা করলুম, বিয়ে হচ্ছে নাকি?

প্রথমে তো ক্যানোয় চেপে খরস্রোতা নদী তারপরে কুমির ভর্তি খাঁড়ি পার হতে চারদিন লাগল। তারপর কড়া রোদে একটানা বারো মাইল হেঁটে সবে গ্রামে এসে পৌঁছেছি। আর এই বারো মাইল পথ বাঁধানো রাস্তা নয়। উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও খোয়া, পাথর, হাঁটুভর্তি ধুলো বা কাদা, বনজঙ্গল। জীবজন্তু ও সাপের ভয়ও ছিল। দু চারটের সঙ্গে মোকাবিলা করতেও হয়েছে।

সারা দেহ চিড়বিড় করছে, কত রকম পোকা কামড়েছে, চুলকোনার ফলে রক্তও বেরিয়ে পড়েছে। মাথা গরম। সারা দেহ টনটন করছে।

মেজাজ খারাপ। কোথায় গ্রামে ঢুকে স্নান করব তা নয়, এক গ্লাস জল দেবার একটাও লোক নেই। নদীর ধারে কি হচ্ছে জানতে আমার বয়ে গেছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারছি না।

আমি চাই কি এখনি আমার তাঁবু খাটানো হোক। আমার জলের পোর্টেবেল টবটা ঠাণ্ডা জলে ভর্তি করে দেওয়া হোক, খানিকক্ষণ গা ডুবিয়ে বসে দেহ ঠাণ্ডা করে তারপর জীবাণুনাশক সাবান মেখে স্নান করব। গা মুছে ক্ষত-

স্থানগুলোতে টিঞ্চার আয়োডিন লাগাব।

গলা শুকিয়ে কাঠ, খিদেও পেয়েছে, দাবদাহ জ্বলছে, তাপমাত্রা বোধ হয় ১২০ ডিগ্রি। ভনভন করে মাছির ঝাঁক বিরক্ত করছে।

আমি হাত পা নেড়ে চিৎকার করে উঠলুম। বিয়ে বা মেলা হোক বা যাই হোক ওসব আমি জানি না। তুই সর্দারকে ডেকে আন। আগে সকলের জন্যে খাবার জল আন তারপর আমার স্নানের ব্যবস্থা কর। কিছু ফল, ডিম, আর চিকেন, আর উনুন ধরাবার কাঠও চাই। যা, ওঠ, আর এক মিনিটও দেরি করিস না।

কাপালালো যেন আমার কথা শুনতে পায় নি। সে শুধু মাথা নেড়ে জানাল অসম্ভব অথচ সে আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেবক। অত্যন্ত অনুগত। আমার আদেশ পালন করতে পারলে যেন বর্তে যায়। সে চুপ করে বসে রইল, যেন অসহায়।

কি হলো রে? শুনতে পাচ্ছিস না?

এবার সে মুখ খুলল, বলল, কুমির। কাল সে কুমারী যমজ বোনের একটাকে খেয়েছে।

তাহলে কি গাঁয়ের লোকেরা শোকমিছিল করে নদীর ধারে গেছে? ওরা না ফেরা পর্যন্ত আমাদের হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হবে? আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো?

কাপালালো এই অঞ্চলেরই মানুষ। তার গ্রাম এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে সে নিজেদের অনেক পালনীয় রীতিনীতি মানে না, বিশ্বাসও করে না। সেও ওয়াকাপাগা উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তার শ্বশুরবাড়িও কাছেই।

কাপালালো ভালো অভিনেতা তবে মঞ্চে অভিনয় করে না। অপরের কথাবার্তা চালচলন মুদ্রাদোষ ইত্যাদি অদ্ভুত ভাবে অনুকরণ করতে পারে।

কাপালালো দারুণ কষ্টসহিষ্ণু, তার শক্তির বুঝি সীমা নেই, সহজে ক্লান্ত হয় না। গতকাল কি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে তা সে আসবার সময় অন্য এক গ্রামের একজন লোকের কাছে শুনে এসেছে। এখন সে গ্রীষ্মের উত্তাপ ও পথের ক্লান্তি ভুলে কি ঘটেছে হাত পা নেড়ে অভিনয় করে তারই ধারা-বিবরণী দিতে আরম্ভ করল। সমস্ত মালবাহী তার বিবরণী শুনতে লাগল। কেউ বিরক্ত হলো না, আপত্তি করল না। কাপালোলোর বিবরণী সকলে চুপ করে শুনল কিন্তু তার কাহিনী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মুখর হয়ে উঠল। অবিশ্বাস করবার কারণ নেই, কারণ এমন ঘটনা ওদের দেশে ঘটে ও সবই ওরা বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়।

কাপালালো বলল, গ্রামবাসীরা এখন নদীর ধারে সমবেত হয়ে চাফু-মায়ার আরাধনা করছে, তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। আমাদের এখন নদীর

ধারে যাওয়া উচিত হবে না কারণ ভিন জায়গার মানুষ সেখানে গেলে ওরা বিরক্ত হবে, বাধাও দিতে পারে। চাফু-মায়া ওদের পবিত্র দেবতা। ওরা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করে।

আমি ওয়াকাপাগাদের ভাষা যতটুকু বুঝি তাতে চাফু-মায়ার অর্থ হলো মৃত্যু-দূত। তবুও আমি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম সে কি কোনো প্রেতাত্মা?

না বওয়ানা প্রেতাত্মা নয়, জীবন্ত এক কুমির। বিরাট আকার, নদীতে ভেসে বেড়ায়। তার যে কত বয়স কেউ জানে না, গ্রামের বৃদ্ধরা ছোটবেলায় তাকে যেমন দেখেছে আজও তেমনি দেখছে। নদীর লাগোয়া জলাতেই ওকে দেখা যায়, যেমন দুরন্ত তেমনি ধূর্ত। কালই তো নানিনি নামে আইবুড়ো মেয়েটাকে জলে টেনে নিয়ে গেছে। নানিনির যমজ বোনটাকে দু বছর আগে খেয়েছে।

একটা মানুষখেকো কুমিরের প্রতি এদের ভক্তি দেখে আমি বিরক্ত হয়ে বলি, তুই কি বলতে চাস এমন একটা শয়তান যে ওদের ধরে ধরে খাচ্ছে তাকে না মেরে ওরা তার পুজো করছে? পারলে আরও দু চারটে মেয়েকে বলিদান দেবে নাকি?

উপায় নেই বোধহয় বওয়ানা, ওকে শান্ত না রাখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে তাই ওরা নদীর ধারে গেছে কিছু আচার-অনুষ্ঠান করতে যাতে চাফু-মায়া শান্ত থাকে। যাতে আবার না ফিরে এসে উপদ্রব করে।

কুমির সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। ছোট বড় অনেক কুমির আমাকে মারতে হয়েছে। কুমির মারতে হলে চাই শক্তিশালী রাইফেল এবং কয়েকটি মোক্ষম জায়গা আছে ঠিক সেইখানেই গুলি করতে হয়।

এদেশের মানুষের পক্ষে কুমির মারা শক্ত কারণ এদের তীর বা বর্শা কুমিরের দেহের পুরু ও কঠিন বর্ম ভেদ করতে পারে না। তবে কোনো কোনো মানুষ আছে যারা বুদ্ধি খাটিয়ে কৌশল করে কুমিরকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে। অনেক সাহসী মানুষ আছে যারা জলে নেমে ধারাল ও লম্বা ছোরা দিয়ে কুমিরের পেট চিরে দেয়, তবে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

এখানে নদী ও জলাতে মেয়েরা স্নান করতে বা জল আনতে গিয়ে প্রায়ই কুমিরের খাদ্য হয়। তাই আমি কাপালালোকে জিজ্ঞাসা করলুম, তোমাদের মেয়েরা যেখানে জল আনতে বা নাইতে যায় সে জায়গাটা তোমরা বেড়া দিতে পার না?

কাপালালো বলল, এই ওয়াকাপাগা অঞ্চলে মোটা বা মজবুত গাছ নেই। যেসব গাছের গুঁড়ি বা ডাল পাওয়া যায় সেগুলো মজবুত নয়। তবুও ওয়াকা-

পাগারা চেষ্টা করেছিল। জলে খুঁটি পোঁতবার সময়ে কয়েকজন কুমিরের পেটে গেছে। তবুও যদি বেড়া দিতে পেরেছে তো কুমিরের লেজের ঝাপটায় সে বেড়া কোথায় চলে গেছে।

তোমরা তো হিপ্পো ধরবার জন্যে ফাঁদ পাতো তা চাফু-মায়াকে ধরবার জন্যে ফাঁদ পাতলে তো পার।

কাপালালো এবং কয়েকজন মালবাহী সঙ্গে সঙ্গে কানে আঙুল দিয়ে বলল, বওয়ানা অমন কথা বলবেন না, শুনলে আমাদের পাপ হবে। চাফু-মায়া সাক্ষাৎ ভগবান, তিনি সব জানতে পারেন, যে ফাঁদ পাতবার মতলব করবে তাকেই আগে মরতে হবে আর আমরা কুমির ধরার ফাঁদ পাততেও জানি না।

এইটাই হলো আসল ব্যাপার। চাফু-মায়ার অলৌকিক শক্তি আছে বলে এরা বিশ্বাস করে আসছে। সেই অলৌকিক শক্তি মিথ্যা বিচার না করে এরা মায়া-জালে আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

লণ্ডনের সেই বিখ্যাত ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিনে কুমির মারার আমি একটা সত্য কাহিনী পড়েছিলুম।

ইণ্ডিয়ার আসামে ব্রহ্মপুত্র নদীতে বিরাট একটা কুমির ভীষণ উৎপাত আরম্ভ করেছিল। নদীর ধারেই কারও যাবার উপায় ছিল না। কুমিরটার এমন সাহস যে কাছের গ্রাম থেকে গরু বাছুর ছাগল টেনে নিয়ে গেছে।

খবর পেয়ে চা-বাগানের এক সাহেব কুমিরটা মারবার অনেক চেষ্টা করেছিল। সাহেবের ছিল উইনচেস্টার গান। কুমির মাঝে মাঝে নদীর চরায় নিশ্চল হয়ে রোদ পোয়াত। সেই সময়ে সাহেব গুলি চালিয়ে ছিল কিন্তু সে গুলি কুমিরের বর্ম ভেদ করতে পারে নি।

কুমিরটা মাঝে মাঝে হাঁ করে পড়ে থাকে। সেই সময়ে ছাতারে পাখি তার দাঁত থেকে মাংসর টুকরো খুঁটে খুঁটে যায়। পাখিগুলো কুমিরের দাঁত পরিষ্কার করার টুথপিকের কাজ করে। কুমির বাধা দেয় না কারণ দাঁতের ফাঁকে মাংসর টুকরো জমে পচে গেলে কুমিরের দাঁতে যন্ত্রণা হয়।

সাহেব ঠিক করল এই সময়ে কুমিরের মুখের ভেতরে গুলি করবে। সাহেব দু বার চেষ্টা করেছিল। একবার গুলি ফসকে গেল আর একবার কুমির টের পেয়ে জলে ডুব মারল।

এক বুড়ি ছিল। সে বলল, সাহেব এটা কুমির নয়, দানোয় পাওয়া কুমিরবেশী রাক্ষস। এটা মারা তোমার কম্মো নয়। আমি এটাকে মারতে পারি আর দেখো কালই আমি মারব।

সাহেব তো হো হো করে হেসে উঠল। বলল, আমার বন্দুক যা পারল না তা তুমি করবে? আমি বিশ্বাস করি না। তবুও বলছি যদি পার তো তোমাকে একশ টাকা দোব।

বুড়ি বলল, আমার টাকা চাই না। আমার একটা নাতি আছে। নাতিটাকে তোমার বাগানে একটা চাকরি দিয়ো আর একটা নাতনি আছে তাকে আয়ার একটা চাকরি দিয়ো। তোমার মেমসায়েবের বাচ্চাদের সামলাবে।
সাহেব রাজি হলো।
বুড়ি করল কি একটা বড় সাদা ছাগল যোগাড় করল। তারপর ছাগলটার কানে সর্ষে ঢুকিয়ে সেটাকে মেরে ফেলল। ছাগল মরবার পর তার পেট কেটে ভেতর থেকে সব নাড়ি ভুঁড়ি বার করে ঘুটিং চুন ভরে সেলাই করে দিলো। তারপর নদীর ধারে ছাগলটাকে একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল।
এক সময়ে সেই দানব কুমির এসে ছাগলটাকে খেয়ে ফেলল। তারপর কয়েক ঘণ্টা পরে নদীতে তাণ্ডব শুরু হলো। জল তোলপাড়। কুমির পেটের যন্ত্রণায় ছটফট করছে, লেজের ঝাপটা মারছে। সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে নদীর ধারে ভিড় জমে গেল। সাহেবও এসেছিল।
দানব কুমির সহজে কি মরে। সময় লাগলেও তার ইহলীলা শেষ হয়েছিল। সাহেব তার কথা রেখেছিল। নাতিকে চা-বাগানে আর নাতনিকে মেমসায়েবের আয়ার চাকরি দিয়েছিল।

শুধু এই ওয়াকাপাগারা নয়, আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখেছি বাসুটো ও বেচুয়ানারা কুমিরকে পুজো করে। প্রাচীন মিশরে নীল নদের কুমিরদের দেবতা-রূপে পুজো করা হতো।
কাপালালোকে বললুম, সব শুনলুম, ঠিক আছে। তোরা না মারিস তো আমিই কুমির মারব বলে আমার রাইফেলটা তুলে নিয়ে বললুম, অনেক কথা হয়েছে, এবার তুই তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা কর।
তখন অবশ্য আমার কুমির শিকারের আগ্রহ বা শক্তি ছিল না কিন্তু কাপালালো ভাবল আমি তখনি বুঝি রাইফেল নিয়ে নদীর ধারে যাচ্ছি কিন্তু রাইফেলটা হাতে নেওয়ার আমার অন্য মতলব ছিল।
কাপালালো ছুটে এসে আমার পথ আগলে দাঁড়াল, হাত নেড়ে বলতে লাগল। দোহাই বওয়ানা, এখন তুমি কিছুতেই নদীর ধারে যেয়ো না। তোমাকে দেখলেই ওরা বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলবে। এখন কুমির মারতে যেয়ো না। ঠিক আছে তুই তোর কাজ কর, তোর লোকগুলোকে কাজে লাগা, অনেক দেরি হয়ে গেছে।
কাপালালো কাজ আরম্ভ করল কিন্তু আড়চোখে আমার দিকে নজর রাখতে লাগল। আমি তখন রাইফেলটা খুলে একটা জিনিস দেখছি। সামান্য একটা খুঁত দেখা দিয়েছে, সেটা ঠিক করতে হবে।
কাপালালোকে রীতিমতো চিন্তিত মনে হলো। আমাকে রাইফেল সাফ করতে

দেখে বলল, তুমি যদি কুমির মারবার চেষ্টা কর তাহলে অন্য সাহেবদের মতো মারা পড়বে।

কি বলছিস? এখানে আবার সাহেব কোথায়?

এখন নেই কিন্তু এসেছিল বওয়ানা। তাহলে একটু শুনুন। অনেক দিন আগে তখন আমি ছোট, ন্যাংটা হয়ে ঘুরে বেড়াই। বেলজিয়মের এক সাহেবের মাল বইতুম, ফাইফরমাস খাটতুম। সেই সাহেব হাতি শিকার করত। সাহেব ওস্তাদ শিকারী ছিল, টিপ ফসকাতো না। সাহেব এখানে এসে শুনল এখানে জলাটায় কুমিরের ভীষণ উৎপাত। সাহেব বলল, জলায় গিয়ে সব কুমির মেরে শেষ করে দেবে।

ওয়াকাপাগারা বার বার নিষেধ করল, যেয়োনা সাহেব, মরবে। সাহেব যখন একটা ছোট নৌকো নিল তখন তারা বলল, সাহেব তুমি পাগল হয়েছ? আমাদের চাফু-মায়া তার বিরাট লেজের ঝাপটায় তোমার ঐ যুদ্ধে নৌকো উলটে তোমাদের জলে ফেলে দেবে তারপর তোমার হাড়গোড় চিবিয়ে খাবে। ও কাজ কোরো না।

সাহেব ভাবল এইসব মূর্খ অশিক্ষিত লোকগুলো কি জানে? আমার রাইফেলে পাহাড়ের মতো হাতি মরে আর কুমির মরবে না? লেজের ঝাপটা মারবার আগেই কুমিরের দফা রফা করব।

দুজন ওয়াকাপাগাকে হাতির প্রচুর মাংস খাইয়ে সাহেব তাদের সঙ্গী হতে রাজি করল। তাদের নিয়ে সাহেব সেই ছোট নৌকোয় উঠল। লোক দুজন দুটো বর্শা নিয়েছিল তবে তাদের কাজ হবে দাঁড় চালানো।

সাহেব ওদের নিয়ে যখন যাত্রা করল তখন ভোর হয়েছে। জলার ওপর ঘন কুয়াশা। জলার জল পরিষ্কার নয়। অনেক আগাছাও আছে। সাহেবের জানা উচিত ছিল যে এই নোংরা জলে কুমির দিব্যি মিলেমিশে যেতে পারে। জলে কিছু ভাসছে কিনা তার টের পাওয়া যায় না। তার ওপর ঘন কুয়াশা।

সারা গ্রামের মানুষ নদী আর জলার ধারে জড়ো হয়েছে। নিরাপদ দূরত্বে থেকেও তারা ভয়ে কাঁপছে। আধঘণ্টা পরে দূরে গুলির একটা আওয়াজ শোনা গেল। তারপর আর্তনাদ এবং তারপর সব চুপ। গ্রামের মানুষেরা নদী কিনারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল কেউ ফিরে এল না। সেই নৌকো, দুজন ওয়াকাপাগা, তাদের বর্শা, সাহেব, তার রাইফেল, তার চকচকে সেই গোল ম্যাজিক টিকটিকটা যা নাকি সময় বলতে পারে, কিছুই পাওয়া যায় নি।

আমি এই কাহিনী বিশ্বাস করতে পারলুম না, কারণ ঘন কুয়াশায় কোনো অভিজ্ঞ শিকারী শিকার করতে যাবে না। বড়ো নৌকো হলে কথা ছিল কিন্তু খুদে নৌকোয় চেপে নয় আর যে জলায় বড়ো কুমির আছে সে জলায় তো নয়ই।

তবুও জিজ্ঞাসা করলুম, গ্রামের লোকেরা তাদের খোঁজ করল না ?

কি লাভ বওয়ানা। তিনটে মানুষকেই কুমিরের দল ভাগাভাগি করে খেয়েছে। আর রাইফেল বর্শা কি টিকটিক ম্যাজিক কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। খুঁজতে গেলেও তো কুমিরের পেটে যেতে হবে। আমরা তো বারবার নিষেধ করেছিলুম।

সত্যি যদি কোনো সাহেব এমন ঝুঁকি নিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে সে বোকামি করেছিল।

কাজ করতে করতেই কাপালালো বলতে থাকল, দু তিন বছর আগে আরও একজন সাহেব এসেছিল। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া আর তেমনি সাহস। সাহেবের বুকে একটা ম্যাজিক বাক্স ঝুলত। সাহেব সেটা দিয়ে সিংহ, হাতি, জেবির 'ফোটুলা' নিয়ে তাদের গুলি করে মারত। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। সাহেব কখনও রাইফেল হাত ছাড়া করত না। ঘুমোবার সময়ও পাশে নিয়ে শুত। সেই সাহেবকেও চাফু-মায়া খেয়ে ফেলল।

সাহেব দিনের বেলায় ঘুমতো আর রাত্রে নদীর ধারে গিয়ে রাইফেল হাতে বসে থাকত। সঙ্গে কি একটা পাউডার রাখত। দেশলাই জ্বাললে সেটা দপ্ করে জ্বলে উঠে দিনের মতো আলো হতো। বুঝলুম ম্যাগনেশিয়াম পাউডার। সাহেব পরপর কয়েক রাত্রি গেল। কপাল মন্দ। সকাল হলে ফিরে এসে স্নান করে খেয়েদেয়ে ঘুম দিত। রাতের পর রাত সাহেবও অপেক্ষা করে আর চাফু-মায়াও অপেক্ষা করে।

একদিন সকালে সাহেব ফিরে এল না। গ্রামের লোক নদীর ধারে গিয়ে দেখল সাহেবের রাইফেল পড়ে রয়েছে। সাহেব নেই। একটা বড়ো কুমির যে একটা মানুষকে জলে টেনে নিয়ে গেছে নরম জমিতে তার ছাপ স্পষ্ট। চাফু-মায়ার পায়েরও কয়েকটা ছাপ চিনতে পারা গেল। সাহেব নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

এই কাহিনীও আমার বিশ্বাস হলো না। জানি না অভিজ্ঞ শিকারী রাত্রে কুমির মারতে যায় কি না। কাপালালোকে আমি বিশ্বাস করি এই দুটো গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। কিছু হয়ত সত্য। আমি যাতে কুমির শিকার করতে না যাই এবং যে কুমিরকে ওরা দেবতা জ্ঞান করে সেই কুমিরকে একজন সাহেব মারবে এটা ওদের নিশ্চয় পছন্দ নয়। কখনও এ কাজ ওরা সমর্থন করবে না। কাপালালো চায় চাফু-মায়া যেমন আছে থাকুক না, ও তো তোমার কোনো ক্ষতি করে নি।

এমন সময়ে সঙ্গীত সহসা থেমে গেল কিন্তু একটু পরেই আবার আরম্ভ হলো এবং গ্রামের দিকে আসতে আরম্ভ করল। কাপালালো আমাকে বলল, বওয়ানা তুমি এখানে কয়েকটা দিন থেকে যাও, একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে।

কিন্তু কাপালালো ওয়াকাপাগা গ্রামবাসীরা কি পছন্দ করবে। সাহেব মানুষরা

এ দেশ দখল করে নিয়েছে, সাহেবদের তো তোমরা শত্রু মনে কর। তোমাদের অনেক রীতিনীতি বন্ধ করে দিয়েছে, মানুষ খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, মেয়েরা নিরাবরণ হয়ে নদীতে যেত ও স্নান করে নিরাবরণ হয়ে ফিরে আসত এসব বন্ধ করে দিয়েছে, তার ওপর ওরা তোমাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে না দিলে তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিনা পয়সায় মজুরের কাজ করে। তারপর তোমরা অন্য কোনো গ্রামের সঙ্গে লড়াই করে জিতলে তাদের ধরে এনে আরব ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দিতো, এসব সাহেবেরা বন্ধ করে দেওয়ায় তোমাদের আয় কমে গেছে। আমাকে কি ওরা এই গ্রামে থাকতে দেবে ?

বওয়ানা তুমি যা বললে তা ঠিক কিন্তু সব সাহেবকে ওরা শত্রু মনে করে না। ওরা শুনেছে তুমি ও তোমার বন্ধুরা ওদের অনেক উপকার করেছ, চিকিৎসা করে ওদের রোগ সারিয়েছ, অনেক উপহার দিয়েছ। ঠিক আছে বওয়ানা, তুমি ভেবো না, যাতে ওরা তোমাকে কিছুদিন থাকতে দেয় আমি তার ব্যবস্থা করে দোব।

কাপালালো আমার হয়ে প্রচার আরম্ভ করে দিলো। সে জনে জনে ডেকে ডেকে বলতে লাগল এই বওয়ানা যদি আমাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন থাকে, আমাদের উৎসব অনুষ্ঠানগুলো দেখে তাহলে তোমাদের আপত্তি কিসে ? ইনি আজ পর্যন্ত আমাদের কোনো ক্ষতি করেন নি। অনেক উপকার করেছেন। সেবার দুটো সিংহর উৎপাতে আমাদের গরু ছাগল শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সিংহ দুটোকে আমরা যখন মারতে পারলুম না তখন এই বওয়ানাই সিংহ দুটোকে মেরে আমাদের বাঁচালেন।

সর্দার এবং আরও অনেকে যখন দাঁতের যন্ত্রণায় অস্থির তখন ইনিই তাদের দাঁত ভালো করে দিলেন। আমাদের কত তামাক আর মেয়েদের কত কি উপহার দিয়েছেন।

এইভাবে কাপালালো আমার প্রচার চালাতে লাগল। কাপালালোর মুখ থেকেই খবর পেলুম যে সরকারের লোক শিগগির খাজনা আদায় করতে আসবে অথচ সর্দারের টাকার অভাব। খাজনা দিতে না পারলে ওরা বলবান দেখে দশ বারোটা যুবককে ধরে নিয়ে যাবে। ওরা সঙ্গে অনেক সেপাই আনে, তাদের হাতে বন্দুক থাকে, আমরা কিছুই করতে পারি না, কাপালালো আমাকে বলল।

আমি তখন জিজ্ঞাসা করলুম, কেন ? তোমাদের চাফু-মায়া যাকে তোমরা দেবতা মনে কর, যার এত শক্তি, সে তোমাদের রক্ষা করতে পারে না ?

কি করে পারবে ? ওরা তো সঙ্গে অনেক সেপাই আনে।

বুঝলুম এইসব মূর্খ আদিবাসী ঘোর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। এদের

কেউ লেখাপড়া শেখায় না, শুধু লেখাপড়া নয় কিছুই শেখায় না। যাই হোক কাপালালোকে বললুম, তোমাদের সর্দার মাতুঙ্গোকে বল খাজনার জন্যে চিন্তা করতে হবে না। আমার কাছে অনেক পয়সা আছে, আমি বাকি খাজনা শোধ করে দোব।

মালবাহীদের দেবার জন্যে আমার কাছে সব সময়ে ছোট মুদ্রা থলে ভর্তি করে রাখতে হয়। ওরা বড় মুদ্রা চেনে না। দু তিনটে বড় মুদ্রায় ওরা খুশি হয় না, কিন্তু পরিবর্তে একসঙ্গে অনেকগুলো ছোট মুদ্রা পেলে ওরা খুব খুশি হয়।

কাপালালো তখনই সর্দারের কুটিরের দিকে ছুটল, এই সুখবর দিতে। কিছুক্ষণ পরে কাপালালো সর্দারকে সঙ্গে এনে হাজির।

সর্দার মাতুঙ্গো আমাকে বলল, আমি সব শুনেছি কিন্তু তুমি যে আমাদের বকেয়া খাজনা শোধ করে দেবে তা দেখি তোমার টাকা কোথায়?

আমি তখনই তাঁবুর ভেতরে ঢুকে কাঠের সিন্দুক খুলে মুদ্রাভর্তি তিনটে থলে পর পর সর্দারের সামনে ফেলে দিলুম। ঝমঝম করে আওয়াজ হলো।

সর্দার থলে তিনটের মুখ খুলে ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মুদ্রাগুলো বার করে দেখল। কি আনন্দ! কি হাসি! আনন্দে বুঝি সর্দার ফেটে পড়বে।

নিজেই থলেগুলোর মুখ বন্ধ করল। আমি বললুম, থলেগুলো নিয়ে যাও সর্দার। কৃতজ্ঞতায় সর্দারের মুখ চোখ উদ্ভাসিত।

সে এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, বওয়ানা আমার বন্ধু। তোমার যতদিন ইচ্ছা আমাদের গ্রামে থাক। কয়েক দিনের মধ্যে নদীর ধারে আমাদের একটা বিরাট অনুষ্ঠান হবে। সেটা তুমি নিশ্চয় দেখতে যাবে। কাপালালো তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে গাছের ছায়াতে ভালো করে বসিয়ে দেবে।

সর্দার ফিরে গিয়ে আমাকে কয়েকটা মুরগি ডিম আর এক পাত্র দুধ পাঠিয়ে দিলো। আমিও কয়েকটা চুরুট উপহার পাঠালুম।

কাপালালোকে জিজ্ঞাসা করলুম, নদীর ধারে কিসের অনুষ্ঠান হবে?

কাপালালো যা বলল তা শুনে আমি রীতিমতো অবাক। চাফু-মায়াকে হত্যা করা হবে। আমি সত্যিই অবাক হলুম। জিজ্ঞাসা করলুম, কি ব্যাপার? তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?

না মুশুঙ্গু, ঠাট্টা করছি না। আমাদের প্রধান গুণিন বলেছে যে যমজ বোন দুটি চাফু-মায়ার পেটের ভেতরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে কিন্তু চাফু-মায়া তাদের মুক্তি দিতে পারে না। তাই চাফু-মায়ার পেট চিরে তাদের বার করে দিতে হবে। মনে মনে বলি মেয়ে দুটি তো হজম হয়ে গেছে। তাদের কি করে

বার করা হবে, কেই বা বার করবে।
জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু কাপালালো তোমরা তো চাফু-মায়ার মৃত্যুর কথা ভাবতেই পার না তবে তাকে কি করে মারবে ? বিষ খাইয়ে ?
না মুশুগু, ঐ যমজ বোনের বাবা ছাড়া আর কারও অধিকার নেই। চাফু-মায়াকে সে একাই মারবে।
তুমি বলছ কি কাপালালো। একজন দক্ষ শিকারী যার রাইফেল আছে তেমন একজন হলেও না হয় কথা ছিল তা বলে একজন মানুষ অতবড় একটা কুমিরকে কি করে মারবে ?
একা ? বাজে কথা।
বাজে কথা কিনা আর কয়েক দিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন। তবে সত্যি কথা বলতে কি আমি নিজেও জানি না ওদের বাবা নাগুরা-গুরা একা কি করে মারবে ? নাগুরা-গুরা তেমন মজবুত লোক নয়। তীর ছুঁড়ে কোনো বড়ো প্রাণীও হত্যা করতে পারে নি। তবে সে রোজ সর্দারের বাড়িতে যায়। দরজা বন্ধ করে দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে কিসব পরামর্শ করে। সর্দারের বাড়ির লাগোয়া একটা ঘরে কামাররা কিছু একটা তৈরি করছে। আওয়াজ পাওয়া যায়। কামারদের বাইরে আসতে দেওয়া হয় না। সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে।
আমি বলি কামাররা কি আর তৈরি করবে ? নিশ্চয় বর্শা তৈরি করছে। কিন্তু তুমি নাগুরা-গুরার যে বর্ণনা দিলে তাতে কি বর্শা দিয়ে সে চাফু-মায়াকে মারতে পারবে।
কাপালালো আমাকে অবাক করে আর একটা কথা বলল। প্রধান গুণিন নাকি বলেছে চাফু-মায়া এখন নিজেই মরতে চায়। তার বিস্তর হয়েছে, ওজন অনেক বেড়ে গেছে, মোটা হয়ে গেছে। নড়াচড়া করবার দ্রুত গতি সে হারিয়েছে। কুমিরের বাচ্চাও ধরতে পারে না। একমাত্র মানুষ ছাড়া সে আর কিছু খেতে পারে না কিন্তু মানুষ তো রোজ পাওয়া যায় না। তাই চাফু-মায়াকে প্রায়ই অনাহারে কাটাতে হয়।
আমি বলি, তা বটে, দাঁতও তো পড়ে গেছে বোধহয়। হাড় চিবোতেও পারে না বোধহয় তা চাফু-মায়া যে দেহভার সহ্য করতে না পেরে এখন মরতে চায় এ খবর তোমার কানে কে পৌঁছে দেয় নি।
চাফু-মায়া গুণিনকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে এসব কথা বলেছে আর সে কি ভাবে মরবে বা কি অস্ত্র দিয়ে তাকে মারতে হবে সে কথাও নাকি চাফু-মায়া গুণিনকে বলে দিয়েছে।

নাগুরা-গুরাকে একদিন দেখলুম। এই লোক কুমির মারবে ? এ বোধহয়

মেছো কুমিরও মারতে পারে না। গায়ে যে জোর আছে তা দেখে বোঝা গেল না, কত বয়স তাও বোঝা গেল না তবে দেখলুম লাফাতে ঝাঁপাতে পারে, জোরে দৌড়তেও পারে।
আমি কিছুই বুঝতে পারি না তবে আমি নিশ্চিত হই যে চাফু-মায়ার একটা ভোজ তৈরি হচ্ছে।
আরও শুনলুম যমজ বোন দুটি চাফু-মায়ার নরক পেট থেকে মুক্তি পেয়ে এমন এক রাজ্যে যাবে যেখানে তারা সুন্দরী হবে, নির্ভয়ে যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াতে পারবে, খাবার কোনো অভাব হবে না। তারপর একদিন দুই যমজ রূপবান ভাই দুই বোনকে বিয়ে করবে।
আফ্রিকায় বিভিন্ন অঞ্চলে আদিবাসীদের মধ্যে আমি অনেক লোককথা শুনেছি। আমার সংগ্রহ অনেক। তার সঙ্গে আরও একটি লোককথা যোগ হলো। আমি এখন সেই অনুষ্ঠানের দিনটির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম।
ইতিমধ্যে আমি নাগুরা-গুরাকে কয়েকবার দেখেছি। তার স্বাস্থ্যের যেন উন্নতি হয়েছে। সাহস বেড়েছে। এখন সে রোজ তেল মাখে। তেলচুকচুকে কালো নগ্ন দেহটি দেখতে ভালোই লাগে। আমি ক্যামেরায় ওর ছবি তুলে রাখি।

পরদিন সকাল থেকে মেয়ের দল কলাপাতা ও তার বোঁটার ছেঁড়া তন্তুর ঘাগরা পরে মাথায় পালকের টুপি পরে জলপাত্র নিয়ে সারিবন্দী ভাবে গান গাইতে গাইতে নদী থেকে কয়েক দফা জল বয়ে এনে নিজ নিজ বাড়ির বড়ো বড়ো জলপাত্রগুলি ভরতে লাগল। সঙ্গে বাজনার দলও ছিল।
এই শোভাযাত্রা তিনদিন চলল।
চতুর্থ দিনে মনে হলো গ্রাম বুঝি শূন্য। কুটির ছেড়ে কেউ বাইরে এল না। মাতুঙ্গা সরকার নিষেধ করেছে, কেউ বাইরে বেরোবে না। নদীর ধারে যখন তারা মুশুঙ্গুর বন্দুকের আওয়াজ শুনবে তখন তারা দল বেঁধে নদীর ধারে যাবে তার আগে নয়।
তবুও একটা ছোট শোভাযাত্রা বেরলো। বাঁশের মাচা বাঁধা হয়েছে। এরকম ছ'টি মাচায় দুজন করে কুমারী মেয়ে বসে আছে। পরণে তাদের কলাপাতা ছেঁড়ার ঘাগরা, মাথায় পালকের টুপি। চারজন করে যুবক বাঁশের মাচাগুলি কাঁধে তুলে বয়ে নিয়ে চলল। মেয়েরা একঘেয়ে সুরে গান গাইছে। সঙ্গে চারজন বাজাতে বাজাতে চলল।
ওদের আগে আগে চলল নাগুরা-গুরা, সর্দার মাতুঙ্গো, দুজন ছোকরা, একজনের হাতে একটা নধর সাদা ছাগল আর একজনের হাতে লম্বা দড়ি।
কাপালালো একসময়ে এসে আমাকে জানিয়ে গিয়েছিল যে আমি যেন রাইফেল

নিয়ে প্রস্তুত থাকি। আমাকেও যেতে হবে। কাপালালো আমাকে এসে ঠিক সময়ে ডেকে নিয়ে যাবে। আমার রাইফেল সেই বয়ে নিয়ে যাবে।

শোভাযাত্রা রওনা হবার পনেরো মিনিট পরে কাপালালো আমাকে ডেকে নিয়ে চলল।

নদীর ধারে পেঁছে দেখলুম নদীর ধারে জলের কাছে একটা ছোট গাছতলায় নাগুরা-গুরা উবু হয়ে বসে আছে। তার পাশে সাদা ছাগলটা। একটা দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে। নাগুরা-গুরা গায়ে কি একটা তেল মেখেছে, যে তেলের গন্ধে কুমির আকৃষ্ট হয় না কিন্তু ছাগলের গন্ধে কুমির আকৃষ্ট হয়। ছাগলটা মাঝে মাঝেই ব্যা ব্যা করে ডাকছে।

চাফু-মায়া বা একটাও কুমিরের দেখা নেই। চাফু-মায়া ও অন্যান্য কুমিররা নাকি তখন পাশের জলায়।

সেই বারোটি কুমারি দু দলে ভাগ হয়ে সার দিয়ে গান গাইতে গাইতে নদীতে নেমে পড়ল। উদ্দেশ্য বোধহয় কুমির আকৃষ্ট করা। নিরাপদ একটা দূরত্বে গিয়ে মেয়েরা তাদের কলাপাতার ঘাগরা খুলে জলে ভাসিয়ে দিলো। ঘাগরা-গুলো যখন জলে ভাসতে ভাসতে জলার দিকে গেল তখন মেয়েরা জল থেকে উঠে এল। তারপর মেয়ের দল, যুবক ও বালকদের দল গ্রামে ফিরে গেল।

ঐসব কলাপাতার ঘাগরা থেকে নাকি বিশেষ একরকম গন্ধ বেরোয় যা কুমিরের নাকে লাগলে তারা বুঝতে পারে নদীতে মানুষ এসেছে। তাহলে মেয়েদের নদীতে নামাবার দরকার কি? অনেক ঘাগরা জলে ভাসিয়ে দিলেই তো হয়। না তা হয় না, কারণ চাফু-মায়া হলো দেবতা। তাকে এইভাবে আকৃষ্ট করতে হয়।

নদীর ধারে আমরা চুপ করে বসে। এখন কথা বলা নিষেধ। ছাগলটাই নীরবতা ভঙ্গ করছে।

সূর্য তখন বেশ ওপরে উঠেছে। বেশ কড়া রোদ। সকলে অপেক্ষা করছে কখন চাফু-মায়া দেখা দেবে। কিন্তু চাফু-মায়া আজ যদি না আসে?

আমি চুপি চুপি কাপালালোকে জিজ্ঞাসা করি। সে বলে গুণিন বলেছে আজ আসবেই। পৃথিবীতে আজই তার শেষ দিন। আমি ভাবি যদি আসে তো ছাগলের জন্যে আসবে। এখন দেখা যাক কি হয়।

একটা ঘন গাছের নিচে ছায়ায় কাপালালো তখন আমার বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। মাতুঙ্গো আমার পাশে এসে দাঁড়াল তারপর কনুই দিয়ে আমাকে স্পর্শ করে নদীর দিকে আঙুল বাড়াল। হ্যাঁ আসছে। মাথা ভাসিয়ে বিরাট একটা কুমির জলে ভেসে এগিয়ে আসছে। সত্যিই বিরাট। এত বড় কুমির আমি দেখি নি। না দেখলে বিশ্বাস করতুম

না। ছাগলের ডাক ও ছটফটানি বেড়ে গেল। সকলে নড়েচড়ে বসল।
কুড়ি গজ দূরে থাকতে মাতুঙ্গো একটা অস্ত্র নাগুরা-গুরার হাতে তুলে দিলো।
এটা এতক্ষণ আমি দেখতে পাই নি। ইতিমধ্যে নাগুরা-গুরা তার কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত পাতলা চামড়া দিয়ে কয়েক পাক বেশ মজবুত করে মুড়ে বেঁধে ফেলেছে।

অস্ত্রটা দুমুখো বা ডবল ছোরা। রোদ পড়ে ঝলসে উঠল। মাঝখানটা সরু। সেই সরু অংশে দড়ি বাঁধা। দড়ির অপর প্রান্ত একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে মজবুত করে বাঁধা।

নাগুরা-গুরা অস্ত্রটা বেশ মজবুত করে ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। কি করবে আমি বুঝতে পেরেছি। চাফু-মায়া গতি বাড়াল। জলের ধারে এসে গেছে। ছাগল এখন কাঁদছে।

আমি আর কাপালালো উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে কাঁপছি। কি হয় কি হয়? কে জেতে? নাগুরা-গুরা না চাফু-মায়া?

চাফু মায়া প্রায় ডাঙায় উঠে পড়েছে আর বিরাট হাঁ করে ছাগলটা গিলতে এসেছে আর নগুরা-গুরা চকিতে সেই দু-মুখো ছোরা মুখের ভেতর খাড়া করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। চাফু-মায়াও সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করেছে। আমি ভাবলুম যাঃ গেল, নাগুরা-গুরার ডান হাতটাই গেল। কিন্তু না, নাগুরা-গুরা তার ডান হাত বার করে নিয়েছে। অক্ষত, এক ফোঁটাও রক্তপাত হয় নি।

তারপর সে কি বীভৎস দৃশ্য। কুমির মুখ পুরো বন্ধ করতে পারছে। যত চেষ্টা করছে ছোরা তত বেশি বিঁধে যাচ্ছে। তার বিরাট লেজের ঝাপটায় জলে যেন ফোয়ারা উঠছে। চাফু-মায়া জলে আছাড়ি-পিছাড়ি করছে। রক্তে জল লাল। তার দুর্দশা দেখে কুড়ি পঁচিশটা কুমির কোথা থেকে ধেয়ে এসে তাকে আক্রমণ করল। চাফু-মায়া তাদের ওপর অনেক অত্যাচার করেছে, তাদের অনেক বাচ্চা খেয়েছে।

চাফু-মায়ার এই যন্ত্রণা আমার সহ্য হচ্ছিল না। আমি এগিয়ে এসে তার দুই চোখের মাঝখান লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লুম এবং সঙ্গে ছোরা ও গাছের সঙ্গে বাঁধা দড়িটার টান পড়ল যা আমার পায়ে এমন ধাক্কা মারল যে আমি জলে পড়ে গেলুম। রাইফেল তো আগেই আমার হাত থেকে ছিটকে পড়েছে।

জল সেখানে গভীর না হলেও আমি ডুবে গেলুম। নিচে ছিল পাথর। হাবুডুবু খেতে খেতে ও অনেক জল গিলে আমি কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালুম। আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। কুমিরের পাল আমাকে ছিঁড়ে ফেলল বুঝি।

সেই সময়ে দেখি কাপালালো, গাছের একটা ডাল আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছে। কাপালালোকে আরও দুজন হাত বাড়িয়ে ধরে আছে। প্রথম লোকটি গাছের গুঁড়ি ধরে আছে।

গাছের ডালের পাতাগুলো আমার হাতে লাগল। ধরলুম, কিন্তু পাতা ছিঁড়ে গেল। পড়ে যাচ্ছিলুম, কোনো রকমে টাল সামলে নিয়ে এবার ডালটা ভালো করে দু' হাত দিয়ে ধরলুম। আমার তখন শোচনীয় অবস্থা, গা থরথর করে কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। ওরা আমাকে ওপরে তুলল। ওপরে উঠে কাদায় পড়ে আমি অজ্ঞান।

যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আমি আমার তাঁবুতে শুয়ে। আমার প্রথম প্রশ্ন, আমাকে কুমিরে ধরল না কেন?

কাপালালো বলল, বওয়ানা আপনার বন্দুকের আওয়াজে কুমিরের ঝাঁক প্রথমে পালিয়ে গিয়েছিল। সেই ফাঁকে আমরা তোমাকে তুলতে পেরেছিলুম। দড়ি টেনে চাফু-মায়াকেও তোলা হয়েছিল। পরে কুমিরের ঝাঁক আবার ফিরে এসে নিরাশ হয়েছিল।

চাফু-মায়ার পেট চিরে তার ভেতর থেকে বেরিয়েছিল যমজ দুই বোনের একজনের হাতির দাঁতের একটা বালা। আর একজনের তামার হার, সোনার ঘড়ি ও চেন, ক্যামেরার লেন্স এবং রুপোর একটা ক্রশ। একজন পাদ্রী ধর্ম প্রচার করতে এসেছিল। তাকে বোধহয় চাফু-মায়াকে শান্ত করবার জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল।

এই সব সামগ্রীগুলি নাকি গ্রীক ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে পরিবর্তে ছাগল নেওয়া হবে।

এই সব রিপোর্ট শুনতে শুনতে আমার তখন ঘুম পাচ্ছিল। মাতুঙ্গো এক পাত্র পানীয় আমার হাতে দিয়ে বলল, খেয়ে নাও, ক্লান্তি দূর হবে, ঘুম হবে। জানি না কিসের পাঁচন কিন্তু সুস্বাদু।

পরদিন যখন ঘুম থেকে উঠলুম বেশ তাজা মনে হলো।

বুনোমোষ না যমবাহন ?

যে সব মহিষ, মানুষ গৃহপালিত করে রাখে, তাদের দিয়ে গাড়ি টানায় বা তাদের দুধ পান করে যা মহিষ, ভঁইস বা বয়েল নামে সাধারণতঃ পরিচিত আমি সেসব মহিষের কথা বলছি না। আমি বলছি বুনো মোষের কথা, বিদেশী ভাষায় আমাদের কাছে যা বাফেলো নামে পরিচিত।

আফ্রিকার গভীর অরণ্যে আমার অনেক দিন কেটেছে। বনে বনে অনেক ঘুরেছি, অনেক হিংস্র পশুর মুখোমুখি হয়েছি কিন্তু বুনো-মোষকে আমি এখনও ভয় করি। আমার সকল পেশী টানটান হয়, রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়।

বুনোমোষের পাল সে যে কি সাংঘাতিক তা বর্ণনা করে আমি বোঝাতে পারব না। শত শত বুনো মোয যখন ধুলো উড়িয়ে আকাশ অন্ধকার করে ছুটে আসে তা সিনেমা বা টেলিভিসনের পর্দায় দেখতে যতই মনোরম হয় বাস্তবে তা রণক্ষেত্রে গোলাবর্ষণের সমান। এদের জাতভাই বাইসন একদা উত্তর আমেরিকার প্রান্তর কাঁপিয়ে ছুটে বেড়াত।

অরণ্য থেকে দূরে থাকলেও ওদের ক্ষুরের শব্দ আমাকে গভীর রাত্রে বিচলিত করে যেমন বিচলিত করে সিংহগর্জন। বুনোমোষের পালের সামনে পড়লে রক্ষা নেই। বুনোমোষকে আমি কেন এত ভয় করি সেই কথাই বলি। তখন আমার বয়স কম, আফ্রিকায় সবে যেতে শুরু করেছি সেই সময়ে হাড়-কাঁপানো একটা ঘটনা ঘটেছিল।

তখন আমার বয়স কুড়ি পার হয়েছে। আফ্রিকার অরণ্য সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী। শিকার, জীবজন্তু ও আফ্রিকার মানুষদের সম্বন্ধে বই পড়ি। চিড়িয়াখানায় গিয়ে পশুদের লক্ষ্য করি। কল্পনা বা বাস্তবে যে আকাশপাতাল তফাত তা তখনও আমার মাথায় ঢোকে নি।

বিখ্যাত শিকারীদের শিকার-কাহিনী পড়ে মনে হয়েছে তো আর এমন কঠিন কি ? একটা তাঁবু, দুটো ঘোড়া, ভালো রাইফেল, প্রচুর গুলি যথেষ্ট খাবার আর একজন স্থানীয় গাইড থাকলে হাতি, গণ্ডার, সিংহ শিকার করা এমন কি শক্ত ?

আফ্রিকার অরণ্যে যে ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আছে, শত শত জোঁক আছে, বিষাক্ত কতরকম কীটপতঙ্গ আছে আর আছে সরু মোটা ছোট বড় কতরকম সাপ আছে। আর তারা যে বাঘ সিংহ অপেক্ষা বেশি ক্ষতি করতে পারে. সেসব আমার মাথায় আসে নি। আর বুনো-মোষের পাল তখনও আমার মাথায় ঢোকে নি।

একদিন আফ্রিকায় গিয়ে পৌঁছলুম। তখন যে অঞ্চল অ্যাংলো-ইজিপশিয়ান

সুডান নামে পরিচিত ছিল সেই অঞ্চলে আমাকে কিছু করার জন্যে পাঠানো হয়েছিল। সে অঞ্চলের অরণ্য তখন অনেক পাতলা হয়ে গেছে, বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর।

নীল নদের ধারে খার্তুম শহরের এক স্টিমারঘাটে স্টিমার থেকে একদিন নামলুম। স্টিমার থেকে নামার পর কিছু দূর যেতে না যেতে এক আরবী গাইড আমাকে পাকড়াও করল। পরনে নিভাঁজ বিলিতি স্যুট, মাথায় ফেজ, ওয়েলকাম টু খার্তুম বলে আমার সঙ্গে আলাপ জমাল।

টমাস কুক মারফত আমি আগেই হোটেল বুক করে রেখেছিলুম। আরবী গাইড তার নাম বলল মহম্মদ আলি। সে নিজেই আমার মালপত্তর ট্যাকসিতে বোঝাই করে আমাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার আগে জানিয়ে গেল যে তার তুল্য গাইড বা সাহেবের সাফারির যাবতীয় আয়োজন করার মতো লোক সারা সুডানে দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি যেন কারও ধাপ্পায় বিশ্বাস না করি ইত্যাদি ইত্যাদি। সে পরে আসছে। ইতিমধ্যে সাহেব যেন অন্য কোনো গাইডের সঙ্গে কথা না বলেন আর তার রেটও খুব কম।

তখন আমি সবে তারুণ্য পার হয়ে যৌবনে পা দিয়েছি। স্বাভাবিক ভাবেই রক্ত গরম। সুডানে আসবার আগে আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রচুর বই পড়েছি। আফ্রিকায় এসেছেন এমন অনেকের কাছে আফ্রিকা সম্বন্ধে অনেক কাহিনী শুনে এসেছি। এদেশবাসী কোনো কোনো শ্বেতকায় ভদ্রলোক যেচে আমাকে অনেক উপদেশ দিতে লাগলেন যার আমি সব বিশ্বাস করি নি, কারণ আমি যেসব বই পড়ে এসেছি সেসব বই অন্য কথা বলে তবে তাদের একটা উপদেশ বিশ্বাস না করে আমি ঠকেছিলুম।

ওরা সকলেই আমাকে বলেছিলেন, কাকে, মহম্মদ আলিকে তোমার গাইড নিযুক্ত করেছ? ও তোমার সাফারির ব্যবস্থা করবে? খবরদার, ওর কোনো কথা বিশ্বাস কোরো না, ও কখনও খার্তুমের বাইরে যায় নি, চিড়িয়াখানা ছাড়া কোনো জন্তু দেখে নি তবে রাস্তায় কুকুর, বেড়াল ঘোড়া দেখেছে। কত রেট বললে? আরে না না, ওর অর্ধেকের বেশি একটাও পয়সা বেশি দিয়ো না।

এসব কথাও তখন বিশ্বাস করি নি। কারণ মহম্মদ আলি দারুণ বাকপটু। ইংরেজিটাও ভালোই বলে। সে যে আমাকে বিপদে ফেলবে তা আমি তখন ভাবতেও পারি নি। কি ভুলই না করেছিলুম!

অভিযানে যাবার জন্যে ছোটোখাটো একটা দল তৈরি হলো। আমি আর আলি দুজনে দুটো ঘোড়ায় চড়লুম। সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে যথাসম্ভব নেওয়া হলো। তারপর আমরা ফুং প্রদেশে এসে পড়লুম। আমরা প্রাদেশিক শাসনকর্তার ভবনে আশ্রয় গ্রহণ কবলুম এবং একটা সুসংবাদ শুনলুম। নাকি দুঃসংবাদ!

কিছু দূরে কয়েক মাইল ব্যাপী জলাভূমি আছে। সেই জলাভূমির কাছে বিরাট একটা বুনোমোষের দল দেখা গেছে। জলাভূমিটা গভীর নয়, হ্রদের মতো একটানাও নয়। মাঝে মাঝে জমি মাথা বা পিঠ তুলে আছে। সেখানে গাছপালাও আছে। জলাতেও গাছ আছে। গাছে অজস্র পাখি ও প্রজাপতি। জলায় সাপ বা অন্য জলজ প্রাণী থাকতে পারে কিন্তু কুমির নেই। অঞ্চলটা বেশ গরম।

একজন বলল, দলে অন্ততঃ ৮০০ বুনোমোষ আছে। বুনোমোষের দল দূরের কথা একটা প্রাণীর কাছেও কেউ যেতে সাহস করে না, তাহলে তার মৃত্যু অবধারিত। তাঁকে বেঁচে ফিরে আসতে হবে না। বুনোমোষের পালের কাছে গিয়ে কেউ জীবন্ত ফিরে এসে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছে এমন লোকের দেখা পাওয়া যায় নি।

শত শত বুনোমোষ ছুটে আসছে সে দৃশ্য নাকি দারুণ উপভোগ্য। অনেক এমন দৃশ্য দূর থেকে দেখেছে। সে দৃশ্য যেমন উপভোগ করা যায় তেমনি ভয়ও হয়। যদি ওরা নির্দিষ্ট পথ ভুলে দর্শকের দিকে ছুটে আসে?

এই অঞ্চলে ওদের দেখা যাচ্ছে ভোরে ও সন্ধ্যায় যখন ওরা জলায় জলপান করতে আসে। তবে আমরা যেখানে আছি সেখান থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে ওরা আসে।

আলি আমাকে পরামর্শ দিলো বুনোমোষের পাল দেখবার জন্যে আমরা কাল ভোরেই যাত্রা করব। ইতিমধ্যে সে আমার তদারকি করবার জন্যে একজন রাঁধুনী, একজন ভৃত্য এবং কয়েকজন মালবাহী নিযুক্ত করেছে। যা করেছে তা অবশ্য ভালোই করেছে। তখনও পর্যন্ত তার প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট আছে কিন্তু সে যে বাকসর্বস্ব, অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ তা পরদিনই অত্যন্ত মর্মান্তিক-ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল।

যে লোকগুলিকে আলি নিযুক্ত করল তাদের ভাষা আমি একটুও বুঝতে পারি নি। আমার মনে হলো তারা কাজ করতে অনিচ্ছুক বা যে কোনো কারণে হোক ভীত।

মহম্মদ আলিকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম ওরা কি বলছে? আলি আমাকে ভরসা দিয়ে বলল, ঘাবড়াবেন না, ওরা খুশি এবং এত বেশি বেতন তাদের নাকি আগে কেউ দেয় নি।

মহম্মদ আলি দুটো বেশ মজবুত আরবী টাট্টু ঘোড়া যোগাড় করেছিল। বলে-ছিল বুনোমোষগুলো নাকি এই ঘোড়ার চেয়ে আকারে বড়ো। তা হতে পারে তবে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বুঝলুম যে বেশ মজবুত। আমরা দু'জনে দুটো ঘোড়ার পিঠে চড়লুম। আমাদের সঙ্গে আমাদের লোকজনও চলল, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। তাঁবু, রাইফেল ও অন্যান্য সরঞ্জাম তারা

বয়ে নিয়ে চলল। তবে আমরা যতই এগিয়ে যাচ্ছি তাদের গতিও ততো মন্থর হচ্ছে এবং বিশ্রামের সময়ও দীর্ঘতর হচ্ছে।

প্রথম দিন ও রাত্রি নির্বিঘ্নে কাটল। দ্বিতীয় দিন ও রাত্রে কোনো ঘটনা ঘটল না, কিন্তু তৃতীয় রাত্রের পর ভোরে তাদের একজনেরও টিকি দেখা গেল না। তারা পালিয়েছে।

মহম্মদ আলি বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি ব্রেকফাস্ট আর চা তৈরি করছি তারপর বেরিয়ে পড়ব। আজ দুপুরেই আপনি ওদের দেখা পাবেন, একটা মস্ত বড় মাথা আপনাকে আমি উপহার দোব, হ্যাঁ বিরাট দুটো শিং সমেত। উপহার দোব মানে আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখান থেকে আপনি সহজেই এক গুলিতে সেই বড় মাথার মালিককে ঘায়েল করতে পারবেন।

আমি বলি, সবই তো বুঝলুম কিন্তু আমি যদি একটা বাফেলো মারতে পারি সেটা কে বয়ে আনবে আর এই তাঁবু গুটিয়ে মালপত্তরই বা কে নিয়ে যাবে?

মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করে মহম্মদ আলি বলল, ফুঃ একদম ভাববেন না। মহম্মদ আলি আছে কি করতে? আমি সব ঠিক করে দোব না। না পারলে আপনি আমার নামে কুকুর পুষবেন।

সে তখন ঘোড়া এনে তার পিঠে চড়বার ব্যবস্থা করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু চললে কোথায়? তুমিও পালাচ্ছ নাকি?

জিভ কেটে মহম্মদ আলি বলল, এটা কি বললেন স্যার? আমি কি বেইমান, নিমকহারাম, আপনার টাকা খাই নি। পালাই নি, আমি আগাম গিয়ে দেখে আসি বুনোমোষের পাল কত দূরে এবং কি অবস্থায় আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন। মহম্মদ আলি আমাকে যাই বলুক আমি বেশ বুঝতে পারলুম সে আমাকে ফেলে পালাচ্ছে। নিরাশ হলেও কোনো উপায় নেই। খার্তুমে বন্ধুদের উপদেশে কান দিই নি কেন?

এদিকে শমন কখন নিঃশব্দে এসে অলক্ষ্যে অপেক্ষা করছে আমি তা টের পাই নি। মহম্মদ আলি কি তাই টের পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে?

যূথভ্রষ্ট বেশ বড় সাইজের একটা বুনোমোষ গাছের আড়ালে কখন এসে গিয়েছিল তা আমি অন্ততঃ জানতে পারি নি। কুচকুচে কালো মোষটা বনের অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

বুনোমোষের মূল দল যা আমরা দেখতে এসেছি তা তখনও অনেক দূরে। সকলে যাত্রা করলে সন্ধ্যার আগে ফিরে আসা সম্ভব নয়। তবুও মহম্মদ আলি তখন কোথায় যাচ্ছিল? সত্যিই কি সে বুনোমোষের পাল দেখতে যাচ্ছিল নাকি পলায়ন করছিল।

তার মতলব যাই থাকুক তাকে যে যম তাড়া করেছে তা আমি ভাবতেই পারি

নি। আমি পড়েছি বা শুনেছি যে বুনো মোষকে বিরক্ত না করলে বা তাড়া না দিলে তারাও কাউকে আক্রমণ করে না। কিন্তু এই একক বুনো মোষটা কেন ক্ষেপে গেল তা আমি জানি না।

মহম্মদ আলি বুনোমোষটা দেখতে পায় নি। সেটা ছিল গাছের ছায়ান্ধকারে শ'তিনেক ফুট দূরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু আলি যেই টাট্টুতে উঠে চলতে শুরু করেছে অমনি আমাকে চমকে দিয়ে বুনো মোষটা তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে ঘোড়াটার পেটে তার শিং ঢুকিয়ে দিয়ে আলি সমেত সেটাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। আলি ছিটকে পড়ল আর তার ওপর পড়ল ঘোড়াটা। আলি ওঠবার সুযোগ পেল না। বুনোমোষ তাকে আক্রমণ করে তারও দেহে বার বার শিং-এর খোঁচা দিয়ে আক্রমণ করতে লাগল। আলির সে যে কি মর্মভেদী ক্রন্দন তা মনে পড়লে আজও আবার বুক কেঁপে ওঠে।

তাঁবু থেকে আমি আমার রাইফেল আনবার আগেই এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল। আমি গুলি করে পশুটাকে মেরে ফেললুম, কিন্তু বেচারা আলি তার আগেই মরে গেছে, ঘোড়াটাও গেছে।

আমার ধারণা ছিল এই বনে বুঝি মানুষ নেই। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই চার পাঁচজন পুরুষ এসে গেল। তাদের হাতে ছোট কুঠার ও ছোরা জাতীয় অস্ত্র। বুঝলুম তারা এসেছে মাংসর লোভে।

তাদের ভাষা বুঝি না কিন্তু ইশারায় বুঝিয়ে দিলুম আমার তাঁবু ও সরঞ্জাম লাটপ্রাসাদে পৌঁছে না দিলে তাদের মাংস খেতে তো দোবই না উলটে গুলি করে মারব।

তাদের মধ্যে একজন একটা গাছে উঠে হাঁক দিতে আরও পাঁচ সাতজন মানুষ এসে গেল। তাদের সঙ্গে কি কথাবার্তা হলো। তারা আমার সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে কাঁধে তুলে নিল। বাকিরা মোষের ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত হলো। আমি তাদের ইঙ্গিতে বললুম শিং জোড়া যেন লাটপ্রাসাদে আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তারা কথা রেখেছিল। আমিও তাদের মালপত্র সমেত লাটপ্রাসাদে পৌঁছেছিলুম।

বুনো মহিষের প্রতি আমার এই প্রথম মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা এই পশুর প্রতি আমার ঘৃণা ও ভীতির উদ্রেক করল। সেই থেকে এই পশুটির প্রতি আমার কোনো আগ্রহই রইল না। পারলে এই পশুটিকে আমি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি। পরবর্তী জীবনে আমি সিংহ, গোরিলা ও গণ্ডারের মোকাবিলা করেছি কিন্তু কি জানি কেন বুনো মোষ দেখলে আমার এখনও ভয় হয়। পশুটিকে দেখলেই বেচারা মহম্মদ আলির রক্তমাখা বীভৎস মৃতদেহটি মনে পড়ে যায়।

প্রাণিতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন দেশের বুনোমোষকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

বুনোমোষ প্রায় পৃথিবীর সর্বত্র দেখা যায়। তারা যেমন দীর্ঘাকায়, শক্তিশালী ক্ষিপ্র তেমনি একগুঁয়ে। রং প্রায়ই কালো, লোম অল্প ও ছোট। বুড়ো হলে ঐ লোম টুথব্রাশের মতো খোঁচা হয়ে যায়। এক একটা বাফেলোর ওজন হয় হাজার থেকে তেরশ পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্যন্ত। ঘাড় পর্যন্ত উচ্চতা পাঁচ ফুট বা তারও বেশি। কান বেশ বড় তবে এদের বৈশিষ্ট্য হলো এদের শিংজোড়া। দুটো শিংয়ের ডগার মধ্যে তফাৎ ৫৭ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। এক একটা শিং তিন ফুট পর্যন্ত হয়। শিং-এর ডগা খুব ছুঁচলো হয় কিন্তু খোঁচাখুঁচি করতে করতে ক্রমশঃ ভোঁতা হতে থাকে। গৃহপালিত মহিষ বা অন্য গবাদি পশু অপেক্ষা অরণ্যের বুনোমোষ অনেক বেশি দিন বাঁচে। তাদের গড় আয়ু তিরিশ বছর।

বুড়ো বয়সে এদের দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। এদের শক্তি ও গতিবেগ কমে যায় তখন যুবকেরা এদের দলে রাখতে চায় না। তখন তারা বনে বনে একাই ঘুরে বেড়ায় তিরিক্ষি মেজাজ নিয়ে। পুরুষ পশুরা স্ত্রী-পশুদের নানাভাবে নির্যাতন করে।

একা একা বনে ঘুরে বেড়ায়, নিঃসঙ্গ জীবন, হতাশা, শক্তিহ্রাস এবং অন্য পশু কর্তৃক অবহেলা ওদের মেজাজ রুক্ষ করে। যে বুনো মোষটা মহম্মদ আলিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল সেই পশুটা বোধহয় ঐ রকম নিঃসঙ্গ ছিল।

গাছপালা, ঝোপঝাড় ও লম্বা ঘাস ঘেরা বিস্তৃত জলাভূমি এদের পছন্দ। দারুণ গ্রীষ্মে এই জলাভূমিতে এরা গা ডুবিয়ে থাকতে খুব ভালবাসে। এই জলাভূমির জল এদের তৃষ্ণাও নিবারণ করে।

যেদিক থেকে বাতাস বয়ে আসে তার বিপরীত দিকে এরা তৃণভূমিতে বিচরণ করতে ও ঘাস খেতে ভালবাসে। এই সময়ে নাকি দলের ভীমসদৃশ বলশালী পশুগুলি চারপাশে থেকে দলকে পাহারা দেয়। বিপদের আভাস পেলেই দলকে সতর্ক করে দেয়।

এক একটি দলে দুশো থেকে তিনশ বুনোমোষ থাকতেই পারে। আমি ও মহম্মদ আলি সেদিন ফুং প্রদেশে বুনো মোষের যে পাল দেখবার জন্যে যাত্রা করেছিলুম। পরে শুনেছিলুম সেই দলে নাকি আটশ পশু ছিল। উত্তর রোডেশিয়ার কাফুয়ে এবং জাম্বেসি নদীর মাঝে উপত্যকায় আরও বড় দল দেখা যায়।

একদা যে অঞ্চল বেলজিয়ান কঙ্গো নামে পরিচিত ছিল অর্থাৎ কঙ্গোর যে অঞ্চলটা বেলজিয়ম সরকার দখল করে শাসন করত সেই অঞ্চলে খাটো জাতের লোমশ এক জাতের বুনোমোষ পাওয়া যায় বলে শুনলুম। সেই বুনো মোষ-গুলি উচ্চতায় মাত্র তিন ফুট। উপজাতিরা নাকি সেই মোষ ধরে এনে পোষ

মানিয়ে দুধ দোয়।
এরকম পিগমি বুনোমোষ দেখতে আমার খুব আগ্রহ হলো। সেই বুনোমোষ খোঁজবার সময় শুনলুম এই জঙ্গলে ওকাপি নামে কয়েকটা বিরল প্রাণী আছে। ওকাপিগুলোর গায়ে জেব্রার মতো ডোরাকাটা থাকে। হরিণ ও জেব্রার মাঝামাঝি একটা জীব। ডোরাকাটা নীলগাই বলা যেতে পারে।
ওকাপি আমি তো দেখিই নি, সভ্যজগতে কোনো মানুষও তখনও দেখে নি। অত্যন্ত বিরল প্রাণী। এমন প্রাণী যদি দু' তিনটে ধরতে পারা যায় তাহলে বিদেশের চিড়িয়াখানারা মোটা দামে নিশ্চয় কিনে নেবে, আমারও প্রচুর লাভ হবে।
আমার সঙ্গে কয়েকজন হাঁকোয়া ছিল। তারা জন্তুর শব্দ অনুকরণ করে অথবা অন্যভাবে শিকারকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসে তারপর হয় তাকে গুলি করে মারা হয় অথবা ধরা হয়। আমার হাঁকোয়ারা দুটো ওকাপি ঘিরে ফেলল। কি করে দড়ির ফাঁস লাগিয়ে সেগুলোকে ধরব বলে মতলব আঁটছি এমন সময় সে দুটো আমাকে ও কয়েকজনকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়ে বনের ভেতরে পালিয়ে গেল। গভীর অরণ্যে তারা যে কোথায় লুকলো তাদের আর খুঁজে পাওয়া গেল না।
তবে পরে আমি ওকাপি ধরেছিলুম এবং লণ্ডন জুকে বিক্রি করেছিলুম। সভ্য মানুষদের এই বিচিত্র প্রাণী দেখবার কৃতিত্ব আমারই। কঙ্গো বঙ্গো নামে অনুরূপ একটা প্রাণী আছে। তাদের গায়ের ডোরা অন্যরকম, আকারেও কিছু ছোট।

বুনোমোষ কিন্তু আমার মাথা থেকে নামেনি। ফুং অঞ্চলে আপাততঃ যাওয়া যাবে না তবে বুনোমোষ আর কোথাও দেখা যাচ্ছে কি না সে বিষয়ে আমি খোঁজ খবর করতে করতে ইরুমু নামে শ্বেতজাতির ছোট একটা কলোনিতে হাজির হলুম। হাতির দাঁত, বনজ প্রাণী, বনজ সম্পদ, কাঠ, খনিজ পদার্থ ইত্যাদির ব্যবসা যেসব ইউরোপীয়রা করে তারাই কাঠের বাড়ি করে এই ইরুমু কলোনি স্থাপন করেছে। সেটা তখন ছোটখাটো একটা শহরে পরিণত হয়েছে। বনজ সামগ্রীর আড়ত ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় কয়েকটা দোকানও আছে। এমন একটা দোকান থেকে আমি রুটি মাখন চিজ বিস্কুট বা টিনে ভর্তি কোনো খাবার কিনতুম।
এই দোকানে একদিন এক পাগলা ইংরেজের সঙ্গে আলাপ হলো। পাগলা মানে উন্মাদ নয়। ছিটগ্রস্ত বলা যায়। নাম বলল মিলটন। ছোট বয়সে আফ্রিকায় এসেছে আর দেশে ফিরে যায় নি। হাতির দাঁত আর পশু চামড়ার ব্যবসা করে। কথায় কথায় বলল প্রায়ই সে শিকার করতে যায়।

মিলটন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ব্রাদার তোমার কপালে ওখানটা কাটল কি করে? হাতেই বা ব্যাণ্ডেজ কেন?
দোকানে গিয়েছিলুম জ্যাম কিনতে। তাড়াতাড়ি ছিল। কয়েকখানা জরুরী চিঠি লিখতে হবে কিন্তু মিলটনের পাল্লায় পড়ে গেলুম। ভীষণ বকবক করে। তাকে মহম্মদ আলির মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা, বুনোমোষ ও ওকাপির কথা বলতে হলো। বলতে হলো মানে মিলটন ক্রমাগত জেরা করে আমার পেট থেকে সব কথা টেনে বার করতে লাগল।
জিজ্ঞাসা করল, ওকাপি দেখেছ নাকি? নাকি। আমি দেখি নি। এখানকার লোকেরা বলে ডোরাকাটা নীলগাই। ওকাপি সম্বন্ধে আমার কোনো আগ্রহ নেই তবে বাফেলো, হ্যাঁ, ম্যাজেস্টিক। তবে খুব সাবধান। বাফেলোদের যেমন বুদ্ধি তেমন স্পিড, ঐ দেহ নিয়ে ভীষণ জোরে রেসহর্সের মতো ছুটতে পারে। ওদের স্মরণশক্তি ভীষণ। তুমি যদি ওদের কখনও জখম কর তাহলে ঠিক তোমাকে মনে রাখবে।
মনে মনে চঞ্চল হলেও বুনোমোষ সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা মন দিয়েই শুনছিলুম। আমি প্রশ্ন করলুম, একটা বইয়ে পড়েছি বাফেলো নাকি অ্যাটাক করবার সময় মাথা নিচু করে চোখ বুজে ছুটে আসে?
রাবিশ, সেই বই তুমি পুড়িয়ে ফেল। অ্যাটাক করবার সময় ওরা শিং বাগিয়ে মাথা উঁচু করেই ছুটে আসে আর চোখ বুজবে কেন? রীতিমতো চেয়ে দেখে তার শত্রুকে। বাফেলোর সাহসেরও তুলনা নেই। দে আর ডেঞ্জারাস অ্যানি-ম্যাল, ব্রুট।
একটু থেমে বলল, একটা মজা কি জান? ওরা আগুনকে খুব ভয় পায় আর জলে গা ডুবিয়ে থাকতে ভালবাসলেও দল বেঁধে যখন তেড়ে আসে তখন সামনে সরু অগভীর নদী বা খাল পড়লে কিছুতেই পার হবে না। ওদের আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষের মৃতদেহ কখনও স্পর্শ করে না। মৃতের ভান করে নিশ্বাস বন্ধ করে নিশ্চল হয়েও যদি কোনো মানুষ পড়ে থাকে তাকেও ছোঁবে না। ঘুরে ফিরে কয়েকবার আসবে কিন্তু তাকে ছোঁবে না। একটা মানুষ হয়তো মাটিতে পড়ে আছে, তাকে সিং দিয়ে খোঁচা মারবার জন্যে ছুটে আসবে কিন্তু যেই দেখবে মানুষটা মরে গেছে অমনি ব্রেক কষবে। কয়েক ইঞ্চি মাত্র দূর থেকে তাকে দেখে সেখান থেকে চলে যাবে।
আমার মনে পড়ল। বুনোমোষটা যখন মহম্মদ আলির ঘোড়া আক্রমণ করবার জন্যে ছুটে যাচ্ছিল তখন মাথা উঁচু করেই ছিল।
কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে বুনোমোষ সম্বন্ধে এমন একজন এক্সপার্ট সেই মোষের আক্রমণেই মারা গেল, শেষ মুহূর্তে সে সব নিয়মকানুন ভুলে গেল। লোকে বলে মরণকালে সকলেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়, মিলটনের বোধহয় তাই

হয়েছিল। মাত্র এক সেকেণ্ড। ভুল না করলে সেই এক সেকেণ্ড মাত্র সময় তার প্রাণ বাঁচাতে পারত। কে জানে কার নিয়তি কোথায় ?

বুনোমোষের শিং সম্বন্ধে কোনো একটা কাজ নিয়ে মিলটন তখন আনকোলে অঞ্চলে গিয়েছিল। মোষের শিং তো বিদেশে চালান যায় তাই বোধহয় শিং কিনতেই সে আনকোলেতে গিয়েছিল। অরণ্যে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সে শিং সংগ্রহ করছিল। সঙ্গে ছিল তার পুরানো এক ছোকরা, তার বন্দুক বইত। এই ছোকরাকেই মিলটন বরাবর সঙ্গে নিয়ে যেত।

মিলটন সহসা একদিন একটা বুনোমোষের সামনে পড়ল, একেবারে মুখোমুখি। ছোকরা তার হাতে রাইফেল দেবার আগেই মোষ তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিলো। তবুও মিলটন সামলে নিয়ে হাঁটু গেড়ে উঠে বসল আর সেই ছোকরাও ঠিক সেই মুহূর্তে রাইফেলটা তার হাতে দিলো। রাইফেলটা ঠিকমতো বাগিয়ে ধরবার আগেই মোষটা আবার ছুটে এল। মোষটা তখন এতটা দূরে ছিল যে গুলি চালাবার জন্যে আরও এক সেকেণ্ড অপেক্ষা করা যেত। কিন্তু মিলটন কোনো ঝুঁকি নেয় নি। সে কাঁপা হাতে গুলি চালিয়েছিল, ফলে গুলি মোক্ষম জায়গায় লাগে নি। মিলটন উঠে দাঁড়াবার আগেই ক্ষিপ্ত বুনোমোষ মিলটনকে আক্রমণ করে এবং শিং দিয়ে তার দেহটা ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

আবার সেই পুরানো প্রশ্ন। বুনোমোষকে বিরক্ত না করলে নাকি আক্রমণ করে না তাহলে মোষটা মিলটনকে আক্রমণ করল কেন ? রাইফেলধারী ছোকরা পরে বলেছিল মোষটা নাকি জখম ছিল। কোথাও হয়ত আগে আঘাত পেয়েছিল। ঐ ছোকরা বলেছিল মোষটা দেখে মুশুঙ্গু কেন মড়ার ভান করে মাটিতে শুয়ে পড়ে নি। কিন্তু ছোকরা তো মিলটনের হাতে রাইফেল দেবার আগে সে কথা মনে করিয়ে দিলো না কেন ? তা নয়। আকস্মিক বিপদে অনেকে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

মিলটনের রাইফেলধারী ছোকরা কতদূর সাহসী ছিল তা আমি জানি না তবে একজন আনাকোলে পুরুষের অসাধারণ সাহস দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম। এরা যে মৃত্যুর সঙ্গে এমন অবলীলায় খেলা করতে পারে তা আমি স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করতুম না।

আনকোলে অঞ্চলে জনবসতি কম, গ্রামগুলো দূরে দূরে। ওরা ডুগডুগি বাজিয়ে সাংকেতিক শব্দ দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। এদের রোজ পেটভরে আহার জোটে না। ভোগেও নানারকম রোগে। স্বাস্থ্যবান তাগড়া চেহারার আনকোলে মানুষ বড়ো একটা চোখে পড়ে না তবে তাদের সাহস অতুলনীয়। অঞ্চলটায় পশুপাখিও কম। মাঝে মাঝে বুনোমোষের পাল আসে

তবে বুনোমোষ মারবার মতো তেমন অস্ত্রও এদের নেই। পাখি বা হরিণ পেলে এরা খায়। শাকপাতাও খেতে হয়।
পেটের জ্বালা বড়ো জ্বালা, এজন্যে তারা কখনও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এমনই অবিশ্বাস্য একটি ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলুম।
আনকোলের একটি গ্রামের কাছে বুনোমোষদের আনাগোনা আরম্ভ হয়েছে। ছোট একটি গ্রামের নরনারী ও শিশুদের কয়েকদিন পেটভরে আহার জোটে নি। একটা অত্যন্ত বড়ো মোষ মারতে পারলে গ্রামবাসীরা পেটভরে খেতে পাবে।
অর্ধবয়স্ক একটি পুরুষ বলল সে মোষ মারবে। তবে তার মোষ মারার পদ্ধতি অন্যরকম, বলতে গেলে সে নাকি প্রায় বিনা অস্ত্রেই মোষ মারবে। লোকটিকে দেখে তেমন মজবুত মনে না হলেও খুব সাহসী মনে হলো। শক্ত চোয়াল, চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। বেশ লম্বা।
লোকটি যখন তৈরি হয়ে এল তখন সে উলঙ্গ, সংক্ষিপ্ত একটা পশুচর্ম দিয়ে লজ্জা নিবারণ করল। ডান হাতে ছেলেবেলার মতো একটা ধনুক আর ছোট দুটো তীর আর বাঁ হাতের কব্জিতে জড়ানো রয়েছে একটা চামড়া আর সেই চামড়ায় গোঁজা আছে একটা ছোট ছোরা। ছোরাখানা বেশ ধারাল, চকচক করছিল।
তারপর সে ঢুকলো লম্বা ঘাসের একটা জঙ্গলে। ঘাসের রং হলদে। এই ঘাস নাকি বুনোমোষের খুব প্রিয়। এই ঘাস খেতে একটা না একটা মোষ আসবেই আসবে।
ঘাসের বনে লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল না। তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি। কি করে সে মোষ মারবে তা দেখবার জন্যে সে আমাকে ডেকে এনেছিল এবং যাতে আমি সে দৃশ্য ভালো করে দেখতে পাই সেজন্যে সে আমাকে কাছেই একটা গাছে তুলে দিয়েছিল। আমি একটা ডালে বসে আর সামনের ডালে পা রেখে জুত করে বসে মহিষপ্রবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। কয়েকটা মোষ কাছেই ইতস্ততঃ চরছিল। যে কোনো সময়ে আমার সামনে হলদে ঘাসের বনে একটা না একটা মোষ এসে পড়তে পারে।
যেদিক থেকে বাতাস বয়ে আসে, বুনোমোষেরা সেইদিকে যেতে ভালবাসে। বুনোমোষের পক্ষে বাতাস এখন অনুকূল, মোষ এই ঘাসবনে আসবে।
আনকোলেরা বুনোমোষকে জোবি বলে। আমি গাছের ডালে বসে দেখলুম যে কয়েকটা মোষ চরছিল তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জোবিটা সেই হলদে ঘাসের বনে এসে ঘাস চিবোতে লাগল।
আনকোলে মানুষটি চুপ করে চিৎ হয়ে শুয়ে হাতে তীরধনুক নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে হাঁটুগেড়ে উঠে তাক করে একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা মোষের

গলায় বিঁধল। মোষটা বোধহয় মনে করল কোনো পোকা কামড়াচ্ছে তাই ঘাড়টা নাড়তে লাগল।

আমার তখন বুক ঢিবঢিব করছে। ভাবছি মোষটা এখনি হাঁক পাড়বে, সঙ্গীরা এসে পড়বে, মানুষটার দফা রফা হবে। কিন্তু মোষটা হাঁক পাড়ল না। তার সঙ্গীরাও চরতে চরতে কিছু তফাতে চলে গেল। তীরবিদ্ধ মোষ কিছু করবার আগেই আর একটা ছোট তীর তার গলায় বিঁধল। আর লোকটি তীর ছুঁড়েই একটু তফাতে গিয়ে নিশ্বাস বন্ধ করে নিশ্চল হয়ে মড়ার মতো উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। এইভাবে দ্রুত ওঠানামার ফলে লোকটির কোমর থেকে তার লজ্জা নিবারণ করবার চামড়ার টুকরোটা খসে পড়ে গেল। কিন্তু সেটি আর যথাস্থানে লাগাবার সময় নেই তাই সে উলঙ্গ হয়েই শুয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় তীরটা কোন দিক থেকে এসেছিল জোবি হয়তো তা বুঝতে পেরেছিল বা আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল এবং অনুমান করেছিল কোন দিক থেকে তীর দুটো এসেছিল। জোবিটা তখন ক্ষিপ্ত। সে সেদিকে ছুটে গেল। জোবির ভীষণ মূর্তি দেখে আমি বিপদ গুনছি। আজ আর লোকটার নিস্তার নেই। ক্ষিপ্ত জোবি সেইদিকে খানিকটা ছুটে গেল তারপর ফিরে এসে দাঁড়িয়ে নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকতে লাগল। মানুষের গন্ধ পেয়েছে। ক্ষিপ্ত জোবি শায়িত উলঙ্গ মৃতপ্রায় মানুষটার দিকে বেগে ছুটে গেল। আমি তখন রাইফেল তাক করছি। উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপছে। তবে এখন গুলি চালানোর ঝুঁকি আছে। গুলি দিকভ্রষ্ট হয়ে লোকটার গায়ে লাগতে পারে। আমি রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

শায়িত লোকটাকে জোবি দেখতে পেয়েছে। শিং উঁচিয়ে সে তার দিকে বেগে ছুটে গেল কিন্তু ফুটখানেক মাত্র বাকি থাকতে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর চারদিক ঘুরতে লাগল। লোকটি তখন একেবারে নিশ্চল হয়ে একটা প্রস্তর-খণ্ডের মতো পড়ে আছে।

অদ্ভুত একটা আওয়াজ করতে করতে জোবিটা কয়েকবার ঘুরে থেমে গেল তারপর লোকটার সেই চামড়ার টুকরোটা খুর দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। তার মন থেকে সন্দেহ যায় নি। সে পেছিয়ে এসে আবার লোকটার দিকে ছুটে গেল। কিন্তু ততক্ষণে তীরের বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে। আমি রাইফেল তাক করে প্রস্তুত হয়ে আছি।

সেই বিশাল বুনোমোষ ছুটতে পারল না। তার পা টলতে লাগল। সেকেণ্ডের মধ্যে মাটিতে পড়ে গেল। ছটফট করতে করতে নিশ্চল হয়ে গেল। বিষমাখানো ছোট দুটো মাত্র তীর অতবড়ো জন্তুটাকে মেরে ফেলল।

এইভাবে বুনোমোষ মারা ছাড়া তাদের অন্য পথ আর জানা নেই। তীর ছুঁড়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকলে জোবি তাদের ঠিক খুঁজে বার করে হত্যা

করেছে। গাছে উঠেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। আহত জোবি না হলেও অন্য জোবি মানুষটাকে নাকি ঠিক চিনে রাখে এবং সুযোগ পেলেই গুঁতিয়ে মেরে ফেলে। এইভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আহারের জন্যে তাদের জোবি মারতে হয়। পালের অন্য জোবিগুলো তখন দূরে চলে গেছে। বুনোমোষটা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উলঙ্গ আনকোলে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝেড়ে বাঁ হাতের কব্জি থেকে ছোরা বার করে বুনোমোষের ছাল ছাড়াতে আরম্ভ করল। ছাল ও শিং দুইই বিক্রি হবে। আনকোলে মানুষটার বৌ ও ছেলেরাও এসে গেল। প্রত্যেকের মুখ উজ্জ্বল।

আমি গাছ থেকে নেমে পড়েছি। জিজ্ঞাসা করলুম, জোবি যদি তোমাকে মেরে ফেলত ?

সে বলল, তা মেরে ফেলতে পারত। কি আর হবে। গ্রামের মানুষরা আর আমার বৌরা কবরখানায় আমাকে পুঁতে দিত। আমাদের সেই কবরখানায় কোনো ভূতপেত্নি যেতে সাহস করে না।

লোকটা বলতে চাইল, আমাদের এই তো অনিশ্চিত জীবন। আমাদের আবার প্রাণের দাম কি ? রোগে, অনাহারে ও বন্যপশুর ভয়ে আমরা তো মরেই আছি। এই আনকোলে এইভাবে আগেও আরও জোবি মেরেছে। জোবি মারায় সে তার গ্রামের একজন এক্সপার্ট বোধহয়।

আনকোলে শিকারীর অতুলনীয় সাহস দেখে আমি বিস্মিত। এদের সাহসের তুলনা হয় না। আনকোলে শিকারীর মতো আমার অত সাহস নেই অথবা বাহাদুরী দেখাবার জন্যে আমি অমন ঝুঁকি নিতে পারি না তবুও আমাকে একবার ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। আমার জীবনও বিপন্ন হয়েছিল।

ওয়াইল্ড বাফেলো অঞ্চলে এসে পর্যন্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে তাদের কয়েকটা ভালো ছবি এখনও তুলে উঠতে পারি নি। আমাকে কয়েকটা ছবি তুলতেই হবে কারণ একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরকম অর্ডার আছে এবং আমি নিজেও যদি একটা সচিত্র প্রবন্ধ লিখতে পারি তাহলে ভালো টাকা পাওয়া যাবে। তাই বুনোমোষের ভালো ছবি তোলবার জন্যে আমি সুযোগ খুঁজছিলুম।

আমি তখন কিভু লেকের তীরে বুকাভু শহরে। জায়েণ্ট গোরিলা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে ও ছবি তুলতে আমি তখন চিবিণ্ডা অরণ্যে যাবার জন্যে তোড়-জোড় করছি।

এই সময়ে অসকার ভারবিক নামে এক বেলজিয়ম যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হলো। বাফেলোর ছবি তোলার কথাটা তাকে কথা প্রসঙ্গে বলতেই সে বলল, নো প্রবলেম, এটা কোনো সমস্যাই নয়। চিন্তা কোরো না। লেক

কিন্তু আর লেক টাঙ্গানাইকার মাঝে যে জঙ্গল আছে সেখানে প্রচুর বুনো মোষ আছে। তুমি আমার সঙ্গে চল, তোমাকে আমি অন্ততঃ আড়াইশো মোষের একটা দুটো দল দেখিয়ে দিতে পারব। মোষগুলোকে তুমি এত ভালো-ভাবে দেখতে ও ধীরেসুস্থে ছবি তুলতে পারবে যে তুমি নিউ ইয়র্কের ব্রংক্স চিড়িয়াখানাতেও অমনটি আশা করতে পারবে না।

অসকারের কথা শুনে আমি খুব উৎসাহিত হলুম। তখনও আমি আফ্রিকায় নতুন, অভিজ্ঞতা তেমন সঞ্চিত হয় নি।

অসকার বলল, আমি তোমাকে যেখানে পৌঁছে দোব সেখানে অনেক বড় বড় উইঢিবি, তার আড়ালে তুমি লুকিয়ে তোমার ক্যামেরা নিয়ে রেডি হয়ে থাকবে। তোমার খুব কাছ দিয়ে বাফেলোর পাল যখন একে একে যাবে তখন তুমি তোমার ইচ্ছামতো অনেক ছবি তোলবার সুযোগ পাবে। চিন্তা কোরো না।

আমি এতই উল্লসিত হলুম ও নিরাপদ বোধ করলুম যে পায়ের ডার্বি শু পালটে ভারি বুট পরলুম না। ভেবেছিলুম ওখানকার জমিও বুঝি খেলার মাঠের মতো সমতল। এই জুতো পরেই দিব্যি হাঁটতে পারব। অসকার তো বলেছিল রাইফেলও নিতে হবে না তবুও অভ্যাসবশতঃ রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে-ছিলুম কারণ আফ্রিকায় আসবার আগে একজন হাণ্টার আমাকে বার বার বলে দিয়েছিলেন জঙ্গলে হাতিয়ার সর্বদা রেডি রাখবে।

রাইফেল তো নিলুম সেইসঙ্গে বেছে ভালো একটা ক্যামেরা, লম্বা টেলিফটো লেন্স এবং যথেষ্ট কার্টফিল্ম সঙ্গে নিলুম।

তারপর নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে যাত্রা করা গেল। ঘণ্টা খানেক গাড়ি চালাবার পর বিরাট একটা আয়রন উডের গাছের নিচে আমরা গাড়ি থেকে নামলুম।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে একটা শুঁড়ি পথ দিয়ে অসকার বেশ জোরে এগিয়ে চলল। আমি তাকে অনুসরণ করতে করতে জিজ্ঞাসা করলুম, কি ব্যাপার? অত জোরে যাচ্ছ কেন?

অসকার বলল, কাছেই নদী, নদীর একটা বিশেষ জায়গায় বাফেলোর পাল বিকেলের জল খেতে আসবে। তাছাড়া সূর্য পশ্চিম আকাশে যতই ঢলে পড়বে তোমার ছবি তুলতে ততই অসুবিধে হবে। জানই তো বিকেলের দিকে সূর্যের আলোয় ইনফ্রা-রেড রশ্মি বাড়ে ফলে ছবির টোন ঠিক হয় না, কালো হতে পারে।

অসকার কথাটা ঠিকই বলেছিল তবে একটু আস্তে হাঁটলেই পারত। বুঝলুম এখানকার পথঘাট বনজঙ্গল সব ওর মুখস্থ।

দশ মিনিট হাঁটবার পর আমরা একটা ফাঁকা জায়গায় এলুম।

ভেবেছিলুম অসকার আমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সে জায়গাটা খেলার মাঠের

মতো সমতল কিন্তু হায় আমার অদৃষ্ট। কয়েকদিন আগে এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে কাদা হয়েছিল। তারপর যখন বৃষ্টি থামল তখন কড়া রোদ উঠল। সেই রোদে নরম কাদা শুকিয়ে ঝামা হয়ে গেল। জমি মোটেই সমতল নয়, শক্ত কাদার খাঁজখোঁজ যেন পাথর। মাঝে মাঝে কোনো ফাঁকে আমার শহুরে ডার্বি জুতো আটকে যাচ্ছে বা হোঁচট খাচ্ছি। ঠোক্কর খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে যাচ্ছি। রাইফেল ও ক্যামেরার ব্যাগ সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। এমন জানলে আমি নিশ্চয় আমার ভারি মিলিটারি বুট পরে আসতুম। ভীষণ ভুল হয়ে গেছে।

সিকি মাইল চলবার পর সামনে রুজিজি নদী। এখন খুব গভীর বা চওড়া নয়। হেঁটে পার হওয়া যায়। সামনে নদীর ধার বরাবর শর বন, বেশ ঘন। আর বাঁ দিকে অজস্র উইঢিবি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না।

অসকার আঙুল বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, তুমি ঐ একটা উইঢিবির আড়ালে চলে যাও। তাড়াতাড়ি যাও।

যাচ্ছি কিন্তু ওখানে রাশি রাশি কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে নেই তো? শুনেছি উইপোকা, বাচ্চা আর ডিম খেতে সার বেঁধে নাকি ডেঁয়ো পিঁপড়ে আসে। আমিও তাকে ফিসফিস করেই জিজ্ঞাসা করলুম।

অসকার বলল, আরে না না, তুমি যাও, আড়ালে লুকিয়ে ক্যামেরায় টেলিফটো লেন্স ফিট করে বসে থাক। ওরা এল বলে।

তুমি কোথায় চললে?

আমার জন্যে ভেবো না, আমি কাছেই থাকব।

অসকার আর দাঁড়াল না। সে তার কালো ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে নদীর দিকে চলল। চোখের নিমেষে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

পরিবেশটা আমার মোটেই পছন্দ হলো না। কেমন একটা থমথমে ভাব। আমার সঙ্গী ছোকরারও সেই মত। ভাবলুম ছবি তুলে কাজ নেই। গাড়িতে ফিরে যাই। ছোকরার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে সে ভয় পেয়েছে। কিন্তু ও আগেকার জংলী ছেলে, ও কেন ভয় পাচ্ছে? যাই হোক এত কষ্ট করে যখন এসেছি তখন ফিরে গিয়ে লাভ কি? ভয় ঝেড়ে ফেলে একটা বড় উইঢিবির আড়ালে বসলুম। আমার এক মুশকিল যে ছোকরার ভাষা জানি না। সে বিড়বিড় করে কিছু বলছে। কি বলছে কে জানে?

আমার ছোকরার বিরক্তির কারণ ও বিড়বিড় করে কি বলছিল তা আমি পরে শুনেছিলুম। অসকারের ছোকরার কাছে সে শুনেছিল অসকারের মতলব হলো ওপারে একটা সুবিধে মতো জায়গা থেকে যতো ইচ্ছে মোষ মারবে। মোষের দল জল পার হবে না অতএব ও নিরাপদে ওর কাজ শেষ করতে পারবে। তখনও আফ্রিকায় কয়েকটি প্রাণী যেমন গোরিলা ব্যতীত পশু শিকার

অবাধে চলত, পশু মারার জন্যে কোনো আইন তখনও চালু হয় নি।
অসকারের কফি বাগিচা আছে। অনেক শ্রমিক কাজ করে। তাদের খাবার জন্যে সে মোষ মারবে। মোষ মারুক বা না মারুক তাতে আমার আপত্তি নেই কিন্তু আমি ও আমার ছোকরা যে বিপদে পড়তে পারি সে চিন্তা কি সে করে নি? নিউ ইয়র্কের চিড়িয়াখানা ব্রংক্স নিশ্চয় নিরাপদ কিন্তু বুনোমোষ যেখানে অবাধে চরে বেড়ায় সেই স্থানটা কি শহরের চিড়িয়াখানার মতো নিরাপদ? আমরা নতুন তাই মনে করে।

বুনোমোষের পাল তখন যে কোনো সময়ে হানা দিতে পারে এমন আশংকা করে আমরা উইঢিবির আড়ালে আশ্রয় নিয়েছি। জানি না মোষের পাল আমাদের দেখতে পাবে কি না অথবা আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবে কি না।

দারুণ মানসিক চাপ। পনেরোটা মিনিট কাটল তারপর সহসা মাটি কেঁপে উঠল। মোষের পাল এসে পড়ল। জলপান করবার জন্যে তারা নদীর দিকে চলল। কতকগুলো শরবনে প্রবেশ করল আর কতকগুলো অন্য দিকে। আমি যেখানে বসেছিলুম সেখান থেকে ছবি তুলতে আমার অসুবিধে হচ্ছিল না। ছবি তোলার জন্যে আমি এতই ব্যস্ত ছিলুম যে আমার পশ্চাতে আমার ছোকরা কি করছে তা আমার অজ্ঞাত ছিল। তবে তার গলার আওয়াজ পাচ্ছিলুম।

চব্বিশখানা তোলবার পর ক্যামেরা থেকে কাট ফিল্মের ম্যাগাজিন বার করে আমি যখন নতুন একটা ম্যাগাজিন পরাব সেই সময়ে একবার মুখ তুলে যা দেখলুম তাতে আমার আপাদমস্তক কেঁপে উঠল।

সভয়ে দেখলুম কয়েকটা বুনোমোষ উইঢিবির দিকে ছুটে আসছে। তারা বোধহয় জানে নদীতে যাবার এইটেই শর্টকাট। তারা এত জোরে ছুটে আসছে যে আমি আমার ক্যামেরা ও সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে তোলবার সময় পাব না। থাক, ওগুলো এখন ওখানেই থাক। আপাততঃ প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করা যাক। মোষের পাল চলে গেলে ক্যামেরা তুলে নিয়ে যাব। তবে রাইফেলটা সঙ্গে নেওয়া যাক।

রাইফেল নেবার জন্যে যেদিকে আমার ছোকরা থাকার কথা সেদিকে না চেয়ে আমি রাইফেলের জন্যে হাত বাড়ালুম। আমার নজর ছিল মোষের পালের দিকে। হাত বাড়ালুম কিন্তু হাতে রাইফেল এল না। ছোকরা পালিয়েছে!
সে দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখতে পেয়েই কি মোষের একটা দল এদিকে ছুটে আসছে?

ছেলেটা কিন্তু ততক্ষণে নদীতে নেমে পড়েছে। আমিও আর অন্য চিন্তা করলুম না। ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে নদীর দিকে দৌড় লাগলুম। আগেই বলেছি মাটি

এবড়ো-খেবড়ো, পাথরের মতো কঠিন খাঁজখোঁজ। একটা খাঁজে পা আটকে পড়ে গেলুম, ক্যামেরার কোণ লেগে কপাল কেটে গেল।

পরপর তিনটে ও পরে আরও একটা গুলির আওয়াজ শুনলুম। ভাবলুম মোষগুলোকে তাড়াবার জন্যে বা তাদের বাধা দেবার জন্যে আমার বন্ধু গুলি চালাচ্ছে যাতে আমি বিপদে না পড়ি।

খাঁজ থেকে পা বার করলুম। খুব লেগেছে। ব্যথায় টনটন করছে। কোনো-রকমে উঠে দাঁড়ালুম কিন্তু চলতে পারছি না। এদিকে শমনের দল ছুটে আসছে। কি করব ঠিক করতে পারছি না।

অসকারের গুলিতে হয়ত দু একটা মোষ ঘায়েল হয়েছিল কিন্তু তারা পালানো বা দিক পরিবর্তন করা দূরের কথা তাদের গতি আরও আরও বেড়ে গেল। আমি বিপদ গনছি। কি করব বুঝতে পারছি না। পায়ের যন্ত্রণায় কাতর। ছুটতে পারব না। আনকোলে মানুষটির মতো মড়ার ভান করে কি মাটিতে শুয়ে পড়ব? কিন্তু সেখানে ছিল একটি মাত্র জেব্রা আর এখানে অনেক।

ইংরেজ বন্ধু মিলটনের কথা মনে পড়ল। মোষের পাল যখন ছোটে তখন মুখ বা মাথা উঁচু করে ছোটে। আমি শুয়ে পড়লে তারা আমাকে দেখতে পাবে না, আমাকে মাড়িয়ে চলে যাবে। তাদের ক্ষুরের আঘাতে ও পায়ের চাপেই মারা যাব।

মোষের পাল এসে গেল। আর পালাবার উপায় নেই। মৃত্যু আসন্ন। আমি তখন আমার মাথার হেলমেট খুলে মাথার ওপর নাড়তে লাগলুম। মোষগুলো তখন তৃষ্ণার্ত, নদীর দিকে ছুটছে তবুও কয়েকটা আমার চারদিকে ঘুরতে লাগল। আমি ভাবছি এই বুঝি আমার শেষ।

কিন্তু আমি বেঁচে গেলুম। মোষগুলো আমাকে ছেড়ে নদীর দিকে ছুটল। কিন্তু জল পান করে ওরা তো ফিরে এসে আমাকে আক্রমণ করতে পারে।

আমি আর ঝুঁকি নিলুম না। কোনো রকমে পা টেনে টেনে খুঁড়িয়ে নদীতে নেমে পড়লুম এবং অনেক কষ্ট করে ওপারে যখন পৌঁছলুম তখন অসকার ছুটে এল। একগাল হাসি। আমাকে বলল, কি? আমি বলি নি যে উইঢিবির আড়ালে বসে তুমি ছবি তোলবার সুযোগ পাবে।

কি উত্তর দোব? কোনোরকমে বললুম, হ্যাঁ, ব্রংক্স চিড়িয়াখানাতেও এমন সুযোগ পেতুম না।

অসকার আমার কথা শুনল কি না কে জানে সে তখন আরও মোষ মারবার জন্যে অন্যদিকে ছুটেছে।

হাতির শিকার

গোরিলা ফরেস্টে আমার কাজ শেষ হলে এবার একবার দেশে ফিরতে হবে, তারপর আবার আফ্রিকায় ফিরে আসব। আফ্রিকা আমাকে বার বার টানে। এখনও অনেক কিছু জানতে বাকি। আমি আমার ভ্রমণের মধ্যে এমন পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ ও উদ্ভিদ আবিষ্কার করেছি যা পূর্বে কোনো শ্বেতাঙ্গ দেখে নি। এসবের বিস্তারিত বিবরণ ও উদাহরণ এমন কি জীবিত প্রাণী পৃথিবীর বিভিন্ন চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সরবরাহ করেছি। আফ্রিকা ছাড়বার আগে একবার বিলের সন্ধান নিতে হবে। সে কি হাতি মারতে পেরেছে? পূর্ব আফ্রিকার পোর্তুগিজ উপনিবেশ মোজামবিকের রাজধানী বাইরা শহরে বিল থাকে। ইতিমধ্যে বিল মেরিয়া নামে একটি যুবতীকে বিয়ে করেছে এবং তারা সুখের সংসার পেতেছে। তাই খুশিমনে একদিন বাইরা শহরে পৌঁছে গেলুম।

কিন্তু আমি কি দেখতে এলুম? না এলেই তো ভালো ছিল। এমন ঘটতে পারে তা তো আমি আশা করি নি।

তিন দিন পরে একদিন সকালে বাইরার দু হাজার হোয়াইট বাসিন্দা বুঝতে পারল না সিডনি ব্যাংকের নতুন এবং জনপ্রিয় চিফ অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট কাল রাত্রে বাসায় ফেরে নি এবং তার আসন্নপ্রসবা পত্নী ডাক্তার ও তার শুভানুধ্যায়ীদের অনুরোধ উপেক্ষা করে বিষাদাচ্ছন্ন করুণ মুখে আমার সঙ্গে আমার গাড়িতে সহসা শহর ত্যাগ করল? গাড়িতে আমি, মেরিয়া ও আমার ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ ছিল না। মেরিয়ার সন্তান আসতে আর মাত্র দু মাস বাকি। আমি তাকে সঙ্গে নিতে বাধ্য হয়েছিলুম, মেরিয়া আমার কোনো কথা শোনে নি।

অনেক মানুষ অনেক কাজ করতে চায়, কেউ সফল হয় কেউ বিফল হয়। বিলও এমন একটি কাজ করতে চেয়েছিল যা তার কাছে অবশ্যকর্তব্য মনে হয়েছিল। জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত তার বাসনা সে একটা হাতি মারবে। হাতি একটা না মারলে সে কোনোদিন স্বস্তি পাবে না। কিন্তু হাতি কেন? আরও তো কত জন্তু আছে, বাঘ, সিংহ, লেপার্ড, গণ্ডার। না, সে একটা হাতি মারবে এবং সম্ভব হলে আফ্রিকার হাতি এবং এইজন্যেই সে আমার সঙ্গে আফ্রিকায় এসেছে।

বিল কেন হাতি মারতে চায় তার একটা কারণ আছে। তার এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একটি বিষাদময় ঘটনা জড়িত। সে ঘটনার নায়ক একটি হাতি।

ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পনগরী ডেট্রয়েটে। বিলের বয়স তখন

মাত্র পাঁচ বছর। তার বাবা মা তাকে সার্কাস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। বাচ্চাদের কাছে হাতি বেশ প্রিয়। চিড়িয়াখানায় অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে বিল হাতিকে কত বাদাম ভাজা খাইয়েছে, হাতির পিঠে চড়েছে আর সার্কাসের হাতি, যাকে সকলে শান্ত প্রাণী মনে করে সেই হাতি কি না সহসা ক্ষেপে গেল এবং শুঁড় তুলে চিৎকার করে কাউকে সজোরে ধাক্কা মারল, কাউকে শুঁড়ে জড়িয়ে তুলে আছাড় মেরে মাটিতে ফেলে দিলো, কাউকে পায়ে পিষে ফেলল? শেষে সে তার দাঁত দুটো একটা ভ্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে সেটা উল্টে দেবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেটা চাপা পড়ল ও নিজেই মারা গেল। সার্কাসের তাঁবুর ভেতরে ও বাইরে সে যে কি বিশৃঙ্খলা তা সহজেই অনুমেয়।

বিল তার বাবা মায়ের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সার্কাসের একজন কর্মী তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে দিতে পেরেছিল। পরে কেউ যখন তাকে তার বাবার কাছে নিয়ে গেল তখন সে দেখল বাবা তার মায়ের মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন। তারপর তার বাবাও বেশিদিন বাঁচেন নি, শোক সহ্য করতে না পেরে এক বছর পরে মারা গিয়েছিলেন।

ঘটনাচক্রে তেইশ বছর পরে নিউ ইয়র্ক শহরে বিলের সঙ্গে আমার মিলন হয়। সে কথা এই বইয়ের গোড়াতেই বলেছি।

হাসিখুসি, কেতাদুরস্ত, স্মার্ট, শক্তসমর্থ ও উৎসাহী বিলকে আমার পছন্দ হয়েছিল। আমার সঙ্গে তাকে আফ্রিকার অরণ্যে নিয়ে যেতে আমি রাজি হয়েছিলুম। সে যে কি পরিমাণ উল্লসিত হয়েছিল তা বলবার কথা নয়।

সেই সময়ে সে আমাকে যে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিল তার মধ্যে একটি ছিল, আফ্রিকায় সে কি একটা হাতি শিকার করতে পারবে?

আমি বলেছিলুম, কেন নয়? শুধু হাতি কেন? সিংহ, লেপার্ড, বাফেলো, হরিণ তো বটেই এবং পারলে একটা গণ্ডারও। তবে এক এক জন্তু মারবার বিশেষ কায়দা আছে এবং গুলি করলেই জন্তু মরে না। অনেক কিছু জানতে ও শিখতে হয়।

বিল বলেছিল, বেশ, আমি সব জানব ও শিখব, তারপর দু' একটা হাতি মারতে পারব নিশ্চয়।

পারবে বিল তবে হাতি শিকারের জন্যে পারমিট নিতে হবে। পারমিটের জন্যে ক্ষেত্র বিশেষে ২০ থেকে ৫০ ডলার পর্যন্ত ফি আদায় দিতে হয়। বেআইনী-ভাবে গুলি চালালে জরিমানাও দিতে হয়।

বিল বলেছিল, নিশ্চয় পারমিটের টাকা দোব কিন্তু আপনি আমাকে হাতির জঙ্গলে নিয়ে যাবেন তো? হাতি মারতে কি রীতিমতো হাত পাকাতে হয়? হাতির কোনখানে গুলি করব তাও কি জানতে হয়? এককথায় বলা যায় বিলের ঘাড়ে হাতির ভূত চেপেছিল। তার মাথায় সর্বদা হাতির চিন্তা ঘুরত।

আমরা অর্থাৎ প্রফেসর, বিল ও আমি প্রথম রোডেশিয়াতে এলুম। রোডেশিয়াতে প্রচুর হাতি পাওয়া যায়। এখানে আমরা কি কাজ করেছি সে কথা আগেই বলেছি। তবে বিল অবসর পেলেই শিকারে যেত। শিকার করবার জন্যে নয়, শিকার শেখবার জন্যে ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে। বিলের ধৈর্য, তীক্ষ্ন বুদ্ধি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ক্ষিপ্রতা থাকায় সে শিকারের কৌশল দ্রুত আয়ত্ত করতে পেরেছিল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারত। কয়েক মাসের মধ্যেই বিল সবরকম হিংস্র প্রাণী শিকার করেছিল।

বিলের একটা গুণ ছিল, সে অযথা গুলি চালাত না। যে পশু শান্ত তাকে আক্রমণ করার ইচ্ছে নেই, সে পশু সে মারত না। ঠিক যেখানে গুলি করলে এক গুলিতে পশু মরবে, বিল ঠিক সেইখানে গুলি করতে পারত। দুবার সে বিপদে পড়েছিল। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে তার মৃত্যু হতে পারত কিন্তু নতুন শিকারী হয়েও সে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

রোডেশিয়াতে তার জন্যে আমরা যে কাজ নির্ধারণ করে দিয়েছিলুম সে কাজ শেষ করে সে শিকারে যেত। ভোর রাত্রে সে শয্যাত্যাগ করে বেরিয়ে যেত এবং ব্রেকফাস্টের সময় ফিরে আসত কিংবা যেদিন কাজ আগে শেষ হয়ে যেত সেদিন বাকি সময়টা সে অপচয় করত। কিছু না কিছু শেখবার জন্যে সে বেরিয়ে পড়ত। যেদিন আমরা বিশ্রাম নিতুম সেদিনটা সে বিশ্রাম না নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তার সঙ্গী ছিল মুটোনি, আমার অফ্রিকান শিকারী ও বন্দুক বাহক।

মুটোনির একটা মস্ত গুণ ছিল। জন্তুর পায়ের ছাপ চিনতে সে ছিল অদ্বিতীয়। বিলকেও সে এই বিদ্যা শেখাত। বিলকে সে বলত লম্বা মুশুঙ্গু। মুটোনি একদিন বলল যে সে আজ পর্যন্ত লম্বা মুশুঙ্গুকে একটাও হাতি দেখাতে পারল না, কোনো হাতির প্রেতাত্মা আড়ালে থেকে এটা ঘটাচ্ছে।

মুটোনি যখন একা যায় তখন সে দু তিন দল হাতি দেখতে পায় কিন্তু যখন বিলকে সঙ্গে নিয়ে যায় তখন একটাও হাতি দেখা যায় না। বিল হাতি যে একেবারেই দেখে নি তা তো নয় তবে একটা মজা ছিল। বিল যখন পারমিটের জন্যে অপেক্ষা করছিল তখন মুটোনির সঙ্গে গিয়ে কয়েক দল হাতি দেখেছিল কিন্তু পারমিট হাতে পাওয়ার পর সব হাতি যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। এই জন্যেই মুটোনি ঐ মন্তব্য করেছিল। যদিও বা দূর থেকে ওরা হস্তিযূথ দেখতে পেত তো হাতিরা যত দ্রুত সম্ভব সেখান থেকে কোথায় যে সরে পড়ত আর তাদের খুঁজে পাওয়া যেত না। এক অঞ্চলের কাজ সেরে আমরা অন্য অঞ্চলে সরে যেতুম এবং সেখানকার জঙ্গলেও হাতির পাল বিলকে নিয়ে তাদের পুরানো খেলা খেলত।

পরে আমরা যখন মুমবোয়া জেলায় কাজ করতে গেলুম এবং সেই রহস্যময়

কাবেনা মরণকূপের খোঁজ করতে লাগলুম, সেই, সময়ের মধ্যে বিল সাতটি কেন্দ্র থেকে সাতটি পারমিট সংগ্রহ করেছিল। সাতটা পারমিট পেলেও সে হাতির দর্শন পাচ্ছে না। সাতটা পারমিটের জন্যে তাকে অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল, টাকাও খরচ করতে হয়েছে অনেক এবং তারপর তাকে বলতে হয়েছে হায় হাতি তুমি কি হারিয়ে গেলে ?

বিলের একটা গুণ ছিল। কোনো কাজে হাত দিলে সে সেই কাজে মন প্রাণ ঢেলে দিত। আমরা যখন কাবেনার সন্ধান করছি তখন সে যেন হাতির কথা ভুলে গেল।

এরপর কিছু দিন হাতির প্রশ্ন ওঠে নি। মুটোনির আপাততঃ কোনো কাজ না থাকায় সে ছুটি নিয়ে বাড়ি গেল আর আমরাও সদলে গেলুম জুলুল্যাণ্ডে যেখানে হাতি থাকে না। একশ মাইলের মধ্যে হাতির দর্শন পাওয়া যায় না। আমরা যতদিন জুলুল্যাণ্ডে ছিলুম তার মধ্যে বিল ও হাতির নাম উল্লেখ করে নি।

জুলুল্যাণ্ড থেকে যেই আমরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বিদায় নিলুম আর বিলও তার অভিলাষ প্রকাশ করল, এবার আমার হাতি চাই। দেশে ফেরবার আগে একটা নয় সে কয়েকটা হাতি মারতে চায়। সে এখন বাইরা যাবে। সেখান থেকে হাতি শিকারে যাবে। মুটোনি বাড়ি গেছে তাকে পাওয়া যাবে না। মুটোনি নির্ভরযোগ্য হলেও এবার তার জন্যে বিলের আগ্রহ কম, কারণ তার ধারণা মুটোনি সঙ্গে থাকলে হাতির দেখা পাওয়া যায় না। সে এবং প্রফেসর একজন দক্ষ শিকারী খুঁজে নেবে।

এরপর আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। আমি অন্য অভিযানে গেলুম যার জন্যে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। পরে বাইরা এসে আমি বিলের দেখা পেলুম। বিলের কিন্তু অ্যামেরিকায় ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। হাতি শিকার হয় নি বলে সে দেশে ফেরে নি। বাইরা জাহাজঘাটে সে আমাকে নিতে এসেছিল। একা আসে নি, সঙ্গে স্ত্রীকেও এনেছিল। দূর থেকে ভিড়ের মধ্যেও বিলকে আমার চিনতে কোনোই অসুবিধে হয় নি, হবার কথাও নয়। সেই সদাহাস্যময় সপ্রতিভ সুদর্শন যুবক।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা মিলিত হয়ে হ্যাণ্ডশ্যেক করলুম। বিল তার গাড়ি এনেছিল। আমরা তিনজনে গাড়িতে উঠলুম। বিল গাড়ি চালাতে লাগল। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে অনর্গল কথা বলে যেতে লাগল।

জুলুল্যাণ্ডে হাতির নাম উচ্চারণ করে নি। তারপর আমার সঙ্গে তো অনেক দিন দেখা হয় নি তাই বলে হাতির কথা সে একটুও ভোলে নি। কুশল বিনিময় ও অন্যান্য সংবাদ আদানপ্রদানের পর সে হাতির কথা আরম্ভ করল। সেইসব কথা চলল লাঞ্চ পর্যন্ত এবং অল্প বিরতির পর বিকেল পর্যন্ত।

ইউরোপে তখন রণদামামা বেজে উঠেছে। ফরাসি দূতাবাস মারফত আদেশ পেয়ে প্রফেসর ফ্রান্সে ফিরে গেছে। বিলের তখন প্রচুর অবসর এবং হাতেও কিছু টাকাপয়সা ছিল। সে জঙ্গলে যাবার জন্যে তৈরি। এমন সময়ে মেরিয়ার সঙ্গে তার দেখা হয় এবং বিবাহ হয়। বিয়ের পরই স্থানীয় সিডনি ব্যাংকে বিল ভালো চাকরিটা পেয়ে যায়।

বাইরা শহরের আবহাওয়া ভালো, শহরটা ওদের বেশ পছন্দ হয়েছে। ওরা এখানে বেশ জমিয়ে বসেছে। বিল এখন নয় দিন ছুটি পেয়েছে। অলসভাবে না কাটিয়ে ছুটিটা সে সদ্ব্যবহার করতে চায়। বিল আমাকে বলল হাতি শিকারের জন্যে সে নতুন পারমিট সংগ্রহ করেছে। মুটোনি এখন বাইরাতেই আছে। তার কাছ থেকে বিল দৈত্যস্বরূপ একটা দাঁতাল হাতির সন্ধান পেয়েছে। ভাইলা ম্যাচাডোর জঙ্গলে হাতিটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এত বড় হাতি ইদানীং এ অঞ্চলে দেখা যায় নি। হাতিটা মারবার জন্যে একটা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়েছে।

বিল বলল, বিয়ের আগে থেকেই মেরিয়া বলে আসছে বড় শিকার আমার আর করা চলবে না। কিন্তু যখন আমি বললুম, শুধু একটা হাতি আমাকে মারতে দাও তারপর আমি আর শিকার করব না। মেরিয়া রাজি হয়েছে।

আমি মনে মনে ভাবলুম হাতি শিকার যে কতদূর বিপজ্জনক হতে পারে তা নিশ্চয় মেরিয়ার জানা নেই তাই সে রাজি হয়েছে। সার্কাসের বা চিড়িয়াখানার শান্ত প্রাণীর চেহারাই তার মনে গেঁথে আছে। আমি শংকিত হই কারণ হাতিটা নাকি বিশাল ও দুরন্ত। আজ থেকেই বিলের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, সে কালই ম্যাচাডো অরণ্যের দিকে রওনা হবে।

মেরিয়া রাজি হয়েছে ?

এখনও তাকে বলি নি। সন্ধ্যার পর বলব। আমার উৎসাহ সে নিশ্চয় নিবিয়ে দেবে না। হাতির দাঁত দুটো মস্ত বড়ো। এত বড়ো দাঁত বোধহয় তুমিও দেখ নি আত্তিলিও।

পরে মেরিয়ার সঙ্গে আমার কথা বলে মনে হয়েছিল তার মোটেই সমর্থন নেই। সকালে তাকে দেখেছিলুম পাখির মতো চঞ্চল কিন্তু বিল হাতি শিকারে যাবে শুনে সে মিইয়ে গিয়েছিল। বিল তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছে, বলেছে একদিন বড়জোর দু দিন পরেই আমি ফিরে আসছি, ঘাবড়াচ্ছ কেন ? মনে মনে মেরিয়া ঘাবড়েছিল ঠিকই, কিন্তু স্বামীর আজীবন ইচ্ছা ও উৎসাহ সে দমন করতে চায় নি তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামীর যাবার সব প্রস্তুতি করে দিয়েছিল। বিলও তার গাড়ি বন্দুক ও টোটা সবকিছু ঠিকঠাক করে নিচ্ছিল।

যাত্রার আয়োজন করতে করতে বিল বলল, শোনো আত্তিলিও মজার কথা শোনো, এই হাতিটাকে নাকি মুটোনিও ভয় পায়, সে আমাকে বলছিল ও

হাতিটা কেন মুশুগু অন্য হাতি মার। অথচ মুটোনি এই হাতিটাকে বেশ কয়েকদিন ধরে নজরে রেখেছিল, তার গতিবিধি কেমন তাও আমাকে বলেছে, আমার তো তেমন বিপজ্জনক মনে হচ্ছে না। তবে মুটোনি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। ও একজন বন্ধুকে দেবে, সে নাকি হাতিটাকে উত্তমরূপে চেনে। দিনের পর দিন হাতিটাকে নজরে রেখে তার স্বভাব ও মেজাজ জেনে নিয়েছে। বিশেষ একটা জায়গায় দুপুর নাগাদ হাতিটা আসে, তাকে খতম করার সেইটেই হবে সেরা সময়।

মেরিয়া তখন ঘরে ছিল না। আমি বলি, শোনো বিল, মুটোনির মতে আমারও মত। এই বদ হাতিটাকে ছেড়ে দাও না। যে হাতিকে মুটোনি ভয় পায় সে হাতি নিশ্চয় বিপজ্জনক···।

বিল আমাকে বাধা দিয়ে বলে, আরে সেইখানেই তো মজা, সাহস ও কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পাওয়া যাবে। এত বড় একটা গুণ্ডা হাতির কথা তুমিও হয়ত শোনোনি, পনেরো ফুট বুঝলে। আর দাঁত? দশ ফুট লম্বা, প্রত্যেকটার ওজন অন্ততঃ দুশো পাউণ্ড, মুটোনির বন্ধু আমাকে বলেছে।

আমি বললুম, তুমি ঠিকই বলেছ, পনেরো ফুট হাতির কথা শুনি নি, বিশ্বাসও হচ্ছে না, তবে দুশো পাউণ্ডের চাইতেও ভারি দাঁতের কথা আমি জানি, এমন একজোড়া দাঁত লণ্ডনের সাউথ কেনসিংটন ন্যাচারাল হিস্টরি মিউজিয়মে রাখা আছে। বিরাট। দাঁত দুটোর ওজন যথাক্রমে দুশো আটাশ ও দুশো ছত্রিশ পাউণ্ড আর প্রতিটা লম্বায় দশ ফুট দুই এবং দশ ফুট আড়াই ইঞ্চি, সর্বোচ্চ বেড় হলো দু ফুট আধ ইঞ্চি। বাজারে তাদের দাম পাঁচ হাজার পাউণ্ড। ১৮৯৯ সালে জাঞ্জিবারের বাজারে দাঁত দুটো নীলামে চড়া দামে বিক্রি হয়েছিল।

আমার কোনো কথাতেই বিলের তখন কান দেবার সময় নেই। সে অনর্গল বলে চলেছে। সে বলছে, দাঁত দুটোর এখন দাম অনেক বেশি পাওয়া যাবে। আমার এখন টাকার অনেক দরকার, বাড়ি আর বিয়েতে হাতে যা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে, পুঁজি কিছুই নেই, মাইনেটুকু সম্বল। দাঁত দুটো বেচে যে টাকা পাব তাতে অনেক কিছু করা যাবে। আর শোনো গাত্তি, মেরিয়াকে বোলো না, হাতিটা গুণ্ডা, খুনে, অনেক মানুষ মেরেছে, অনেক গ্রাম ভেঙেছে, নেটিভরা হাতিটাকে রীতিমতো ভয় পায়, শয়তান। কম্পানিয়া ডি মোচামবিক পাঁচশ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সে টাকাটাও তো পাওয়া যাবে। মুটোনি আমার সঙ্গে যাবে।

আমি বললুম, বুঝলুম, তুমি সব দিক বুঝে পাগলা হাতিটাকে মারবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ, কিন্তু আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই? আমি বলছি না যে আমি তোমার চেয়ে ভালো বন্দুক চালাতে পারি তবুও বাড়তি একটা বন্দুক

থাকা কি ভালো নয় ?
আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই বিল বলল, ননসেন্স, কোনো মানে হয় না। তুমি যে আসতে চাইছ সে তো খুব ভালো কথা কিন্তু দরকার নেই, তুমি ভেবো না, ওটাকে আমি ঠিক ঘায়েল করব, আর তুমিও তো তোমার নতুন কাজে কাল বেরিয়ে পড়ছ। মুটোনি তো আমার সঙ্গে থাকছে। তোমার কথা আমার মনে আছে। হাতিটা যখন আমাকে তেড়ে আসবে, তিরিশ ফুটের মাথায় এসে পড়বে তখনি তার চোখের তিন চার ইঞ্চি ওপরে ব্রেন-এ গুলি করতে হবে, অন্য কোথাও নয়। সে আমি পারব। আমি মনে মনে ও স্বপ্নে অন্ততঃ হাজার বার রিহারসাল দিয়েছি, আমার এক্সপ্রেস রাইফেলটা জলের মতো চলে।
পরদিন, শনিবার সকালে আমি ঠিক করলুম আমি আমার নতুন কাজে যাব না। তাড়া নেই, কিছু আয়োজনও বাকি আছে। নতুন কর্মস্থলে একজন লোক পাঠিয়ে দোব। বিল কেমন হাতি শিকার করে ফিরল সেটা জানবার আগ্রহ আমার কিছু কম নয়। তাকে অভিনন্দন জানালে সে নিশ্চয় খুব খুশি হবে। আসন্নপ্রসবা মেরিয়া এখানে একা আছে, একটা মানসিক চাপ ভোগ করছে। স্বামী নিরাপদে ফেরা না পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না। কোনো কারণে বিলের যদি ফিরতে দেরি হয় এবং প্রয়োজন হলে আমি মেরিয়াকে সাহায্য করতে পারব। এইসব ভেবে আমি আমার যাত্রা স্থগিত রাখলাম।
সন্ধ্যায় আমি আমার হোটেল থেকে মেরিয়াকে টেলিফোন করলুম। আমি যাই নি শুনে সে খুব আনন্দিত হলো। তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো সে টেনশনে ভুগছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, একা আছ আমি যাব নাকি ? যদি কোথাও যেতে চাও, কোনো বন্ধুর বাড়ি বা কিছু কিনতে চাও আমি নিয়ে যেতে পারি।
মেরিয়া বলল, দরকার হবে না, তোমাকে আসতে হবে না, কোথাও যাব না। আমি বললুম, ঠিক আছে, তবে বিল তো এখন যে কোনো সময়ে ফিরে আসতে পারে, তুমি বাড়িতে থাকাই ভালো।
এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে মেরিয়া বলল, না না বিল ফিরবে না, তোমাকে ধন্যবাদ, গুড নাইট।
বিল ফিরবে না মানে আজ হয়ত ফিরবে না আমি এইরকমই ভেবেছিলুম। তার মন কি অন্য কথা বলছিল ? হ্যাঁ বলছিল। সেটা বুঝতে পারলুম সোমবার সে যখন আমাকে ফোন করল। লাঞ্চের পর আমি তখন আমার হোটেলের ঘরে সবে দু চোখের পাতা এক করেছি।
মেরিয়া বলল, প্লিজ কাম অ্যাট ওয়ান্স, এখনি চলে এস।
আমি জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলুম, কেন ? কি হয়েছে ?
উত্তর পেলুম না। মেরিয়া লাইন ছেড়ে দিয়েছে।
বিল বোধহয় আহত হয়ে ফিরেছে এই ভেবে আমি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি

জামা প্যাণ্ট পরে বেরিয়ে পড়লুম।

আমার নেটিভ ড্রাইভার বোম্বো আমাদের স্টেশন ওয়াগানের ছায়ায় বসে ঢুলছিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বিলের কটেজে পৌঁছে দেখলুম মেরিয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে কিন্তু সে কোথাও যাবার জন্যে প্রস্তুত। কোথায় যাবে? হাসপাতালে?

আমাকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেই বলল, বিলের কোনো বিপদ ঘটেছে এবং গুরুতর।

কেন? কোনো খবর পেয়েছ নাকি?

না, কোনো খবরই পাই নি আর সেই জন্যেই তো বলছি তার কোনো গুরুতর বিপদ ঘটেছে। সে আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল হাতি মরুক না মরুক সে কাল নিশ্চয় ফিরবে। এখন কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই, চল আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি।

আরে তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? হাতি বা হাতির পাল দেখা যায় নি সেজন্যে সে হয়ত অপেক্ষা করছে আর আমরা তাকে খুঁজতে যাবই বা কোথায়?

মেরিয়া বলল, ভাইলা ম্যাচাডো জঙ্গলে যাবার রাস্তায় তার রেনো গাড়ি নিশ্চয় কোথাও পড়ে আছে, কাছে নিশ্চয় কাফ্রিদের গ্রামও আছে, কাফ্রিরা বলতে পারবে বওয়না কোন পথে গেছে।

আমি বললুম, বেশ আমি এখনি যাচ্ছি এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে যেভাবে হোক আমি খবর পাঠাব।

মেরিয়া আমার কোনো কথা বা যুক্তি শুনতে চাইল না, সে বলল, পানীয় জল, কম্বল, ফ্ল্যামালাইট, বিলের আর একটা বন্দুক এবং কিছু খাবার আমি তৈরি রেখেছি। আর এক মিনিটও সময় নষ্ট না করে সেগুলো এখনি গাড়িতে তুলে দিতে বলো। আমি তো নিশ্চয় যাব।

এর ওপর আর কিছু বলার নেই। আমি কিছু বলার আগেই মেরিয়ার ভৃত্যরা সব মাল গাড়িতে তুলে দিলো, বোম্বোকে কিছু করতে দিলো না। মেরিয়ার কটেজ থেকে আমি আমার সহকারীকে ফোন করে আমি আমার অবস্থা জানিয়ে দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলুম। মেরিয়ার কটেজে দশ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় নি।

গাড়ি চলল। সকলে নির্বাক। সকলে মানে মেরিয়া, আমি ও বোম্বো। মনে উদ্বেগ।

২১ মাইলের মাথায় বেশ বড় একটা গাছ গতরাত্রে পড়ে গিয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। আমার স্টেশন ওয়াগনে কিছু যন্ত্রপাতি থাকে কিন্তু সেই গাছ কেটে রাস্তা বার করতে রাত কাবার হয়ে যাবে। কে জানে এই অবস্থা দেখে বিল ফিরে গেছে কি না।

গাড়ি থেকে নেমে দেখা গেল গাছের মাথার দিকে কয়েকটা ডাল কাটতে পারলে

কোনো রকমে যাওয়া যাবে। তাই করতে হলো, তাতেও তিন ঘণ্টা লাগল। আমি মনে মনে মেরিয়ার ওপর বিরক্ত হচ্ছিলুম। প্রবল ঝাঁকুনি খেয়ে কোনোরকমে বাধাটুকু পার হওয়া গেল।

৩২ মাইলে পৌঁছে বিলের রেনো গাড়ির দেখা পাওয়া গেল। ছায়া তখন দীর্ঘ হয়েছে। সূর্যাস্তর বিলম্ব নেই। বোম্বো গাড়ি থামাতে না থামাতে মেরিয়া গাড়ি থেকে নেমে রেনোর কাছে ছুটে গিয়ে গাড়ির ভেতর খুঁজতে লাগল বিল কোনো চিঠি রেখে গেছে কি না। আমি আর বোম্বো কাফ্রিদের গ্রামের সন্ধানে কিছু দূর এগিয়ে যেতে বিলের তাঁবু দেখতে পেলুম। মেরিয়াও দেখেছিল। সে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে তাঁবুর ভেতরটা দেখল। তাঁবু ফাঁকা তবে কেউ ক্যাম্প খাটে ঘুমিয়েছিল।

আমি বললুম, বিল আর মুটোনি সকালে আবার বেরিয়েছে, ফেরবার সময় হয়েছে। বললুম বটে কিন্তু আমার নিজেরই বিশ্বাস হলো না। মেরিয়া ততক্ষণে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে জিনিসপত্তর নেড়ে চেড়ে দেখছে। টিফিন ক্যারিয়ার খুলে দেখল খাবার কেউ স্পর্শ করে নি বললেই হয়। অর্থাৎ বিল ফেরে নি।

কাঁপা হাতে টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকা বন্ধ করতে করতে "বিল, বিল" বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। তারপর টিফিন ক্যারিয়ার সরিয়ে রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

সে রাত্রিটা ভোলবার নয়। মেরিয়াকে সামলাতে আমার পক্ষে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। আমার কিই বা করবার ছিল? মাঝে মাঝে মেরিয়াকে সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া আমি এবং বোম্বো সারা রাত্রি জেগে কাটিয়ে দিলুম। মেরিয়াকে এক কাপ চাও খাওয়ানো যায় নি। পরদিন বেলা দশটা নাগাদ সে নিজেকে একটু সামলে নিয়েছিল। আমার খালি ভয় হচ্ছিল, অকস্মাৎ এই শোকাবহ আঘাতের ফলে মেরিয়ার প্রসব বেদনা না শুরু হয়। তাহলে এই নির্জন অরণ্যে আমি কি করব? তবে সে মেয়ে সাহসী। নিজেকে সংযত করতে বেশি সময় নেয় নি।

রাত্রিটা রাস্তায় পায়চারি করে ও মাঝে মাঝে বিলের তাঁবুতে এসে মেরিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে কেটেছে। এর মধ্যে ২৭ মাইলে কাফ্রিদের গ্রামে তিন বার গেছি এবং তিন বারই ভীত গ্রামবাসীরা বলেছে হাতি শিকার বা কোনো বওয়ানা শিকারী সম্বন্ধে তারা বিন্দুবিসর্গও জানে না।

সকাল হতে গ্রামে গ্রামে খোঁজ করতে লাগলুম, ভাইলা ম্যাচাডো জঙ্গলের পথে পাঁচ ছ'টা গ্রাম তো হবেই কিন্তু গ্রামগুলো প্রায় পরিত্যক্ত। ৩৪ মাইলের মাথায় একটা গ্রামে তো প্রাণের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। দিন দুই আগে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। মেরিয়ার বিশ্বাস বিলের আকস্মিক নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এই গ্রাম ত্যাগের ব্যাপার জড়িত। সাদা মানুষের

বিপদের জন্যে কালো মানুষরা সাজা পাবার আশংকায় তারা গ্রাম ছেড়ে গভীর অরণ্যে পালিয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলুম পরদিন মঙ্গলবার যখন জানতে পারলুম মেরিয়ার অনুমান সত্য। ততক্ষণে আমরাও বুঝতে পেরেছি বিল এবং মুটোনি উভয়েই আর বেঁচে নেই।

৩৪ মাইলের গ্রাম থেকে আমরা একবার পরিশ্রান্ত ও জর্জরিত হয়ে ফিরে এলুম। ফেরবার পথে দেখলুম গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা কুটির থেকে একটা ছোকরা বেরিয়ে আসছে। বোম্বো দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরল এবং কয়েক মিনিট পরে তাকে ধরে নিয়ে এল। ছোকরা পালাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারে নি। ছোকরা মাথায় খাটো, প্রায় উলঙ্গ, ভয়ে কাঁপছে।

বোম্বো বলল, ছোঁড়াটার নাম জাটা, বওয়ানা বিল কোথায় গেছে তা ও জানে।

দুঃসংবাদ শুনতে হবে। মেরিয়া বিবর্ণ। মাথার ওপর প্রখর সূর্য, সে কাঁপছে। বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? চল আমরা সেখানে যাই। মেরিয়ার কণ্ঠস্বরে আদেশ ছিল। সে আদেশ আমি অগ্রাহ্য করতে পারলুম না। জাটা নামে সেই ছোকরাও যেন তার সাহস ফিরে পেল, সে বলল, চলুন আমিও যাব। জাটার ভয় দূর হয়েছে, সে এখন অন্য মানুষ, তার হৃদয়ে দয়া ও সহানুভূতি জেগে উঠেছে। নিরস্ত্র ও উলঙ্গ সেই ছোকরা বুক চিতিয়ে এগিয়ে এল। বোম্বো তার হাত ছেড়ে দিয়েছে।

যেখানে যাচ্ছি সেখানে পৌঁছে বিলকে জীবন্ত দেখতে পাব সে আশা আমার মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং মেরিয়ার মন থেকেও। তবুও তার এবং মুটোনির শেষ পরিণতি জানতে হবে তো।

জাটা সকলের আগে তার পরেই মেরিয়া। মেরিয়ার পায়ে যেন জোর নেই, সে যেন ঘুমের ঘোরে হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে তার পা টলছে। আমি তার পিছনেই আছি, যদি সত্যিই পড়ে যায় তাহলে তাকে ধরতে হবে। মাঝে মাঝে সে থেমে যাচ্ছিল, কাঁপছিল। তখনি তার পাশে এসে তাকে সাহায্য করতে হচ্ছিল, কিছু কথাও বলতে হচ্ছিল।

মেরিয়া হঠাৎ অসহনীয় শোক তো পেয়েছেই তাছাড়া শারীরিক ভাবেও দুর্বল। তাই তার পা টলছে। তার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। দুর্বল দেহ সে টেনে নিয়ে চলেছে কিন্তু এক ঘণ্টা পরে মনে হলো সে বুঝি আর পারছে না।

ততক্ষণে আমরা প্রায় খোলা একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি। জাটা সহসা থেমে গিয়ে বিহ্বলভাবে আমার দিকে চাইল। জাটা কি বলতে চাইছে? ক্ষণিকের জন্যে অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। সেই সময়ে মেরিয়া যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল, আমি তাকে থামাতে পারলুম না। আমরা তাকে অনুসরণ করলুম।

কয়েক পলক পরেই তার বুকভাঙা কান্নায় আমরা যেন ভেঙে পড়লুম। কিন্তু

ভেঙে পড়লে তো চলবে না। অবস্থার মোকাবিলা করতে হবে। নিজেকে যেন চড় মেরে জেগে উঠলুম। সামনেই বিল ও মুটোনির থেঁতলান লাশ দুটো পড়ে রয়েছে। চারদিকে চাপ চাপ রক্ত। যেমন বীভৎস তেমনি নিষ্ঠুরভাবে করুণ। মেরিয়া পড়ে যাচ্ছিল। তাকে ধরে ফেললুম। সে তার সহ্যের শেষ সীমা অতিক্রম করেছে। তার মানসিক অবস্থা যে অত্যন্ত শোচনীয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু আসন্নপ্রসবা এই যুবতীর শারীরিক অবস্থা? আমি শংকিত হয়ে উঠলুম।

বোম্বোকে ডাকলুম, বললুম যত জোরে পারিস গাড়ি চালিয়ে বাইরা চলে যা, ডাক্তার, নার্স আর দুটো অ্যামবুল্যান্স নিয়ে আয়। জাটাকে বললুম এই বনপথ থেকে বড় রাস্তার শর্টকাট তুই বোম্বোকে দেখিয়ে দে তারপর তোর গ্রামের লোকজনদের ডেকে আনবি। যা যা জলদি যা।

বোম্বো ততক্ষণে তার হাত ধরে ছুটতে আরম্ভ করেছে। সেই অরণ্যে আমি মেরিয়াকে নিয়ে অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে লাগলুম। সে জ্ঞান হারিয়েছে। সময় আর কাটে না।

সাহায্য অবশ্যই এসে পেঁছিল। বোম্বো ও অন্য মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম। বোম্বো তখন ঘামছে। চারটে পায়া লাগানো একটা স্ট্রেচারও এল। মেরিয়াকে সেই স্ট্রেচারে তোলা হলো। ডাক্তার তাকে দ্রুত পরীক্ষা করে বলল, বাঁচবে তবে মানসিক আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে অ্যামবুল্যান্সে তোলা হলো।

বোম্বো অনেক কম্বল এনেছিল। কম্বল দিয়ে বিল ও মুটোনির লাশ ঢেকে দিলো। কি কাণ্ড যে ঘটে গেছে তা গুণ্ডা হাতির পায়ের বিশাল ছাপ ও গাছের কয়েকটা ভাঙা ডাল দেখে বোঝা গেল।

মুটোনির বন্ধু শনিবার বিল ও মুটোনিকে বনের একটা অংশে পেঁছে দিয়ে বলেছিল কাছেই হাতির পাল চরছে, বড় হাতিটাও ডাল পাতা চিবোচ্ছে। অপেক্ষা কর দেখা পাবে। কিন্তু সে নিজে অপেক্ষা করে নি। অন্য কাজে চলে গিয়েছিল।

সত্যিই হাতির পাল খুব কাছেই ছিল। তাদের নেতা বড় গুণ্ডা হাতিটাও ছিল। সকলে গাছের নরম ডালপালা আরামে চিবোচ্ছিল। বাধা দেবার কেউ নেই।

হাতির পালের খোঁজে বিল তাদের কাছে অপেক্ষাকৃত একটা ফাঁকা জায়গায় আসে। সম্ভবতঃ জাটা পথ দেখিয়ে এনেছিল কারণ পরে ঐ ফাঁকা জায়গায় সে আমাদের নিয়ে এসেছিল যেখানে বিল ও মুটোনির লাশ পড়েছিল। এই ফাঁকা জায়গায় এসে বিল বোধহয় মুটোনি ও জাটাকে একটু তফাতে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে বলে আর সে নিজে ফাঁকার অপেক্ষা করতে থাকে।

যাতে গ্ণ্ডা হাতি শ্ধ্ তাকেই দেখতে পায়।
অন্য জন্তু শিকার করলেও বিল এখনও পর্যন্ত কোনো হাতিই শিকার করে নি। গ্ণ্ডা হাতি তো নয়ই। গ্ণ্ডা হাতির ক্রুদ্ধ প্রকৃতি তার জানা নেই আর এই গ্ণ্ডা হাতিটা তো চলন্ত একটা পাহাড় বিশেষ।
হাতির কোন জায়গায় গুলি করতে হয় তা আমি তাকে শিখিয়েছিলুম। সাধারণতঃ হাতির হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করেও গুলি করা যায় কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে চলবে না, হার্ট বিদ্ধ না হলেও একটা আর্টারি ছিঁড়ে যাওয়া চাই, ফুসফুস ফেটে যাওয়া চাই এবং নজর রাখতে হবে হাতির দূরত্ব এবং তার গতির দিকে। এই লক্ষ্য বা টার্গেটকে আমরা বলি হার্ট শট।
এর পরে হলো ব্রেন শট। লক্ষ্যভেদ হলে হাতি সঙ্গে সঙ্গে ঘায়েল হবে কিন্তু এই শট কঠিন। চোখের দুই রেখার ওপরে কমলালেবুর আকারে একটা নরম জায়গা আছে। সেইখানে সরাসরি গুলি লাগলে হাতি ঘায়েল হয়। কানের গর্তের ভেতর দিয়েও ব্রেন শট নেওয়া যায়। হাতি মাথা নাড়ে এজন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে পাগলা হাতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো শক্ত।
এখানে ঘাস ছিল বেশ লম্বা। হাতিকে গুলি করবার জন্যে বিলকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল। হয়ত সে চিৎকারও করেছিল এবং গ্ণ্ডা হাতি বিলকে দেখতে পেয়ে ও তার আওয়াজ শুনে তাকে আক্রমণ করে। দূরত্ব বোধহয় বেশি ছিল না এবং হাতির গতি সম্বন্ধে বিল কোনো ধারণা করতে পারে নি। বিল গুলি চালিয়েছিল এবং এই অবস্থায় তাড়াতাড়িতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। বিশেষ লক্ষ্যস্থলটি ছাড়া মাথায় গুলি লাগলে হাতির মাথার কঠিন হাড় ভেদ করা শক্ত। সে ক্ষেত্রে আহত হাতি আরও ক্ষেপে যায়। বিলের ক্ষেত্রে এমনই হয়েছিল মনে হয়। বিল দ্বিতীয়বার গুলি করবার সুযোগ পায় নি।
মুটোনি হাতিটাকে ভয় পেত। হাতির রুদ্রমূর্তি দেখে সে ভয়ে কাঁপছিল। কাঁপা হাতে গুলিও চালিয়েছিল একবার। কোথায় গুলি করছে তা দেখবার তার সময় ছিল না। অন্য হাতিরাও এসে পড়েছে, মুটোনি পালাবার সময় পায় নি। জাটা অনেক আগেই পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেছে।
৩৪ মাইলের কাছে যে গ্রাম ছিল সেই গ্রামের বাসিন্দারা হাতির ক্রুদ্ধনাদ ও তাণ্ডবলীলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল এবং তাদের একজন শিকারী ঘটনাটি দেখেওছিল। একজন শ্বেতকায় নিহত হয়েছে, এজন্যে গ্রামবাসীদের ওপর হামলা হতে পারে এই ভয়ে এবং হাতির পাল তাদের গ্রামেয় ওপর হুড়মুড়িয়ে এসে পড়তে পারে এমন আশংকা করে গ্রামবাসীরা গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল।

দুজনের দুটো বন্দুক খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল কিন্তু তখন তা আর বন্দুক ছিল না, দুমড়ে গিয়েছিল। আপাততঃ সবরকম ব্যবস্থা করে বাইরা ফিরে এলুম।
ফেরবার পথে চোয়াল শক্ত করে প্রতিজ্ঞা করলুম, "আই উইল গেট ইউ, ইউ ডেভিল।" শয়তান আমি তোমাকে শেষ করব, বিলকে মারবার শোধ তুলব।

প্রতিজ্ঞা তো করলুম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝলুম প্রতিজ্ঞা পালন করা অত্যন্ত দুরূহ। কাফ্রিরা সহযোগিতা তো করবেই না উল্টে বাধা দেবে, আমাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করবে। এই গুণ্ডা হাতি ও তার দলবল তাদের অনেক ক্ষতি করেছে, অনেক মানুষও মেরেছে। তাকে তাড়া করলে বা ক্ষেপালে আরও কতো গ্রাম ধ্বংস করবে, কতো মানুষ মারবে কে জানে। তাদের যদি বোঝাই যে হাতিটা তাদের সর্বনাশ করছে, ওটা মারা আশু প্রয়োজন তাহলেও তারা আমাকে সাহায্য করবে না। এদের চরিত্র আমি বুঝি। ওরা বিশ্বাস করে ওটা আসলে হাতি নয়, ছদ্মবেশী শয়তান। একে হত্যা করলে পাপ হবে, আরও সর্বনাশ হবে। ও একদিন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবে অতএব ওকে জ্বালাতন করে লাভ কি? যেমন চরছে তেমনি চরুক না। আমরা জানি ওটা ধ্বংস, সন্ত্রাশ, ভীতি ও মৃত্যুর প্রতিমূর্তি, তাই আমরা ওকে ভয় পাই। অবশ্য তারা জানে আমাকে ধোঁকা দেওয়া বা ঠকানো সহজ নয়।
এই গুণ্ডা হাতিটাকে চেনবার আমি একটা বিশেষ নিদর্শন পেয়েছিলুম যে জন্যে কাফ্রিরা আমাকে অন্য হাতির পায়ের ছাপ দেখিয়ে ঠকাতে পারবে না। হাতির সামনের দুই পায়ে চারটে করে নখ থাকে আর পিছনের পায়ে তিনটে করে নখ থাকে কিন্তু এই হাতিটার সামনে বাঁ দিকের পায়ে তিনটে নখ। তার পায়ের ভারি ছাপ দেখলে ভুল করবার কোনো উপায় নেই।
চিড়িয়াখানায়, সার্কাসে বা অন্যত্র আমরা যেসব হাতি দেখি সেগুলি সব এশিয়ার হাতি। চেনবার লক্ষণ হলো এশিয়ার হাতির কান ও মাথা ছোট, আকারেও ছোট। তবে কানই হলো প্রধান লক্ষণ। এশিয়ার হাতি চিড়িয়াখানায় শান্তভাবে থাকে, বাচ্চাদের পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, মাহুতের ভাষা বোঝে, সার্কাসে খেলা দেখায়, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাওদায় চাপিয়ে শোভাযাত্রায় বা শিকারে নিয়ে যায়, জঙ্গলে কাঠের গুঁড়ি বয়ে আনে, অন্য কাজও করে, পোষ মানানো সহজ কিন্তু আফ্রিকার হাতি? জঙ্গল ছাড়া তাদের কোথাও দেখা যায় না, পোষ মানানো অসম্ভব। মানুষের সেবা করবার জন্যে এরা জন্মায় নি, জঙ্গলে রাজত্ব করবার জন্যে এদের জন্ম। এরা বদমেজাজী, সহজে ক্ষেপে যায়, ক্ষিপ্ত বা উন্মত্ত হয়ে সংহার মূর্তি ধারণ করে, তখন সে কাউকে ভয় পায় না, সামনে যাই পড়ুক না কেন, গ্রাহ্য করে না, সব দলিত মথিত করতে করতে ছুটে যায়। হয় সে মারবে নয়ত নিজে মরবে।
এ হাতিকে আফ্রিকার বন থেকে ধরে এনে পোষ মানানো যায় নি। শিশু হাতি ধরে এনে বেলজিয়ান কঙ্গোতে পোষ মানাবার চেষ্টা করে সাফল্য লাভ করা

যায় নি। ব্যর্থ হয়ে তাদের আবার বনে ছেড়ে দিতে হয়েছে। এই হলো আফ্রিকার হাতি।

একটা দলে অন্ততঃ একশত হাতি থাকে। তাদের সর্দার আকারে সবচেয়ে বড়, শতবর্ষের অভিজ্ঞ, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা সঞ্চিত আছে তার শিরায় শিরায়। শিকারীর বর্শাঘাতে, তীরে বা গুলিতে কয়েকবার আহত হয়েছে যে জন্যে সে যন্ত্রণা ভোগ করছে ফলে অল্প উসকানিতে সে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। মানুষের গন্ধ পেলেই শুঁড় তুলে বন কাঁপিয়ে হুংকার দিতে দিতে তেড়ে আসে। দেহের আকার দেখে দৌড়ের গতি অনুমান করা যায় বা তাই বিভ্রান্ত মানুষ সহজে এর পায়ের চাপে পিষ্ট হয়। আফ্রিকার হাতির কান দুটো যেন নৌকোর হাওয়া ভরা পাল, বিস্তার চৌদ্দ ফুট, বিশাল, যখন ঝটপট করে তখন মনে হয় একটা কানের ঝাপটে গাছ থেকে একটা বানরকে ফেলে দেবে। আর দুটো উঁচিয়ে শুঁড় তুলে যখন তেড়ে আসে তখন তো সমূহ বিপদ। এমন একটা দানবের সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই কঠিন।

শত হস্তির একটা দল তাদের থামের মতো চারশ' পা নিয়ে যখন ছুটতে থাকে তখন যেন ভূমিকম্প হয়, মনে হয় প্রলয় বুঝি আসন্ন। মটমট করে গাছ ও গাছের ডাল ভাঙতে থাকে, তাদের হুংকারে যেন কালবৈশাখীর মেঘ ডাকে, আন্দোলিত শুঁড় যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রতরঙ্গ। একটা দুটো যূথভ্রষ্ট হাতির মোকাবিলা করা যায়, কিন্তু দলবদ্ধ উন্মত্ত হস্তিযূথ? অসম্ভব। তারা কয়েক মাইলের মধ্যে আসার আগেই কাফ্রিরা তাদের গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়।

গুণ্ডা হাতিটাকে মারবার প্রতিজ্ঞা করেই আমি তাই রাইফেল হাতে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি না। হাতিটা একে গুণ্ডা তার ওপর বিলের ও মুটোনির গুলিতে আহত হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সে হাতিকে সামলানো কঠিন, তার মোকাবিলা করতে হলে প্রস্তুতি চাই।

মঙ্গলবার রাত্রে বোম্বো আমাকে বলল জাটা বা গ্রামবাসীরা কেউ গ্রামে ফেরে নি। আমার চারজন সহকারী ছিল। তারা আমার সঙ্গে যেতে রাজি হলো। এদের মধ্যে তিনজন আফ্রিকায় নতুন। আমি নিজে যে অভিযানে যেতে যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করছি সেই অভিযানে অনভিজ্ঞদের নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক।

চতুর্থ সহকারীর কিছু অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু তাকে আমার সঙ্গে হাতি শিকারে নিয়ে যাওয়া অপেক্ষা আমার নতুন অন্য অভিযানে পাঠালে আমার অনুপস্থিতি সে সামাল দিতে পারবে। বৃহস্পতিবার সকালে বাইরার শ্বেতাঙ্গরা সমবেত হয়ে বিলকে যথোপযুক্তভাবে সমাধিস্থ করল। আমার অন্য অভিযানও সেদিন যাত্রা করল। গুণ্ডা হাতির মোকাবিলা করে আমি যদি ফিরে আসতে পারি তো আমি ঐ অভিযানে পরে যোগ দেবো।

গির্জা থেকে ফিরে আমি হাসপাতালে গেলুম। মেরিয়া একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে। বাচ্চাকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। মেরি ভালো আছে তবে এখনও তাকে কারও সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না।

বাইরার পৌঁছবার সাত দিন পরে শুক্রবার বোম্বো এবং তিনজন সহকারী

সঙ্গে নিয়ে ভাইলা ম্যাচাডোর অরণ্যের দিকে আমি যাত্রা করলুম। সঙ্গে চলল এক ট্রাক ভর্তি প্রয়োজনীয় মালপত্র। আমি এখন মনে ও শরীরে সচেতন।

'৩৪ মাইলের মাথায় একজন পোর্টুগিজ সরকারী কর্মচারী ও কয়েকজন স্থানীয় সেপাইয়ের দেখা পাওয়া গেল। তারা সারাদিন বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে এখানে এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। কাছাকাছি গ্রামগুলি জনশূন্য। কাছে কোথাও কাফ্রিরা নতুন একটা গ্রাম তৈরি করেছিল কিন্তু কোনো মানুষ দেখা যায় নি তাই ঐ সেপাইরা ক্রুদ্ধ হয়ে গ্রামখানা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছে। রাস্তার কাছে যে গ্রামখানা আছে সেখানা পোড়াবার জন্যে তারা এখন অপেক্ষা করছে। সরকারী কর্মচারী মনে করছে বিনা কারণে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে কাফ্রিদের উপযুক্ত সাজা দেওয়া হয়েছে।'

আমার সঙ্গে লাটসাহেবের চিঠি ছিল। লাটসাহেবের চিঠি দেখে পোর্টুগিজ অফিসার ঘাবড়ে গেল। সেপাইরা ততক্ষণে কাছের গ্রামখানায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। গ্রাম জ্বলছে জলুক, অফিসার ছুটল গ্রামের মোড়লের সন্ধানে। ২৭ মাইলের মাথায় একটা গ্রাম থেকে সে মোড়লকে ধরে আনল। মোড়লকে বলল, 'লাটসাহেব আমাকে চিঠি দিয়েছেন, মন দিয়ে শোনো, তুমি এই গাত্তি বওয়ানাকে সবরকমে সাহায্য করবে। যদি না কর তাহলে তোমার জায়গায় অন্য একজনকে মোড়ল করা হবে। তোমার গ্রামখানাও ছাইগাদা করে দেওয়া হবে।'

মোড়লকে লাটসাহেবের আদেশ শুনিয়ে দিয়ে অফিসার তার সেপাইদের নিয়ে ঝড়ঝড়ে কালো রঙের একটা ফোর্ড গাড়িতে চেপে বিদায় হলো।

লাটসাহেবের আদেশ মোড়ল শুনেছিল ঠিকই কিন্তু তার মাথায় ঢুকেছিল কি? তার কাছে লাটসাহেবের চেয়েও একটা সিম্বার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই যা ঘটবার তাই ঘটতে লাগল। মরণকূপ কাবেনা খোঁজবার সময় আমাদের যে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়েছিল এবারও আমাদের সেই বিড়ম্বনায় পড়তে হলো। মোড়ল আমাদের অনেক জায়গাতেই নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যে পথ দিয়ে গেলে হাতির দেখা মিলবে সে পথটি সযত্নে পরিহার করছে। কয়েক দিন অনেক পথ ঘুরে আমি তার চালাকি ধরে ফেললুম। আমি তাকে যা বলি সে সবই সে না বোঝবার ভান করে নিজের পথে চলতে চায়। অতএব আমি তার নির্দেশ মানতে নারাজ।

সাতদিন ধরে হাঁটাহাঁটির ফলে সমস্ত অঞ্চলটার ভূগোল সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মাল। ইতিমধ্যে নিজের ওপর বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে, সাহসও বেড়েছে, আর ইতস্তত করছি না, হাতিটাকে মারবই। ইতিমধ্যে অবশ্য বিভিন্ন স্থানে কয়েক দল হাতির দেখা পেয়েছি এবং সেইসব স্থানে গাছে বা অন্যত্র চিহ্ন করে রেখেছি যাতে মোড়ল পরে আমাকে ধোঁকা দিতে না পারে। হাতির ফটোও তুলেছি। হাতির পায়ের ছাপের দিকেও নজর রাখছি কিন্তু তিন নখওয়ালা সামনের পায়ের ছাপ এখনও আমার চোখে পড়ে নি!

রাস্তা থেকে ঘণ্টা দুয়েক দূরে বেশ বড়সড় জলাভূমি আছে। মাঝে মাঝে শুকনো ডাঙা, ছোট পুকুর ও ডোবা আছে। কোথাও চোরাবালিও থাকতে

পারে। এমন ধরনের ভূপ্রকৃতি আফ্রিকার অনেক অরণ্যে আছে। ঐসব জলাতে কুমির থাকে। অন্য কোনো জলজ প্রাণীরও দর্শন মিলতে পারে। মোড়ল কখনই আমাকে ঐ জলার দিকে নিয়ে যায় নি, যেতে চাইলেই বলত ওধারে যাওয়া অসম্ভব, আর কিছু না হোক দিনের বেলাতেও বড় বড় মশার ঝাঁক তোমার সব রক্ত চুষবে। তারপর তুমি যে জ্বরে পড়বে সে জ্বরের কোনো ওষুধ নেই। কতদিন ভুগবে কে জানে। শেষ পর্যন্ত হাড্ডিসার হয়ে যাবে। তারপর এমন চোরাবালি যে পা পড়লেই ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমরা কত জন্তুকে চোরাবালিতে ডুবে যেতে দেখেছি। মোড়লের উদ্দেশ্য আমাকে ঐ জলাভূমি সম্বন্ধে ভয় দেখিয়ে দেওয়া।

বোম্বো কোনো মন্তব্য না করলেও বেশ বুঝতে পারছিলুম সে মোড়লের কথা আমারই মতো বিশ্বাস করছে না।

আমার কাছে যে ম্যাপ আছে তাতে দেখতে পাচ্ছি জলাভূমির পর দুটো নদী আছে আর দুই নদীর মাঝের জমি স্বভাবতই শক্ত ও উঁচু হয়। মোড়ল যেহেতু ওধারে আমাদের নিয়ে যেতে চাইছে না, ভয় দেখাচ্ছে, সেখানেই আমাদের সন্দেহ। ঐ জায়গায় পেঁছিতে পারলে আমরা হয়ত গুণ্ডা হাতি ও তার দলের সন্ধান পেতে পারি। জলাভূমিও অত ভীতিজনক নাও হতে পারে।

আমি মোড়লকে বললুম, তুমি যাই বলো বাপু, আমরা কাল সকালে ঐ জলার দিকেই যাব, তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। জলার ওধারে পাহাড়ী জমি আর জঙ্গল আছে, আমরা ওখানে যেতে চাই। আর ঐ জঙ্গলেই পাহাড়ের মতো সেই গুণ্ডা হাতি আছে যার আগেকার বাঁ পায়ে তিনটে নখ আছে, পায়ের ছাপ দেখলেই আমি চিনতে পারব। তোমার কোনো ওজর আপত্তি আমি শুনব না, বুঝলে?

আমার কথা শুনে তো মোড়ল ভির্মি যাবার উপক্রম। দু চোখ কপালে তুলে মোড়ল বলল, তুমি কি বলছ বওয়ানা? ঐ জলার ওধারে যারা গেছে তারা কেউ বেঁচে ফিরে আসে নি। চোরাবালি তাদের গিলে ফেলেছে। তোমারও সেই দশা হবে, তুমি মরে যাবে।

আমি কোনো কথা শুনতে চাই না মোড়ল, আমরা কাল ঐ দিকে যাব। পোর্তুগিজ সায়েব তোমাকে কি বলেছে তা কি তোমার মনে আছে? আমার সঙ্গে না গেলে তোমার মোড়লগিরি যাবে।

আমি অবশ্য পরে মোড়লের বিরুদ্ধে কারও কাছে নালিস করি নি এবং তার মোড়লগিরিও যায় নি।

পরদিন সকালে উঠে দেখলুম মোড়ল ও মোজাম্বিকের তিনজন ছোকরা পালিয়েছে। পড়ে আছি শুধু আমি আর বোম্বো। এমন কিছু ঘটতে পারে আমার এমন আশঙ্কা ছিল। আফ্রিকার জলাভূমি ও চোরাবালি সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে তাই মোড়ল চলে গেলেও আমি ভয় পেলুম না। বোম্বো আমার বাড়তি রাইফেলটা বইতে রাজি হলো।

ম্যাপ দেখে আমি যা অনুমান করেছিলুম তাই ঠিক হলো। ওধারে উঁচু পাহাড়ী

জমিটা নদীকেই দুভাগে ভাগ করেছে। এই পাহাড়ী জমি বেশ শক্ত, পাথুরে, গ্র্যানাইট পাথরের বড় বড় চাঙড় রয়েছে। পাথরের ফাঁক দিয়ে ছোট বড় অনেক গাছ গজিয়েছে। গাছের ডালে ডালে প্রচুর বাঁদর। তবে জঙ্গল এখানে ঘন নয়।

সামান্য চড়াই ভেঙে ওঠবার পর ঝর্ণার শব্দ শুনতে পেলুম। খানিকটা এগিয়ে যাবার পর একটা গভীর খাত চোখে পড়ল। খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবল বেগে জলধারা পাথরের ওপর নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে। খাতটা মোটামুটি দশফুট চওড়া হবে। খাতের মধ্যে একজায়গায় জল ঝর্ণার মতো লাফিয়ে নিচে পড়ছে। আমরা এই শব্দটাই শুনতে পেয়েছিলুম। হাত বাড়ালে জল পাওয়া যায়। তেষ্টা অবশ্যই পেয়েছিল, না পেলেও এমন নির্মল জল দেখলে পান করতে ইচ্ছা করে। জল পান করতে হলে খানিকটা ওঠানামা করে এগিয়ে যেতে হবে। তাই যাওয়া যাক, তৃষ্ণা মেটাতে হবে।

কিন্তু তৃষ্ণা মেটান গেল না।

জমিটা এখানে সমতল, চারদিক ভিজে। ভিজে জমিতে হাতির পায়ের কয়েকটা ছাপ। একটা ছাপ অন্যান্য ছাপগুলো অপেক্ষা বড়ো ও গভীর। কৌতূহলী হয়ে ছাপটা পরীক্ষা করতে লাগলুম। যে ছাপ আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি এটা সেই ছাপ।

সামনের বাঁ পায়ে চারটের বদলে তিনটে নখ এবং অন্য পায়ের ছাপ অপেক্ষা এই ছাপটা দ্বিগুণ গভীর এবং সদ্য। মনে হলো মাত্র কয়েক মিনিট আগে হাতি এখানে জল পান করে গেছে। ছাপ ঘিরে জল বুড়বুড়ি কাটছে। হাতি কাছেই আছে। আমরা দুজনে তখনি সতর্ক হলুম। কোনো আওয়াজ তখনও আমাদের কানে আসে নি। আমরা দুজনে এতক্ষণ মাঝে মাঝে কথা বলছিলুম। আমরা কথা বলা বন্ধ করলুম।

হাতির দৃষ্টি ক্ষীণ কিন্তু কান ও ঘ্রাণশক্তি প্রখর। আমাদের অস্তিত্ব টের পেলেই হাতি ধেয়ে আসবে। এখানে পালাবার পথও নেই।

সূর্য তখন জ্বলছে, পিঠে কুলকুল করে ঘাম ঝরছে। কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। নিঝুম দ্বিপ্রহরের এই নীরবতা আমাদের ভালো লাগল না।

চারদিক যেমন চেয়ে দেখতে লাগলুম তেমনি কান পেতে কিছু শুনতে চেষ্টা করলুম। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে জঙ্গল কিছু ফাঁকা কিন্তু পশ্চিম দিকে জঙ্গল বেশ গভীর।

বোম্বো সহসা চমকে উঠে আমাকে ডাকল, দেখুন স্যার, তারপর সেই ঘন জঙ্গলের দিকে আঙুল বাড়াল।

ভালো করেই দেখলুম। গাছের আলিঙ্গন থেকে দেহ মুক্ত করে পালের গোদা বেরিয়ে আসছে। তার দেহের আঘাতে একটা গাছ ভেঙে পড়ল, মড় মড় করে শব্দ হলো। অরণ্যের ত্রাস সেই হাতিকে আমি এই প্রথম দেখলুম। কি ভীষণ পশ্চিম আকাশে যেন ঝড়ের একটা কালো মেঘ উঠছে। বিলের কথা আমার বিশ্বাস হয় নি। এত বড় ঐরাবত আমি দেখি নি।

আমিও লাফ মারলাম

আমরা দুজনে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। হাতি তখন জঙ্গল ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এসেছে। অনুমান করলুম মাত্র দুশো ফুট দূরে। ভাগ্যিস হাতির দৃষ্টি ক্ষীণ নইলে সে তখনি আমাদের তাড়া করত এবং পালাবার পথ নেই।

কিন্তু ঝিরঝির করে বাতাস বইছে। সেই বাতাস এখন আমার মনে হলো যেন ঝড়। দৃষ্টি ক্ষীণ কিন্তু নাক? অনেক দূরের গন্ধ সে টের পায়। হাতি বোধহয় তখন ভাবছিল মানুষের গন্ধ পাঁউ। শুঁড় নেড়ে নেড়ে হাতি ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করছে আর সেই সঙ্গে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। এখনও আমাদের দেখতে পায় নি কিন্তু তার ফোকাসে আসতে দেরি নেই। এখনও বোধহয় আমাদের অস্তিত্ব টের পায় নি তবে কিছু শোনবার আশায় বিশাল কান দুটো নাড়ছে।

আমাদের অবস্থা নিরাপদ নয়, সঙিন। দ্রুত ভাবছি কি করব। আমি প্রস্তুত ছিলুম না, এত শীঘ্র ও হঠাৎ যে হাতিটার দেখা পাব এমন আশা করি নি। এখন মনে হচ্ছে যমদূত যেন আমার সামনে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে, আমাদের শেষ সময় উপস্থিত, শেষ প্রার্থনা বলতে হবে নাকি?

আমি যদি পালের মোদ্দা হাতিটাকে গুলি করে থামাবার চেষ্টা করি তাহলে পালে আরও অনেক হাতি আছে, তারা তাড়া করবে, ক'টাকে সামলাব, বন্দুকে তো মাত্র দুটো গুলি। আমরা যদি পালাবার চেষ্টা করি তাহলেও সফল হব না। হাতিকে দেখতে বিরাট হলেও তার সঙ্গে দৌড়ে পারা যায় না। তার ওপর এই পাথুরে পথে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার আশংকা প্রতি মুহূর্তে।

আমরা ফাঁদে পড়েছি। যা কিছু করার একাই করতে হবে। বোম্বো শিকারী নয়, আমার গাড়ির ড্রাইভার। যে অঞ্চলে সে থাকে সেখানে হাতি নেই, হাতি সম্বন্ধে তার কিছু জানা শোনা নেই। এই সংকটে আমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে কিন্তু সময় তো নেই।

এমন সময় হাতিটা থেমে গেল, কি করবে ঠিক করতে পারছে না। এক সেকেণ্ড। তারপরে পাশে শুঁড় বাড়িয়ে একটা গাছের কচি ডাল ভেঙে নিয়ে চিবোতে লাগল। কচি ডাল চিবোচ্ছে কিন্তু কান নাড়ছে না, কিছু কি শোনবার চেষ্টা করছে?

ক্ষণিকের জন্যে স্বস্তি। কি করে এই শয়তানের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া যায়! হাতি কি সত্যিই আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়েছে? তাহলে ও মাথা ঘুরিয়ে জঙ্গলে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়াল কেন? এমন সময়ে বাতাস সহসা থেমে গেল। হাতির পা আর নড়ল না, থেমে গেল। শুঁড়ে ধরা কচি ডালটা ফেলে দিলো। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুদে চোখ দিয়ে পিট পিট করে এদিক ওদিক চাইতে লাগল।

হাতি আমাদের গন্ধ পেয়েছে।

কান খাড়া করল, কান নড়ছে না। গন্ধ অনুসরণ করে হাতি আমাদের দিকে

তার চোখ ফোকাস করল। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে কি ?
আমি এবার প্রস্তুত। ধীরে ধীরে এক্সপ্রেস রাইফেল কাঁধে তুলে নিলুম।
হাতি কয়েক পা এগিয়ে এসে বুঝতে পারল আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি। সে এবার একটা হুংকার ছেড়ে জানিয়ে দিলো তোর দিন শেষ হয়ে এসেছে। অনুমান করলুম সে একশ ফুট দূরে রয়েছে কিন্তু আমার মনে হলো সে একেবারে আমার সামনে এসে গেছে, হাত বাড়ালেই তাকে ছুঁতে পারব। চেষ্টা করছি নিজেকে স্থির রাখতে, নারভাস হলে চলবে না।
নব্বুই ফুট। আমার পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠল হাতির ভারে।
আশি ফুট। আমার হার্ট বিট যেন থেমে গেল। ডান চোখ কুঁচকে তাক ঠিক করতে লাগলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে পাহাড়ী ঢল নামল বুঝি, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের।
সত্তর ফুট। হাতির চোখের লাইনের কয়েক ইঞ্চি ওপরে দেখতে পাচ্ছি বিল যেখানটায় গুলি করেছিল, পোড়া চিহ্ন স্পষ্ট। ঠিক জায়গাতেই তো গুলি করেছিল।
ষাট ফুট। হাতিটা গুলি খেয়ে মরে নি কেন ?
পঞ্চাশ ফুট। বিল যেখানে গুলি করেছে আমি তার কয়েক ইঞ্চি ওপরে গুলি করব।
চল্লিশ ফুট। হাতি দাঁত উঁচিয়েছে, দাঁতের আঘাতে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কে জেতে কে হারে ?
তিরিশ ফুট। আর অপেক্ষা করা যায় না। ট্রিগার টিপলুম। গুলির আওয়াজ, হাতিরও হুংকার। সে যে কি ভীষণ তা বোঝাতে পারব না। হাতি মুহূর্তের জন্যে থামল কিন্তু পড়ল না কেন ?
বওয়ানা পালিয়ে এস, বোম্বো প্রাণভয়ে চিৎকার করে উঠল।
আর একবার হুংকার, আরও কাছে, আরও জোরে।
বোম্বো ততক্ষণে লাফিয়ে দশ ফুট খাতটা পার হয়ে ওপারে চলে গেছে। আমিও লাফ মারলুম। অন্য সময় হলে হয়ত পার হতে পারতুম না কিন্তু এখন প্রাণভয়ে ঠিক ওপারে চলে গেলুম। চকিতে পিছনে একবার দেখে দুজনেই দৌড়তে লাগলুম। ঠোক্কর খেয়ে বোম্বো একবার পড়ে গেল। আমি তাকে টেনে তুললুম।
হাতির আবার কানফাটা হুংকার। মাথা নাড়ছে, শুঁড় নাড়ছে, সে এক ভীতি-জনক দৃশ্য, কিন্তু এখনও খাতের ওপারে রয়েছে। পা দাপিয়ে পথ খুঁজছে। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একটা গাছই উপড়ে ফেলল। আবার হুংকার কিন্তু সুর অন্য, পালাবি কোথায়, সামনেই তোর কৃতান্ত।
হাতির এই হুংকার শুনে পালের সব কটা হাতি আকাশ বাতাস বনভূমি কাঁপিয়ে এমন হুংকার ছাড়তে লাগল যে আমাদের হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবার যোগাড়। অন্ততঃ দুশো হাতির ঐকনাদ। মনে হচ্ছে প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণের মধ্যে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে, কয়েক শত ট্যাংক অগ্নিবর্ষণ

করতে করতে আমাদের তেড়ে আসছে। এমন দৃশ্য আমি কখনও দেখি নি। আফ্রিকায় এ আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

ঐ উন্মত্ত হস্তিযূথের সামনে আমরা দুজনে দুটি বিন্দু মাত্র তবুও আমরা এখনও নিরাপদ।

সহসা আমার মনে পড়ল শৈশবে পাঠ্যপুস্তকে যেন পড়েছি, হাতি সাড়ে ছ' ফুটের বেশি লাফাতে পারে না। সাত ফুট চওড়া একটা সরু খাল হাতি কখনও লংজাম্প করে পার হতে পারে না।

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লুম। হাতি এই দশ ফুট খাত পার হতে পারবে না তবুও যতদূর সম্ভব দূরে সরে যাওয়া মঙ্গল।

গুণ্ডা হাতি প্রায় খাতের ধারে এসে পড়েছে। উত্তেজিত কণ্ঠে বোম্বো প্রাণপণে চিৎকার করে, গুলি করুন, গুলি করুন। হাতিটা তখন দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেছে। কি মতলব। খাত বুজিয়ে এপারে আসবে? অন্য হাতিগুলোও এগিয়ে আসছে, তাদের মধ্যে কয়েকটা দাঁতাল হাতিও দাঁত নিচু করে মাটি খুঁড়তে আরম্ভ করেছে।

আমার বাড়তি এক্সপ্রেস রাইফেলটা বোম্বোর হাতে ছিল। সে হাত বাড়িয়েই ছিল। সেটা নিয়ে আমি আগে যেখানে গুলি করেছিলুম তার কয়েক ইঞ্চি ওপরে গুলি করলুম। গুলি খেয়ে হাতি আরও ক্ষেপে গেল। রাইফেলে আর একটা গুলি আছে। মাটি খোঁড়বার জন্যে ও মাথা যেই নিচু করেছে আমি ওর কানের ভেতর দিয়ে গুলি করলুম। ওর আর নিস্তার নেই। কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, তারপর পড়ে গেল। আর উঠল না।

বিলের গুলিতে হাতি কেন মরে নি তা পরে জানা গিয়েছিল। এ হাতির মাথা মস্ত বড় তাই এর ব্রেন-এর সীমা আরম্ভ হয়েছে চোখের লাইনের সাড়ে ন' ইঞ্চি ওপরে। বিলের গুলি মাথার হাড়ে আটকে ছিল। মাপের এই পার্থক্য বিলের মৃত্যুর কারণ আর দশ ফুট মাপের খাত আমাদের জীবন বাঁচিয়ে দিলো।

হাতির দাঁত দুটোর ওজন হয়েছিল দুশো পাউণ্ড আর প্রত্যেকটা মাপে ন' ফুটের বেশি লম্বা।

দলপতির পতনে পালের হাতিগুলো বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল। আমি আর বোম্বো আকাশের দিকে নল তুলে রাইফেল থেকে কয়েকটা গুলি ছুঁড়লুম। হাতিগুলো প্রথমে থমকে দাঁড়াল তারপর পিছু হটে জঙ্গলের দিকে পালাল। কিছু গুলি নষ্ট হলো কিন্তু আমরা তো নিরাপদ হলুম। দলে অনেক বাচ্চা হাতি ছিল। তাদের মায়েরা তাদের আগলে নিয়ে চলল।

পড়ে রইল সেই পাহাড়তুল্য হাতি আর আমরা দুজন। শেষ পর্যন্ত বিল ও মুটোনির হত্যাকারী ও কয়েক ডজন কাফ্রি ও তাদের গ্রামের ধ্বংসকারী খুনী হাতিকে স্তব্ধ করা গেল। স্থানীয় আদিবাসীরা আমাদের সাধুবাদ জানিয়েছিল।

একটা আফসোস রয়ে গেল। বিল যদি আর কয়েক ইঞ্চি ওপরে গুলি করত? ভুলটা কি আমারই?